SAHITYA ANGAN

An Exclusive Interdisciplinary & Literary Tri-lingual Peer-reviewed Journal.

Chief Editor : Dr. Jaygopal Mandal
C/O-B. N. Ghosh, Simuldih, Telipara,
Hirapur, Dhanbad, Jharkhand

ISSN:2394 4889 Vol : III, Issue : V 21 February 2017

Published by : *Dr. Jaygopal Mandal,* C/O-B. N. Ghosh, Simuldih, Telipara, Hirapur,
Dhanbad, Jharkhand, Phone : 09830633202/09570217070
E-mail : jaygopalvbu@gmail.com, jaygopal_1969@rediffmail.com
sahityaangan@gmail.com, Website : www.sahityaangan.com

Vol : III, Issue : V 21 February 2017 ● SAHITYA ANGAN

সাহিত্য অঙ্গন

ISSN:2394 4889
Vol : III, Issue : V
21 February 2017
DIIF Impact Value :1.028
Frequency : Halfyearly

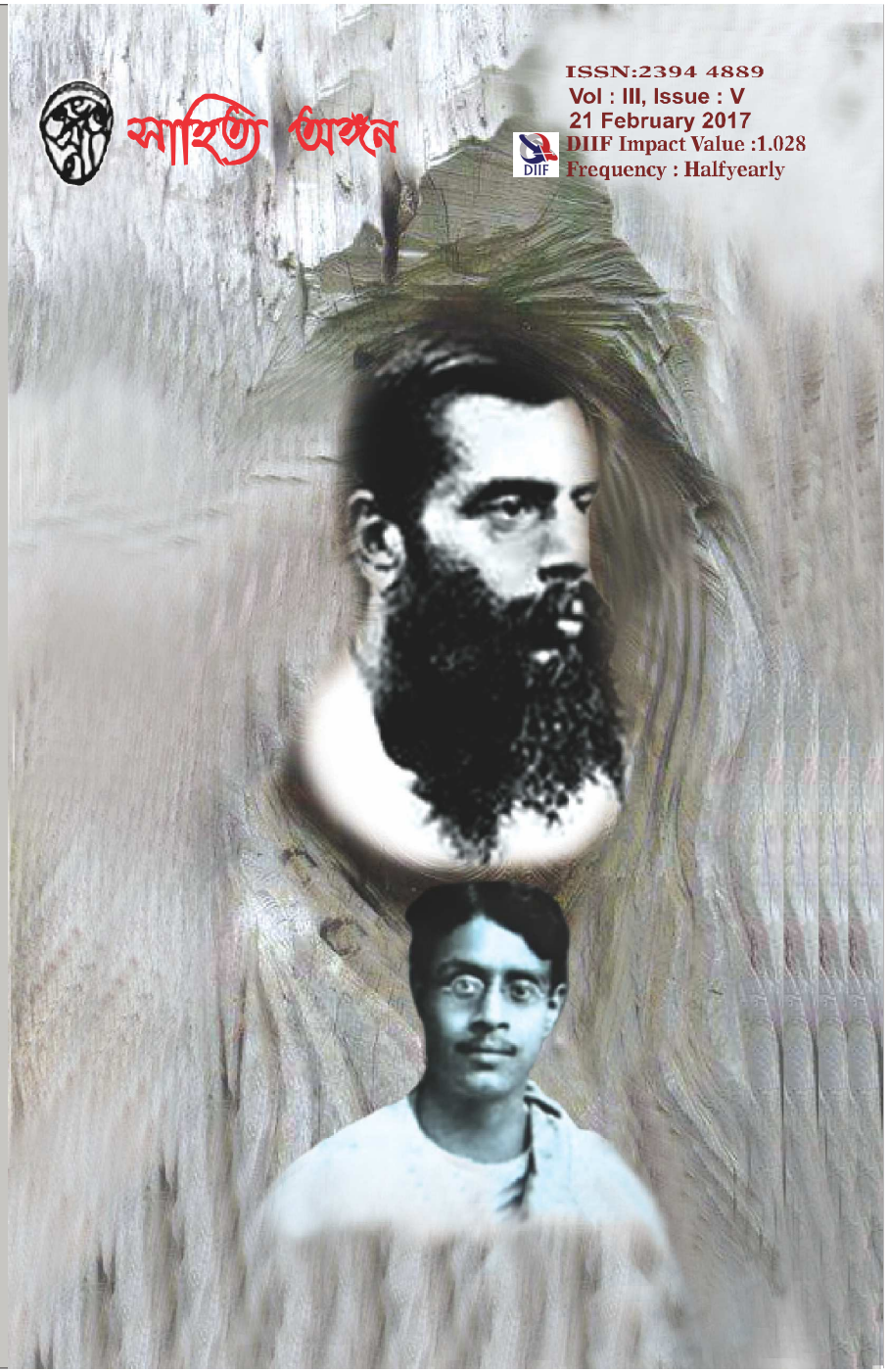

সাহিত্য অঙ্গন

(সাহিত্য আংগন // Sahitya Angan)

ISSN : 2394 4889, DIIF Impact Factor : 1.028

Vol. : III, Issue : V, 21 February, 2017

Website : www.sahityaangan.com

মুখ্য সম্পাদক

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

(Chief Editor : Dr. Joygopal Mandal)

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

প্রযত্নে ঃ বি. এন. ঘোষ

শিমূল ডিহি, তেলিপাড়া, হীরাপুর,

ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড

SAHITYA ANGAN

An Exclusive Interdisciplinary & Literary Tri-lingual Peer-reviewed Journal

ISSN : 2394 4889, DIIF Impact Factor : 1.028

Vol. : III, Issue : V, 21 February 2017

Chief Editor : ***Dr. Jaygopal Mandal***
C/O-B. N. Ghosh, Simuldih, Telipara,
Hirapur, Dhanbad, Jharkhand

: Working Editorial Board :
Dr. Subhankar Roy, Dr. Sandip Mondal, Dr. Manaranjan Sardar, Dr. (Md.) Kutubuddin Molla, Dr. Samaresh Bhoumik, Nasiruddin Purkait, Apu Dey

: Members from the other Countries :
Dr. Gulam Mustafa (Chittagong University, BanglaDesh)
Sisir Dutta(Chittagong , BanglaDesh)
Professor Himadri Sekhar Chakraborty (USA)
Professor Barsanjit Mazumder (USA)

: Advisory Board :
Dr. Tapas Basu, Dr. Subrata Kumar Pal, Dr. Prakash Kumar Maity, Dr. Suranjan Middey, Dr. Sudip Basu, Dr. K. Bandyopadhyay, Dr. Soumitra Basu, Dr. Sukalyan Maitra, Dr. M. M. Panja, Professor A. Ghosal, Dr. A. Bhattacharya, Dr. N. Ghosal

© Dr. Jaygopal Mandal

: Type Setting :
Manik Kumar Sahu
Kolkata - 152
Phone : 9830950380

Price : ₹ 110.00

Published by :
Dr. Jaygopal Mandal
C/O-B. N. Ghosh, Simuldih, Telipara,
Hirapur, Dhanbad, Jharkhand
Phone : 09830633202/09570217070
E-mail : jaygopalvbu@gmail.com, sahityaangan@gmail.com
Website : www.sahityaangan.com

বিষয় তালিকা

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শ্রীউপেন্দ্রকিশোর—বিজিত ঘোষ/7
রায়বাড়ির অর্থনৈতিক চিন্তা ঃ উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার—শুভঙ্কর রায়/15
সখা পত্রিকার দুই সখা ঃ প্রমদাচরণ ও উপেন্দ্রকিশোর—ভীষ্মদেব মুখোপাধ্যায়/25
বাংলা শিশুসাহিত্য ঃ উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ পর্ব—সুব্রত দাস/32
রায়চৌধুরী পরিবার ঃ বাংলা শিশুসাহিত্যের লালনঘর—রাসবিহারী দত্ত /49
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর টুনটুনির বই ঃ এক বিজিতের গল্পপাঠ—মেহেবুব হোসেন/55
উপেন্দ্রকিশোরের ছেলেদের মহাভারত—সুবিমল মিশ্র/61
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ছেলেদের রামায়ণ—মনোরঞ্জন সরদার/70
উপেন্দ্রকিশোরের রচনায় লৌকিক উপাদান—বরুণ কুমার চক্রবর্তী/77
উপেন্দ্রকিশোরের পুরী ভ্রমণকথা —জয়গোপাল মণ্ডল/89
অত্যুক্তি আর আত্মনিষ্ঠা—শঙ্খ ঘোষ/99
সুকুমার রায়-এর কবিতা ঃ অসম্ভবের শিল্প— সুমন গুণ/109
দেশ-কালের প্রতিচ্ছবি ঃ সুকুমার রায়ের কবিতা—মহঃ কুতুবুদ্দিন মোল্লা/114
সুকুমার রায় ঃ সাহিত্যে নব্য বিজ্ঞান চেতনা—আনসার উল হক/123
সুকুমার রায় ও আজগুবি ঃ ‘সৃষ্টি সুখের উল্লাসে’—সমরেশ ভৌমিক/130
আবোল তাবোল ঃ খেয়াল রসে সত্যের অনুসন্ধ্যান—মধুশ্রী সেন সান্যাল/136
কাব্য-শৈলীর আলোয় ‘আবোল তাবোল’—পীযুষকান্তি অধিকারী/142
সুকুমার রায়—চরিত্র বিনির্মাণে অভিনবত্ব—রাণু চক্রবর্তী/155
সুকুমার রায়ের নাট্যপ্রকরণ—পবিত্র সরকার/160

With Best Compliments from :

LAKSMI PRESS

JHARIA (DHANBAD)

MOBILE : 9470385522

Offset Printers, Stationers, Survey Materials, Computer Stationery & General Order Supplier

প্রসঙ্গ

প্রযুক্তির যুগ, বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় ভোগপ্রিয় মানুষ মগ্ন। একবিংশ শতক। পুরনো মূল্যবোধ, নীতিকথা বিসর্জিত। সম্পর্কের সূতোগুলো ছিঁড়ে যাচ্ছে। বিশ্বায়নে যোগসূত্র গড়ে ওঠার বিপরীতে আন্তরিকতা যন্ত্রের যাঁতাকলে পিষ্ট। আক্রান্ত শিশুর জীবন, আহত শৈশব। বিক্রি হচ্ছে শিশু, চিকিৎসকের হাতে শিশুর জন্ম, আবার তাদের লোভের চোরাস্রোতে হারিয়ে যাচ্ছে শৈশবের লালিত্য, শিশু হারাচ্ছে মায়ের কোল আঁচলের হাওয়া। এমন বিপন্ন সময়ে শিশুর অস্তিত্ব রক্ষা তার ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলা শিশু সাহিত্য সৃজন ও সমালোচনা এক অনন্য পথ।

বাংলা সাহিত্যে ঊনিশ শতকে আধুনিক অর্থে শিশু সাহিত্যের জন্ম। যদিও প্রাচীন ভারতে পণ্ডিত বিষ্ণু শর্মার 'পঞ্চতন্ত্র'-এ জীবজন্তু ও মানবজীবনকে কেন্দ্র করে আনন্দ ও উপদেশ পরিবেশিত হয়েছে। 'বৌদ্ধ জাতক সাহিত্যে'র বহু ছোট গল্পও শিশু কল্পনার জগৎ থেকে আহৃত হয়েছে। ঈশপের গল্পের মতো হিতোপদেশের গল্পগুলিকে শিশুসাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলা যায়। এ সমস্ত ছাড়া ছিল 'রূপকথা' ও 'ছেলে ভুলানো' ছড়া। শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'মুকুল' পত্রিকা, উপেন্দ্র কিশোরের 'সন্দেশ', প্রমদাচরণ সেনের 'সখা' প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে আধুনিক শিশু সাহিত্যের সমৃদ্ধি হয়। যদিও রবীন্দ্রনাথ শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্যতম স্মরণীয় ব্যক্তি—নদী, মুকুট, শিশু, শিশু ভোলানাথ, খাপছাড়া, ছড়ার ছবি, ছেলেবেলা, গল্পস্বল্প, সহজপাঠ প্রভৃতি গ্রন্থে শিশুচিত্তের সহজ সরল একান্ত অনাবৃত পরিচয়টি ফুটে উঠেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে বাংলা শিশুসাহিত্যের আদিপুরুষ বা ভগীরথ বলেছেন। তিনিই প্রথম বাঙালী শিশুকে প্রথম শোনালেন রামায়ণ, মহাভারত, টুনটুনির গল্প এবং বাংলাদেশের অমর ছড়ার গদ্যরূপ। অপূর্ব চিত্রাঙ্কনে উপেন্দ্রকিশোর বাঙালী শিশুকে পরম তৃপ্তি দিয়েছেন, দিয়েছেন শৈশবের স্ফূর্তি। এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র সুকুমার রায় তাঁর আবোল তাবোল, পাগলা দাশু, বিচিত্র ছড়া, খাইখাই, অবাক জলপান প্রভৃতিতে বাংলা পদ্য ও গদ্যকে সরস ও শিশুর মনের উপভোগ্য করে পুষ্পিত করেছেন।

আজ যখন মোবাইলে সওয়ারী মানুষ শিশুর সুকুমার চেতনার প্রতি বিমুখ হয়ে পণ্য করে তুলেছে জীবনকে। তখন বুঝি সত্যকে দেখার পথ অন্বেষণের জন্য বড় কলমের কাছে ফিরে যেতে হয়। উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার রায়ের দৃষ্টিতে দেখতে চাই কালান্তরে যাওয়ার রাজপথে। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আজও এঁরা আমাদের কালে স্মরণীয়। কেবল শিশুদের জন্য নয়; বিভ্রান্ত মানুষের, বিপণনের দালালদের মন ও মননে শৈশবের ছোঁয়া জোগানোর জন্য শিশু সাহিত্যের রূপকারদের নতুন করে মূল্যায়ন প্রয়োজন বলে মনে হয়। শিশু সাহিত্যের প্রাচুর্য ও রূপায়নে আদি পুরুষ উপেন্দ্রকিশোর এর প্রসঙ্গ ও তাঁর উত্তরাধিকারী সুকুমার রায়ের নব মূল্যায়ণ বা ফিরে দেখায় যে কোনো মানুষের মনের পরিশুদ্ধির। স্বপ্নলোকের দ্বার উন্মুক্ত হবে। বর্তমান রুচিহীনতার যুগে সাহিত্যের বাজারেও বিভৎস রুচিহীনতার স্বাক্ষর যখন বিরাজিত তখন এই শিশু সাহিত্যের চর্চা নতুন আকাশ রচনা করবে। এ আমাদের কল্পনা। যাঁদের সৃজনী আলোয় আলোকিত এই সংখ্যা তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, **বিশেষ করে জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে সম্মানিত কবি শঙ্খ ঘোষ এবং শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার মহাশয়কে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'সুকুমার পরিক্রমা' (১৯৮৯) গ্রন্থের দুটি প্রবন্ধ—'অত্যুক্তি আর আত্মনিষ্ঠা' (শঙ্খ ঘোষ) এবং 'সুকুমার রায়ের নাট্যপ্রকরণ' (পবিত্র সরকার) লেখকদ্বয়ের অনুমোদনে পুনর্মুদ্রিত হল।** আশা করি পাঠকের হৃদয়ে এই সংখ্যা মনোগ্রাহী হবে।

জয়গোপাল মণ্ডল

২১শে ফেব্রুয়ারী ২০১৭

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শ্রীউপেন্দ্রকিশোর

বিজিত ঘোষ

ছোটোবেলা থেকেই ছেলেটির গণিত ও বিজ্ঞানে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। মেধাবী ছাত্র হিসেবে মসূয়ার স্কুলজীবন শেষ করে বৃত্তি নিয়ে তিনি চলে আসেন কলকাতায়। ময়মনসিংহের মসূয়া গ্রাম থেকে এনট্রান্স পাশ করে ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে।

সে সময় রামমোহন রায়ের প্রভাবে গড়ে উঠেছিল ব্রাহ্মসমাজ। ২১ বছরের যুবকটি তখন ব্রাহ্মধর্মের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেন ও সেই ধর্ম গ্রহণও করেন।

এ-সম্পর্কে শ্রদ্ধেয়া লেখিকা শ্রীমতী লীলা মজুমদার লিখেছেন ঃ 'ওই বাড়িটার একটা বিশেষত্ব ছিল। সেখানে অনেকগুলি পরিবার এসে বাসা বেঁধেছিল, যারা ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিয়েছে বলে আত্মীয়-স্বজনরা তাদের ত্যাগ করেছিল।... কিন্তু এঁরা যেটাকে বিশ্বাস করেন, পাঁচজনের কাছে তাকে প্রকাশ করবার সাহস রাখেন।... তখনকার সময়টাই ছিল ওইরকম। সেটা ছিল পুরোনো অকেজো নিয়ম ভেঙে ফেলে দিয়ে, বুদ্ধির আলোতে উজ্জ্বল নতুন একটা জীবনযাত্রাকে প্রতিষ্ঠা করার যুগ।'

এই প্রসঙ্গে বলতে পারি, ভারতবর্ষের যে দুটি বাঙালি পরিবার বংশ পরম্পরায় জগতের মুখ উজ্জ্বল করেছে, তারা রায় ও ঠাকুর পরিবার। সেই রায় পরিবারের প্রথম প্রধান পুরুষ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কথা বলছি আমি।

রামসুন্দর দেব ছিলেন রায় বংশের আদিপুরুষ। এঁর সম্পর্কে শ্রীমতী লীলা মজুমদার লিখেছেন ঃ '১৪৮০ থকে ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রামসুন্দর দেব বলে উপেন্দ্রকিশোরের একজন সাহসী পূর্বপুরুষ, হয়তো আর্থিক উন্নতির আশায় কিংবা দেশ দেখার ইচ্ছায়, যে কারণেই হোক, দেশ ছেড়ে পূর্ব বাংলার দিকে যাত্রা করলেন। আর তিনি দেশে ফেরেননি।'

পরবর্তীকালে রামসুন্দরের পঞ্চম বংশধর রামনারায়ণ ঘশোদল ছেড়ে চলে আসেন মসূয়ায়। রামনারায়ণের পুত্র কৃষ্ণজীবনের ছিল দুই ছেলে। ব্রজরাম আর বিষ্ণুরাম। ততদিনে রামসুন্দরের বংশধরেরা অর্জন করেছিলেন রায় উপাধি।

ব্রজরাম ছোটোবেলা থেকে লেখাপড়ায় ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। পরবর্তীকালে তিনি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন পাণ্ডিত্যে। ব্রজরামের পুত্র রামকান্তও ছিলেন গুণী মানুষ। বেশ কয়েকটি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তিনি। সঙ্গীতেও রামকান্ত ছিলেন যথেষ্ট পারদর্শী।

রামকান্তের তিন পুত্র। ভোলানাথ, লোকনাথ আর কাশীনাথ। এঁদের তিনজনেরই সর্বদা ছন্দ মিলিয়ে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার এক অভিনব অভ্যেস ছিল। সংস্কৃত, আরবি

ও পারসি ভাষায় অত্যন্ত দক্ষতা অর্জন করেছিলেন পণ্ডিত লোকনাথ, লোকনাথের পুত্র কালীনাথও ছিলেন নানান ভাষায় সুপণ্ডিত। কালীনাথ পরবর্তীকালে পরিচিত হন মুনশি শ্যামসুন্দর নামে।

মুনশি শ্যামসুন্দরের ছিল পাঁচ পুত্র। সারদারঞ্জন, কামদারঞ্জন, মুক্তিদারঞ্জন, কুলদারঞ্জন ও প্রমদারঞ্জন। কামদারঞ্জনকে তাঁর জ্ঞাতি দত্তক নিয়ে নাম দেন উপেন্দ্রকিশোর। উপেন্দ্রকিশোরের জন্ম হয় ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ১০ মে (২৭ বৈশাখ); পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার মসূয়া গ্রামে।

১৮৯৫ সালে উপেন্দ্রকিশোর নিজের বাড়িতে একটি প্রেস বসিয়ে প্রিন্টিং গবেষণা আরম্ভ করেন। সে-সময়ে হাফ-টোন প্রিন্টিং সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ ছাপা হয়, বিলেতি প্রিন্টিং জার্নাল পত্রিকায়। পত্রিকাটির নাম 'Penrose Annual'. The penrose Annual was a London-based review of graphic arts, printed nearly annually from 1895-1982. হাফ-টোন প্রিন্টিং-এর মান উন্নয়নে উপেন্দ্রকিশোরের লেখাগুলির অপরিসীম গুরুত্ব সমকালে বিদ্বজ্জনেরা একবাক্যে স্বীকার করে নেন।

সে যুগে আমাদের দেশে রঙিন হাফ-টোন ছবি ছাপা হত না। বিলেত থেকে বই আর যন্ত্রপাতি আনিয়ে, মৌলিক গবেষণার সাহায্যে উপেন্দ্রকিশোর হাফ-টোন রঙিন ছবি ছাপার যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন, তা সে-যুগে ইংল্যান্ডেও ব্যবহৃত হয়েছিল। তাঁর তৈরি ব্লকে শতাধিক বছর আগে ছাপা রঙিন ছবিগুলির উৎকর্ষ দেখে আরও বিস্মিত হতে হয়। নিজে নকশা এঁকে গড়ফা রোডের বাড়ি তৈরি করিয়ে তিনি তাঁর প্রকাশনা সংস্থার ('ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্স') কাজ শুরু করেন।

উপেন্দ্রকিশোরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল ১৩২০ সালের বৈশাখে (১৯১৩-র মে) ছোটোদের জন্য 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশ। তখনকার দিনে এমন সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ছোটোদের মাসিক পত্রের কথা কেউ কল্পনাও করেন নি।

এ-প্রসঙ্গে লীলা মজুমদার লিখেছেন ঃ 'সন্দেশ প্রকাশন শিশুসাহিত্যের জগতে এক নতুন দিনের উদ্বোধন করেছিল।....উপেন্দ্রকিশোরকে নিয়ে শুধু বাংলাদেশ কেন, সারা ভারতবর্ষের লোক গর্ব অনুভব করে।'

'সন্দেশ'-এর প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর লিখেছিলেন,'আমরা যে সন্দেশ খাই তার দুটি গুণ, সেটা খেতে ভালো লাগে আর খেলে শরীরে বল হয়। তেমনি 'সন্দেশ' পত্রিকা পড়তে যদি ভালো লাগে আর কিছু জ্ঞান লাভ হয় তবেই তার নাম সার্থক হবে।'

বাস্তবিকই সার্থক হয়েছিল 'সন্দেশ' পত্রিকার নামকরণ। ছোটো-বড়ো সকলেরই

ভালো লেগেছিল। কী না থাকতো উপেন্দ্রকিশোরের 'সন্দেশ'-এ?! নানা ধরণের গল্প। পৌরাণিক কাহিনী। দেশ-বিদেশের রূপকথা-উপকথা। ছড়া, নাটক, ধাঁধা, হাসি, তামাশা, কবিতা, গান, ভ্রমণ-কাহিনী, জীবনী, জীবজন্তুর কথা, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক আবিষ্কার, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এবং আরও কতো কী! সমস্ত লেখার সঙ্গে অপূর্ব সুন্দর সব রঙিন বা সাদা কালো ছবি। প্রবন্ধগুলিও ছিল গল্পের মতোই চিত্তাকর্ষক।

এ-প্রসঙ্গে আবারও বলি লীলা মজুমদারের কথা; তাঁর লেখা তো নয়, যেন তুলি দিয়ে আঁকা ছবি ঃ '১৯১৩ সালে একদিন সন্ধেবেলায় 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি হাতে করে উপেন্দ্রকিশোর ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এসে বসবার ঘরে দরজার কাছে হাসিমুখে দাঁড়ালেন। অমনি ঘরময় একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। সেই সময় সেই ঘরে যে ক-জন মানুষের উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল তারা কেউই বোধহয় জীবনে কখনো সে সন্ধ্যার কথা ভুলত পারবে না।'

অন্যত্রও প্রথম 'সন্দেশ' প্রকাশের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন লীলা মজুমদার। '১লা বৈশাখ ১৩২০। সেদিনটা আমার এখনও মনে আছে। সন্ধেবেলা আমরা সকলে দোতলায় বৈঠকখানায় বসে আছি।... এমন সময় জ্যেঠামশাই হাসতে হাসতে উপরে উঠে এলেন। হাতে তাঁর সন্দেশের প্রথম সংখ্যা। কী চমৎকার তার মলাট! গাল-ভরা সন্দেশ, হাতে সন্দেশ, হাতে 'সন্দেশ', ভাইবোন শোভা পাচ্ছে। যতদূর মনে হয় এইটেই ছিল প্রথম মলাট।'

এই 'সন্দেশ' সম্পর্কে কবি-সাহিত্যিক শ্রী বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন ঃ 'ছোটদের আশার হরিণকে দিগন্তের দিকে ছুটিয়ে দিয়ে মাসে মাসে আসতো 'সন্দেশ', আসতো তার আশ্চর্য মলাট আর ভিতর-বার মনোহরণ ছবি নিয়ে, আসতো দুটি মলাটের মধ্যে সাহিত্যের ভোজে উজ্জ্বল পাইকা অক্ষরের পরিবেশন। কবিতা, গল্প, উপকথা, পুরাণ, প্রবন্ধ, ছবি, ধাঁধা-'সন্দেশ'-এর ভোজ্য তালিকায় এমন কিছু ছিল না, যা সুস্বাদু নয়, সুপাচ্য নয়, যাতে উপভোগ্যতা আর পুষ্টিকরতার সহজ সমন্বয় ঘটেনি।'

'সন্দেশ'-এর প্রকাশন শিশুসাহিত্যের জগতে একটা নতুন দিনের উদ্বোধন করে দিয়েছিল, হঠাৎ যেন একদিনের মধ্যে বাংলার শিশুসাহিত্যের সমস্ত দৈন্য ঘুচে গিয়ে সে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠল। বাস্তবিক এই প্রথম সংখ্যার 'সন্দেশ' খানি পৃথিবীর যে কোনো দেশের শ্রেষ্ঠ শিশু মাসিক পত্রিকার পাশে আসন পাওয়ার যোগ্য। যেমন তার পাঠ্যবস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈচিত্র্য তেমনি তার ছবি, কাগজ, ছাপা ও মলাট। তারপরে আরও পঞ্চাশটি বছর কেটে গেছে, বাংলাদেশে আর কোনো ছোটদের পত্রিকা অমন মনোহর রূপ নিয়ে দেখা দিল না। নামকরণটি কী চমৎকার, সন্দেশ মানে খবর, সন্দেশ মানে মিষ্টিও, হাজাররকম যার রূপ ও স্বাদ।

... সে সময় বাংলাদেশে যেসব প্রতিভাবান লেখক-লেখিকারা ছোটোদের জন্য চিন্তা করতেন,....তাঁদের মধ্যে ছিলেন আচার্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, বিজয়রত্ন মজুমদার, প্রিয়ম্বদা দেবী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যোগীন্দ্র নাথ সরকার, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি।

এঁরা প্রায় সকলেই তখন নিয়মিত লিখতেন সন্দেশ'-এ। ফলে 'সন্দেশ' পত্রিকাকে ঘিরে সে সময়ে বসতো চাঁদের হাট।

একেবারে প্রথমে 'সন্দেশ'-এর প্রায় সব লেখাই একাই লিখতেন উপেন্দ্রকিশোর। তবে মাস কয়েকের মধ্যেই কিছু বিশিষ্ট লেখক যোগ দিলেন 'সন্দেশ'-এ এসে। ওঁর পরিবারের মধ্য থেকেও ক্রমশঃ তৈরি হলেন বেশ কয়েকজন লেখক। উপেন্দ্রকিশোর মাত্র আড়াই বছর সম্পাদনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তারপর চোখ বুজলেন তিনি ১৩২২ বঙ্গাব্দের (১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ) পৌষ মাসে।

'সন্দেশ' বাংলা শিশু সাহিত্যে এক বিস্ময়কর বিপ্লব! এরকম সুমুদ্রিত, সুচিত্রিত, সুলিখিত পত্রিকা তখনকার দিনে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বিশেষ ছিল না। তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভাও ছিল অদ্ভুত; ছবি তুলে ও ছবির ব্লক তৈরি করে, দেশ-বিদেশের ছবি ছাপার জগতে যুগান্তর এনে দিয়েছিলেন। উপেন্দ্রকিশোরই একমাত্র ভারতীয়, চিত্রমুদ্রণ সম্পর্কে যাঁর গবেষণা এবং স্থায়ী কীর্তি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

প্রিন্টিং বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পাশাপাশি উপন্দ্রেকিশোর শিশু-কিশোরদের জন্য নানা ধরণের গল্প লিখতে শুরু করেন। লোককাহিনি অবলম্বনে রচিত হতে থাকে একের পর এক অসামান্য সুন্দর সব গল্প। সহজ, সরল ভাষায় ছোটোদের জন্য তাঁর রচিত 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' গ্রন্থ দুটি সেকাল থেকে একালেও সমান জনপ্রিয়। তাছাড়া 'সেকালের কথা', বিশেষ করে 'টুনটুনির বই' তো এক অনবদ্য সৃষ্টি।

পৌরাণিক কাহিনী, দেশ-বিদেশের রূপকথা, মৌলিক গল্প, ছড়া, কবিতা সবকিছুতেই তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ছোটোদের জন্য প্রামাণ্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। তিনি 'কলমটি তুলে যেই না ছোটোদের জন্য লিখতে শুরু করতেন, অমনি কলমের আগা দিয়ে মধু ঝরত।'

'অথৈ জলের রাজপুরী', 'বেচারাম ও কেনারাম',' গুপীগাইন বাঘাবাইন','ছেলেদের রামায়ণ', 'ছোট্ট রামায়ণ', 'ছোটদের মহাভারত', 'মহাভারতের গল্প' ক্রমাগত অ-সাধারণ সব সৃষ্টিতে মেতে ওঠেন উপেন্দ্রকিশোর।

এ-সম্পর্কে লীলা মজুমদার তাঁর অনবদ্য ভাষায় চমৎকার লিখেছেন ঃ 'দেশের সংস্কৃতি মানেই দেশের গান, গল্প, শিল্পকর্ম। উপেন্দ্রকিশোর জানতেন রামায়ণ মহাভারত সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে নিজের দেশকে চিনতে কেউ আরম্ভও করতে পারে না।.....

সেকালের পুরোনো মনগড়া গল্প না হয়ে, উপেন্দ্রকিশোরের কলমের জোরে সে সব হয়ে দাঁড়াল জীবন্ত কাহিনী, অথচ মূল গল্প কোথাও এতটুকু পালটাবার কথা মনেও আনেননি। এসব বই-এর অর্ধেক আকর্ষণ ছিল তাদের অপূর্ব সব সাদা-কালো ও রঙিন ছবি। কী রাক্ষুসে সব রাক্ষস, কী রাজকীয় রাজা, কী জোরালো সব বীর, কী করুণ দুঃখিনী সীতা!..... গল্প বলার যে কী আশ্চর্য ঢঙ! কোথাও একটা বাড়তি কথা নেই, রং চড়াবার এতটুকু চেষ্টা নেই, ন্যাকামির লেশমাত্র নেই, বুড়োমিও নেই, গুরুগিরি করার কোনো প্রয়াস নেই, এমন নিখুঁত গল্প বলার কায়দা কম দেখা যায়।'

'ছেলেদের রামায়ণ' উপেন্দ্রকিশোরের লেখা প্রথম বই। একেবারে ছোটোদের মনের মতো ভাষা তৈরি করে লেখা হ'ল সেই রামায়ণ। তাতেও তাঁর মন পরিতৃপ্ত না হওয়ায় সেই লেখাটি তিনি দেখতে দিলেন বন্ধু-রবীন্দ্রনাথকে। সেই প্রেক্ষিতে গ্রন্থের ভূমিকায় উপেন্দ্রকিশোরের বিনম্র স্বীকৃতি—'শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়ন বিষয়ে আমাকে যেরূপ উৎসাহ দান ও সহায়তা করিয়াছেন, সে ঋণ পরিশোধ করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। পুস্তকের পাণ্ডুলিপি এবং প্রুফ তিনি আদ্যোপান্ত সংশোধন পূর্বক ইহার অনেক ত্রুটি দূর করিয়া দিয়াছেন।'

'ছেলেদের রামায়ণ' প্রকাশিত হয়েছিল শিশুসাহিত্যের আরেক পুরোধা শ্রী যোগীন্দ্রনাথ সরকারের প্রকাশনা সিটি বুক সোসাইটি থেকে। কিন্তু সে বইয়ের ছাপা ছবি উপেন্দ্রকিশোরের মনঃপূত হয়নি। পরে নিজেই ছাপাখানা খুলে এবং ব্লক তৈরি করে দ্বিতীয় সংস্করণ ছেপে ছিলেন। বিলুপ্ত পশুপাখিদের নিয়ে তাঁর লেখা 'সেকালের কথা' বেরুল তাঁরই আঁকা ছবি দিয়ে, নিজের ছাপাখানায়, নিজের তৈরি ব্লকে ছাপা হয়ে। কী চমৎকার যে সে বই হয়েছিল!

দেশি-বিদেশি, চেনা-অচেনা গল্পগুলি এক আশ্চর্য ভাষায় লিখেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর! এ গল্পগুলির জুড়ি তৈরি হয় নি বিগত একশো বছরেও। গল্পের প্লটগুলি যেমন বেছে নিয়েছিলেন তিনি, তেমনি গড়ে তুলেছিলেন তাঁর নিজস্ব এক বিশিষ্ট গদ্যরীতি। সেই গল্পগুলি এমনই নিখুঁত যে আজও সে-সব তাজা ও আধুনিক বলেই মনে হয়।

গল্পমালার 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' বা 'দুঃখীরাম', কিম্বা 'জোলা আর সাতভূত' ইত্যাদি গল্পও ছোটদের আসর মাত করার সেরা হাতিয়ার। এ গল্পগুলির মানবিক আবেদনও কখনই ভোলার নয়।

উপেন্দ্রকিশোরের 'সেকালের কথা', বিশেষ করে 'টুনটুনি'-র বইটি এক অসামান্য নির্মাণ। এই বইটির পাতায় উপেন্দ্রকিশোর লিখেছিলেন, 'সন্ধ্যার সময় শিশুরা যখন আহার না করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িতে চায়, তখন পূর্ব-বঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলের

স্নেহরূপিনি মহিলাগণ এই গল্পগুলি বলিয়া তাহাদের জাগাইয়া রাখেন। সেই গল্পের স্বাদ শিশুরা বড়ো হইয়াও ভুলিতে পারে না। আশা করি আমার সুকুমার পাঠক-পাঠিকাদেরও এই গল্পগুলি ভালো লাগিবে।'

লীলা মজুমদার লিখেছেন ঃ 'সেই তাঁদের আম-কাঠালের বনে ভরা, বাঁশবাগানের ছায়া ফেলা দেশের জল মাটি হাওয়ায় জন্ম এইসব গল্পের।.... এসব সাধারণ গল্প নয়, এমন বই বাংলা ভাষায় আর দুটি নেই।'

উপেন্দ্রকিশোরের জীবনকাল ছিল মাত্র বাহান্ন বছরের। কুড়ি বছর বয়সে প্রমদাচরণ সেনের 'সখা' পত্রিকায় প্রথম রচনা প্রকাশ; তারপর গোটা জীবন কেটেছে তাঁর লেখালিখিতেই। লিখেছেন 'সখা'-য়। 'সাথী'-তে। 'সখা ও সাথী'-তে। এবং 'মুকুল'-এও। শেষে নিজেই বার করেছেন বাংলার ছোটোদের স্বপ্নের পত্রিকা 'সন্দেশ'। এখানে তিনি লিখেছেন মনের আনন্দে, লেখার বিষয় নির্বাচন করেছেন, লেখক-গোষ্ঠী গড়ে তুলেছেন; তাতে যেমন রায়—পরিবারের অনেকেই ছিলেন, তেমনি ছিলেন বাইরের শক্তিশালী লেখকেরাও।

চিত্রাঙ্কনে উপেন্দ্রকিশোরের পটুত্ব তো সর্বজনবিদিত। ছোটোবেলা থেকেই ছবি আঁকায় তাঁর সহজাত দক্ষতা ছিল বিস্ময়কর। আঁকার হাতটি বরাবরই তাঁর ভারি চমৎকার। নিজের সমস্ত লেখার ইলাস্ট্রেশন, বইয়ের মলাট (প্রচ্ছদ), সবকিছু তিনি নিজেই করতেন। তাঁর অঙ্কন-প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ।

বাংলা ভাষায় আধুনিক শিশুসাহিত্যে উপেন্দ্রকিশার রায়চৌধুরী এক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। শিশু সাহিত্যের সফল চিত্রায়ণেও তাঁকেই প্রথমে মর্যাদা দিতে হয়। উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন রীতিমিতো সুদক্ষ শিল্পী। তাঁর রেখার চলন দেখলেই তাঁর মুন্সীয়ানা টের পাওয়া যায়। রঙিন ছবি ছাপার ক্ষেত্রেও এদেশে তিনিই পথিকৃৎ। লীলা মজুমদার লিখেছেন, 'জলরঙের ওয়াশ দিয়ে তাঁর ছবি আঁকার পদ্ধতি, হাফটোনে সেগুলি ছাপার নিয়ম, এদেশে গ্রন্থশিল্পে নতুন যুগ এনে দিল।' সত্যজিৎ রায়ও বলেছেন ঃ 'ইলাস্ট্রেটর হিসেবে উপেন্দ্রকিশোরের কাছে যে দক্ষতা ও রীতিবৈচিত্র দেখা যায় তার তুলনা ভারতবর্ষে নেই।'

উপেন্দ্রকিশোরে শিশুদের উপযোগী সচিত্রকরণের সমস্ত গুণাবলীর প্রথম বিকাশ দেখা যায়। তিনি অবশ্য বাস্তবানুগ পদ্ধতিই ব্যবহার করেছেন আঙ্গিকের দিক থেকে। কিন্তু তাঁর গল্পের মতোই এমন এক দেশীয় লোকায়তিক ঐতিহ্যের ছোঁয়ায় সজল ও সরল হয়ে ওঠে সেগুলি, যে তাতে এক ভিন্ন রসের সৃষ্টি হয়। সব মিলে এক আদর্শায়িত আনন্দের জগৎ গড়ে উঠছে সেখানে। আবার তাঁর ছবি কাহিনীর সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 'যেমন ভালো ছবি আঁকতেন, তেমনি চমৎকার বেহালা বাজাতেন....।'

Prof. (Dr.) Suman Gun, Assam University, Shilchar, Assam

উপেন্দ্রকিশোরের মতো সংগীত অনুরাগী মানুষ কম দেখা যায়। এ সম্পর্কে লীলা মজুমদার লিখেছেন, 'ওস্তাদের কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখেছিলেন, তার চর্চাও রেখেছিলেন, গান শেখাতেন, নানারকম বাজনা বাজাতেন, সেতার, পাখোয়াজ, হারমোনিয়াম, বাঁশি আর বিশেষ করে তাঁর প্রাণপ্রিয় বেহালা। বিখ্যাত সঙ্গীত যন্ত্র ব্যবসায়ী ডোয়ার্কিন কোম্পানীর পত্রিকা সঙ্গীত শিক্ষার সম্পাদনার ভারও দীর্ঘকাল ছিল উপেন্দ্রকিশোরের হাতে। অনেকগুলি ধর্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন তিনি।'

ভারী চরমৎকার পাখোয়াজ বাজাতেন উপেন্দ্রকিশোর। হারমোনিয়াম, পাখোয়াজ বাঁশি, বেহালা আর সেতার বাজানোতেও উপেন্দ্রকিশোরের দক্ষতা ছিল বিস্ময়কর। বেহালাতেও তাঁর হাত ছিল অ-সাধারণ। প্রায়ই তিনি ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে বেহালা বাজিয়ে শোনাতেন।

উপেন্দ্রকিশোরের নিয়মিত যাতায়াত ছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে। প্রায় সমবয়সি রবীন্দ্রনাথের তিনি ছিলেন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বেহালা, পাখোয়াজ ছাড়াও তিনি গানও গাইতেন ভালো। এ সব কারণেই রবীন্দ্রনাথ-উপেন্দ্রকিশোরের বন্ধুত্ব হয়ে উঠেছিল নিবিড়।

মাত্র বছর দুয়েকের ছোটো উপেন্দ্রকিশোর বন্ধু রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি করেছেন। তাঁর গানের সঙ্গে বেহালা বাজিয়েছেন। কবিতার সঙ্গে ছবি এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কবিতা 'নদী'র প্রথম অলংকরণের কাজটি তাঁরই করা। পেনের সরু নিবে নদীর উৎস থেকে মোহনার পথ পরিক্রমা খুবই তারিফযোগ্য কাজ। কবির 'সাধনা' পত্রিকায় লিখেছেন উপেন্দ্রকিশোর। আবার বন্ধু উপেন্দ্রকিশোরের আঁকা চুনার দুর্গের ছবি রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের বাড়ির পড়ার ঘরে সর্বক্ষণ শোভা পেত।

উপেন্দ্রকিশোরের কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে ছিল অসামান্য প্রতিভা। 'তিনি বিদেশী প্রথায়, কাঁধে রাখিয়া ও চিবুক দিয়া চাপিয়া বেহালা বাজাইতেন এবং ছড় ধরিবার ও চালাইবার বিদেশী রীতিই তিনি ব্যবহার করিতেন।..... গানের সহিত তাঁহার বেহালায় সংগত রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পছন্দ ছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের ১১ই মাঘের সমস্বর গীত-উৎসব সঙ্গীতের সহিত তাহার বেহালার সংগত একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল।'

শোনা যায়, বাজাতে বাজাতে বহির্জগতকে ভুলে যেতেন উপেন্দ্রকিশোর। 'জয় দীন-দয়াময়', 'কে ঘুচাবে হায়রে প্রাণের কালিমা রাশি', 'বল দেখি ভাই, এমন ক'রে ভুবন কে বা গড়িল রে', 'বরফ পরে, পিতার ঘরে, মিলিনু সকলে' প্রভৃতি কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা ও সুরযোজনা করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। তাঁর 'জাগো পুরবাসী' আজও ১১ই মাঘে অবশ্যগীত সঙ্গীতগুলির অন্যতম। শিশু ও কিশোর বালক-বালিকাদের শিক্ষাদানের জন্য সেই সময়ের রবিবাসরীয় নীতি-বিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি সঙ্গীত

শিক্ষাদানের ক্লাস খুলেছিলেন। প্রায় একাই পরম ধৈর্য্য ও যত্নের সঙ্গে ছোটোদের সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর যে কয়েকটি রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তা দিয়েই উপেন্দ্রকিশোরের সাঙ্গীতিক চিন্তাধারার একটি স্পষ্ট পরিচয় আমরা পাই। তাঁর রচিত 'হারমোনিয়াম-শিক্ষা' ও 'বেহালা-শিক্ষা' শীর্ষক গ্রন্থ দু'টি অত্যন্ত মূল্যবান। ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর 'শিক্ষক ব্যতিরেকে হারমোনিয়ম শিক্ষা' গ্রন্থটি। 'হারমোনিয়াম শিক্ষা'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ পায় ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে। আর তাঁর 'বেহালা শিক্ষা'র প্রকাশকাল ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দ।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বিধুমুখী দেবীকে বিবাহ করেন উপেন্দ্রকিশোর। বিধুমুখী ছিলেন সুবিখ্যাত ব্রাহ্মপণ্ডিত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যারে কন্যা। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে উপেন্দ্রকিশোর তার পুত্র সুকুমার রায়ের বিবাহ স্থির করেন। সেই নিমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ জমিদারির কাজ ফেলে শিলাইদহ থেকে ছুটে এসেছিলেন বন্ধু-পুত্র সুকুমারের বিবাহ অনুষ্ঠানে। সুকুমার রায়ের স্ত্রী সুপ্রভা দেবীও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহধন্যা ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে গানও শিখতেন।

উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন অনন্যসাধারণ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। প্রাচ্য ও পাশ্চাতের চমৎকার সমন্বয় ঘটেছিল উপেন্দ্রকিশোরের মধ্যে। তাঁর মতো উদার, আধুনিক মনের মানুষ কম দেখা যায়। **সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা, সম্পাদনা ও মুদ্রণশিল্পে** তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় রেখে গেছেন। যে-কোনো দেশে এ ধরণের মানুষ কালেভদ্রে এক-আধটা জন্মায়।

সহায়ক গ্রন্থাবলী ও পত্রিকা ঃ

লীলা মজুমদার ঃ উপেন্দ্রকিশোর, নিউস্ক্রিপ্ট, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬২
বিজিত ঘোষ ঃ সত্যজিৎ রায়, গ্রন্থতীর্থ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১১
বিজিত ঘোষ ঃ নানারূপে সত্যজিৎ, পুনশ্চ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৬
কোরক সাহিত্য পত্রিকা ঃ সুকুমার সংখ্যা, ১৪০৯

রায়বাড়ির অর্থনৈতিক চিন্তা ঃ উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার

শুভঙ্কর রায়

বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত শিল্পসাহিত্যের নান্দনিকচর্চার সঙ্গে যুক্ত ভারতীয়দের মনে কমবেশি একটি সংস্কারের উপস্থিতি দেখা যেত যে কলাচিন্তার সঙ্গে অর্থনীতিচিন্তার যোগ থাকতে পারে না। বৈষয়িক চিন্তা শিল্পচিন্তাকে দূষিত করে এই বোধে তাঁরা উৎপাদনব্যবস্থা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, পুঁজি সম্প্রসারণ প্রভৃতি প্রসঙ্গে অনাগ্রহী থাকতেন। বিশেষত পুঁজি-প্রযুক্তির মতো উৎপাদনবিষয়ক উপাদানগুলি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের সৃষ্টি করে বলে এইসব বিষয় সম্পর্কে একধরনের প্রত্যাখ্যান প্রবণতা সৃষ্টিশীল মানুষদের চিন্তায় এবং আচরণে নির্বাধে প্রকাশ পেত। দেশের সমাজ-অর্থনীতির পরিকাঠামো বিষয়ে চিন্তাশীল মানুষরা অবহিত এবং সজাগ ছিলেন না, এমনটা কিন্তু নয়। তাঁদের মনোভাবের মানচিত্র ছিল এইরকম, আধুনিক যুগে ব্রিটিশ বাহিত পুঁজিবাদী শিক্ষা, দর্শন এবং প্রযুক্তি ভারতীয় সমাজমানসিকতার পক্ষে বিষসম। বিশেষত প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ভারতীয় সমাজের মানবিক ও জনমঙ্গলকারী মনের অপমৃত্যু ঘটাচ্ছে। ভারতবাসীর মনকে নির্বিবেক যান্ত্রিকতায় আক্রান্ত করছে। পরিণামে শিল্পদূষণ বা কলাদূষণ ঘটছে। সৃষ্টিশীলতার সরস্বতী ছেড়ে ধনাড়ম্বরবাদী লক্ষ্মীর দলভুক্ত হয়ে পড়বেন কলালক্ষ্মীর চর্চাকারীরা এমন আশঙ্কা রবীন্দ্রনাথেরও ছিল। শঙ্কাতাড়িত চিত্তে রবিঠাকুর লিখছেন, "আজ মানুষের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্‌ভাবনা হঠাৎ অত্যন্ত বিপুল হয়ে উঠেছে। তার ফল অত্যন্ত প্রভূত, জিনিস উৎপন্ন হচ্ছে অসংখ্য আকারে অসম্ভব বেগে, সংখ্যায় এবং পরিমাণে, শক্তির দুঃসাধ্যতায় ও কৌশলে মানুষের মনকে অভিভূত করে দিয়েছে। লোভে এবং দুরাকাঙ্খায় মানুষ আপন প্রাণকে পীড়িত করে মানবসম্বন্ধকে ভেঙে চুরে যন্ত্রকে ও বস্তুকে মনুষ্যত্বের চেয়ে বড়ো করে তুলছে। তার এই শক্তিমদমত্ততার অবস্থায় যন্ত্রশক্তির প্রকাশকেই সে যদি বলিষ্ঠ বলে আস্ফালন করে এবং প্রাণের প্রকাশকে হৃদয়ের প্রকাশকে বলে সেন্টিমেন্টাল দুর্বলতা তা হলে তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে, সুন্দর দুর্বলও নয় সবলও নয়, তা সুন্দর, তার শ্রেষ্ঠতা যদি এই বলে বিচার করতে চাই যে সে এক সেকেণ্ডে কয়বার চাকা ঘোরাতে পারে কিম্বা তার উৎপাদনের সংখ্যা কত তা হলে বলব সেটা বর্বরতা।"[১] যান্ত্রিক শ্রেষ্ঠত্বকে যাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের কাছে যে তাঁরা বরাবরই 'বর্বর'-রূপে গৃহীত হয়েছেন

রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের হ্রস্ব-দীর্ঘ পরিচয় রয়েছে তাঁরা এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল। বিশেষত বিশ শতকের বিশের দশকে জাপান, ইউরোপ এবং আমেরিকা সফরের পর রবীন্দ্রনাথ পুঁজিবাদ সম্পর্কে তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করেছেন সৌজন্যের আবরণ অগ্রাহ্য করে। ১৯২০ সালের শেষের দিকে আমেরিকা সফরের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"অনবচ্ছিন্ন সাত মাস আমেরিকায় ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলেম। দানব মন্দ অর্থে বলছি নে, ইংরেজিতে বলতে হলে হয়তো বলতেম, টাইট্যানিক ওয়েল্‌থ্‌। অর্থাৎ, যে ঐশ্বর্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল। হোটেলের জানলার কাছে রোজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ-তলা বাড়ির ভ্রূকুটির সামনে ব'সে থাকতেম, লক্ষ্মী হলেন এক, আর কুবের হল আর—অনেক তফাত।"[২] 'লক্ষ্মী' এবং 'কুবের'—এর দ্বন্দ্ব মুখরিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের দুটি গুরুত্বপূর্ণ নাটক 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'-তে। রবীন্দ্রনাথের পুঁজিবাদবিরোধী যে মন্তব্য দুটি আমরা উদ্ধৃত করেছি তারা যে দুটি প্রবন্ধের অংশ সেই দুই প্রবন্ধ অথবা উল্লিখিত নাটক দুটি রবীন্দ্রনাথ যখন লিখেছিলেন তখন তিনি নোবেলজয়ী সাহিত্যিক। আপামর বিশ্বের কাছে শ্রদ্ধেয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং মন্তব্য গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হয়। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পেয়েছিলেন ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে। তার দুবছর আগে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি নিয়ে চব্বিশ বছরের এক বাঙালি যুবক লণ্ডন যাত্রা করেছিলেন 'এরেবিয়া' নামের জাহাজে। যুবকের নাম সুকুমার রায়। সুকুমারের পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। উপেন্দ্রকিশোর তাঁর তরুণ পুত্রকে বিলেত পাঠিয়েছিলেন ফটোগ্রাফি এবং মুদ্রণপ্রযুক্তি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য। উপেন্দ্রকিশোরের পরিকল্পনা সুকুমারের সামনে নতুন এক জগৎ উন্মুক্ত করল, "বইপড়া বিদ্যা দেশে থাকতেই যথেষ্ট আয়ত্ত ছিল, এবার তার প্রয়োগও দেখে চোখকে সার্থক করার সুযোগ মিলেছিল।"[৩] রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ্‌ উপেন্দ্রকিশোর পুত্র সুকুমারকে পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য পাঠিয়েছিলেন শিল্পবিপ্লবের দেশে। আর পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার ভিত্তি যে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, তারই একটি অংশ মুদ্রণপ্রযুক্তির উন্নততর পাঠ হাতেকলমে অর্জন করার সুযোগ পুত্রের সামনে খুলে দিয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। রবীন্দ্রনাথ পুঁজিবাদী দর্শনের অভ্যন্তরীণ 'লোভে এবং দুরাকাঙ্ক্ষায়' যেমন তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন সেইসঙ্গে 'যন্ত্রশক্তির' 'শ্রেষ্ঠতা'-র বিরুদ্ধেও তিনি তীব্র আক্রমণাত্মক। সমাজবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পুঁজিবাদের সঙ্গে যন্ত্রশক্তির শ্রেষ্ঠত্বের নিকট সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু উভয়ই যে একাত্ম এমন ভাবনা ত্রুটিমুক্ত হবে না। কারণ সমাজতান্ত্রিক সমাজে বা রাষ্ট্রে যান্ত্রিক বা প্রযুক্তিগত উন্নয়ন স্তব্ধ থাকে না। তাহলে প্রশ্নটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় শ্রেণিভিতে—প্রযুক্তির উন্নয়ন ব্যবহার করা হবে কার স্বার্থে? সুবিধেভোগী শ্রেণির স্বার্থে, না, সর্বহারার শ্রেণিস্বার্থে?

তবে সুকুমার বিলেতে যে প্রযুক্তিপাঠ নিতে গিয়েছিলেন তা ছিল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত। যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় ঘোর আপত্তি ছিল রবীন্দ্রনাথের। প্রযুক্তি ও পুঁজিনিয়ন্ত্রিত শিল্পোৎপাদন কে মধ্যমণি করলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোর ও তাঁর পুত্র সুকুমারের অবস্থান ছিল সম্যক বিপরীত। যদিও ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে সুকুমারের লণ্ডন যাত্রার পর ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে লণ্ডন পৌঁছান রবীন্দ্রনাথ। তখনও তিনি নোবেলজয়ী সাহিত্যিক নন, এমনকি তাঁর সাহিত্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য তেমন পরিচিতও নয়। রবীন্দ্রনাথের সেবারের ইংলণ্ড সফরের সময় সেখানকার চিন্তাশীল মানুষদের কাছে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সাহিত্যের পরিচয় তুলে ধরার দায়িত্ব পালন করেছিলেন তরুণ সুকুমার। ২১ জুন ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে লেখা একটি চিঠিতে সুকুমার মেজবোন পুণ্যলতা চক্রবর্তী-কে জানাচ্ছেন কলকাতার লণ্ডন-মিশনারী কলেজ এর জীববিদ্যার অধ্যাপক ডবলিউ. ডবলিউ. পিয়র্সন—এর লণ্ডনস্থ বাসগৃহে আয়োজিত ঘরোয়া সভার কথা। ১৯ জুন ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত এই সভায় সুকুমার বাংলা সাহিত্য বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। যার অন্যতম প্রসঙ্গ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রবন্ধের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা অনুবাদ করে সুকুমার তা অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। সেই সুবাদে রবীন্দ্রনাথের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন বিলেতের চিন্তাজীবীরা।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আগমন এবং তৎপরবর্তীকালে ব্রিটিশ পুঁজিবাদের সান্নিধ্যে ভারতীয় পুঁজিবাদের অঙ্কুরোদ্‌গম ঘটেছিল। ভারতীয় পুঁজির বিকাশের প্রক্রিয়ায় যাঁরা নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দা। "কার টেগোর অ্যান্ড কোম্পানি নামে ম্যানেজিং এজেন্সির প্রাণপুরুষ দ্বারকানাথ ক্যালকাটা স্টিম টাগ অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করার মাত্র মাসখানেক আগে কিনেছিলেন রানীগঞ্জের কয়লাখনি। বলাই যেতে পারে যে, ১৮৩৬-এর দিন তিরিশের মধ্যে দ্বারকানাথ তাঁর কয়লা ও বাষ্পীয় উদ্যোগের সাম্রাজ্যের বীজ বপন করেন।"[৪] প্রযুক্তি-ঐতিহাসিক সিদ্ধার্থ ঘোষ জানিয়েছেন দ্বারকানাথের আমলে রানীগঞ্জ কয়লাখনিতে প্রথম বাষ্পশক্তির ব্যবহার হয়েছিল।[৫] ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার বিকাশের পাশাপাশি প্রযুক্তিশিক্ষায় এদেশের মানবসম্পদের সংযুক্তির প্রসঙ্গটিও দ্বারকানাথের চিন্তানিহিত যে ছিল তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন সিদ্ধার্থবাবু। সিদ্ধার্থ ঘোষ জানাচ্ছেন, "চিকিৎসাবিদ্যার প্রসারে দ্বারকানাথের অবদানের কথা সুবিদিত হলেও ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠক্রম প্রবর্তনের ব্যাপারে তাঁর উদ্যোগের কথা আজ অবধি কেউ উল্লেখ করেননি। ১৮৪৪-এর ২১ ফেব্রুয়ারি কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সেক্রেটারিকে তিনি চিঠি লিখে জানান যে, হিন্দু কলেজে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিঙের 'চেয়ার' সৃষ্টি হলে তিনি প্রতি মাসে সেই বাবদ ১৫০ টাকা করে অনুদান দান দিতে আগ্রহী।"[৬] লক্ষণীয় ভারতে পুঁজিবাদের

সম্প্রসারণের যে প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর সেখানে জাতীয় স্বার্থের প্রসঙ্গটিও তাঁর পরিকল্পনার মধ্যেই ছিল। ব্যক্তিস্বার্থপ্রবণ পুঁজিপতি হিসেবে দ্বারকানাথ ঠাকুর-কে চিহ্নিত করার প্রয়াস অন্যায় হবে। ভারতবর্ষে পুঁজির বিকাশ এবং প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদনব্যবস্থার প্রসারণই যে ভারতবর্ষকে ক্রমশ ব্রিটেন-এর প্রতিস্পর্ধী শক্তি করে তুলবে তা উপলব্ধি করেছিলেন দ্বারকানাথ। দ্বারকানাথের উন্নতিকে তাই জাতীয়তাবাদী পুঁজিশক্তি বা **Nationalist Capitalist** শ্রেণির উত্থান রূপে আমরা অভিহিত করতে পারি সমাজবৈজ্ঞানিক পরিভাষায়। দ্বারকানাথের দূরদর্শিতার অধিকারী ছিলেন না পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ/ সিদ্ধার্থ ঘোষ যথার্থভাবেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছেন, "দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তারপরে রবীন্দ্রনাথেরও ব্যবসায়ে অনীহা ছিল এবং প্রধানত সেই কারণেই আজও দ্বারকানাথের শুধু 'প্রিন্স' স্বরূপটিই আমাদের চোখে পড়ে।.....ঐতিহাসিকরা বারবার লিখেছেন যে, দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর তাঁর বিপুল দেনার দায়িত্ব বহন করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের নিজস্ব কী আয় ছিল—যার সাহায্যে তিনি এই দেনা পরিশোধ করেন, এ-প্রশ্ন কেউ করেননি। আসলে, দেবেন্দ্রনাথ শিল্প ও বাণিজ্যের সঙ্গে সংস্রব ছিন্ন করে ভূসম্পত্তি রক্ষায় মন দিয়েছিলেন। সুমিত সরকার ভিন্ন প্রসঙ্গে (দ্র. **'The Swadeshi Movement in Bengal'**) হলেও উল্লেখ করেছেন যে, দ্বারকানাথের পর জোড়াসাঁকোর ঠাকুররা শুধু ভাড়ার টাকায় দিন গুজরান করেছেন। দ্বারকানাথ আর-একটু সুবিচার পেতেন যদি আমরা তাঁর ডায়েরিটা খেয়াল করে পড়তাম। কিশোরীচাঁদ মিত্রের লেখা জীবনীগ্রন্থে (দ্র. কিশোরীচাঁদ মিত্র-র 'দ্বারকানাথ ঠাকুর', অনুবাদ-দ্বিজেন্দ্রনলাল নাথ) উল্লিখিত এই ডায়েরি থেকে জানা যায়, বিদেশ ভ্রমণকালে দ্বারকানাথ যে উৎসাহে রাণী-সংসর্গ করছেন, তেমনই চষে বেড়াচ্ছেন কয়লাখনি অঞ্চল, ইস্পাত ও জাহাজ নির্মাণের কারখানা।"[৭] দ্বারকানাথের এই উৎপাদনউদ্যোগী ভূমিকার প্রতিফলনের একমাত্র দেখা মিলেছিল পৌত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যে। বিদেশি স্টিমার কোম্পানির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জলপথ পরিবহণ ব্যবসায়ে। খুলনা থেকে বরিশাল পর্যন্ত নৌপরিবহণের নির্ধারিত পথে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পাঁচটি জাহাজ চলাচল করত—'সরোজিনী', 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'স্বদেশী', 'ভারত' এবং 'লর্ড রিপন'। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর মালিকানাধীন জাহাজগুলির যে নামকরণ করেছিলেন সেদিকে খেয়াল করলে বিস্মিত হতে হয়। ঠাকুর্দা দ্বারকানাথের পুঁজিবিকাশ চিন্তার মধ্যে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার অনুপ্রেরণা ছিল তা যেন প্রভাবিত করেছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে। তাই জাহাজের নামকরণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রাধান্য দিয়েছিলেন স্বদেশিভাবনাকে। সিদ্ধার্থ ঘোষ দেখিয়েছেন এই

ঘটনায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া হয়েছে অদূরদর্শীর মতো। এমনকি রবীন্দ্রাথের বিরুদ্ধে তিনি ইতিহাস বিনষ্টের অভিযোগও এনেছেন, "জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই ব্যবসার সাফল্য নয়,অকালমৃত্যুকে সাহিত্যে গৌরবান্বিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রখর ব্যবসাবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষকে, সে তাঁর স্বয়ং পিতামহ হলেও বরদাস্ত করতে পারতেন না রবীন্দ্রনাথ। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন (দ্র. 'দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী'), রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে দ্বারকানাথের ব্যবসা-সংক্রান্ত অমূল্য নথিপত্র ধ্বংস করেছিলেন।"[৮] দ্বারকানাথ ঠাকুর ভারতীয় অর্থনীতি এবং উৎপাদনব্যবস্থা সবল করার জন্য গ্রহণ করেছিলেন ধনতন্ত্রের পথ। কিন্তু তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ এবং পৌত্র নোবেলজয়ী সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ উৎপাদন-প্রগতির বিপরীত পথে হেঁটে আঁকড়ে রইলেন সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্য। দ্বারকানাথের এক অন্যতম উত্তরসূরির দেখা মিলল যিনি ঠাকুরবাড়ির সদস্য নন, কিন্তু ঠাকুরবাড়ির ঘনিষ্ঠজন রবীন্দ্রনাথের কাছের মানুষ—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

উপেন্দ্রকিশোর যে সময়ের মানুষ ছিলেন সেই সময়টাকে লীলা মজুমদার ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে,"ইংল্যান্ডে ভিক্টোরীয়া যুগ তখন মধ্যগগনে, সেখানকার নবোদ্যমের হাওয়া ভারতেও এসে পৌঁছেছিল। জাতীয়তাবোধের নতুন ধারণার অঙ্কুরোদ্গমের পাশাপাশি, কিংবা এর ফলাফল হিসেবে, বাণিজ্যিক উদ্যমের ক্ষেত্রে সাহসী পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়েছিল। দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী দেশের তৈরী কাপড় ও অন্যান্য জিনিশপত্রের উৎপাদন ও বিক্রির জন্য সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন দেশপ্রমী মানুষেরা। যদিও সরকারী ফেরি ব্যবস্তার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে হয়েছিল, চ্যালেঞ্জটা থেকেই গেল। ভিক্টোরীয় উদ্যম, শক্তি ও দৃঢ়তার গুণগুলি বুদ্ধিজীবীদের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পালে নতুন হাওয়া লেগেছিল।"[৯] লীলা মজুমদার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার মধ্য থেকে 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের' স্বরূপটি লক্ষ্য করা যায়। এই জাতীয়তাবোধের একদিকে রয়েছে 'বাণিজ্যিক উদ্যম', যার অন্তর্ভুক্ত দেশজ 'উৎপাদন ও বিক্রি'। অন্যদিকে রয়েছে 'বুদ্ধিজীবীদের' ভূমিকা, তাঁরা নিজস্ব ভঙ্গিতে ছড়িয়ে দেবেন জাতীয়তাবাদী চেতনা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এটাই ছিল ভারতীয় বুর্জোয়ার 'চ্যালেঞ্জ'। উপেন্দ্রকিশোর তাঁর মতো করে 'চ্যালেঞ্জ' গ্রহণ করেছিলেন,"বিদ্যা ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পৃথিবীতে উন্নত দেশগুলির মধ্যে প্রধান ইংল্যান্ডে সেসময় যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো, সেই পদ্ধতিকে আরো উন্নত করতে ও নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করতে নানাধরনের নিরীক্ষা করার সাহস দেখিয়েছিলেন তিনি। তাঁর এই উদ্ভাবনা ইউরোপেও প্রশংসিত ও গৃহীত হয়েছিল এবং তা পেনরোজেস্ এ্যানুয়ালের মতো ফটোগ্রাফি ও প্রযুক্তিবিষয়ক পত্রিকায় উল্লিখিত হয়েছে।"[১০]

উপেন্দ্রকিশোরের পালকপিতা হরিকিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন ময়মনসিংহ অঞ্চলের এক জমিদার। উপেন্দ্রকিশোরকে দত্তক নেওয়ার পর হরিকিশোরের এক আত্মজের জন্ম হয়, যাঁর নাম নরেন্দ্রকিশোর! স্নেহবৎসল হরিকিশোর এবং তাঁর স্ত্রী দুই পুত্রের মধ্যে কখনই কোন পার্থক্য তৈরি করেননি। উপেন্দ্রকিশোর ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন এবং দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর জ্যেষ্ঠা কন্যা বিধুমুখী দেবী-কে বিবাহ করেছিলেন। এসবসত্ত্বেও পালক পিতামাতার স্নেহের আশ্রয় থেকে বিন্দুমাত্র বঞ্চিত হননি উপেন্দ্রকিশোর। হরিকিশোরের মৃত্যুর পর তাঁর অর্ধেক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন উপেন্দ্রকিশোর। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে তিনি ফিরলেন না। ভাই নরেন্দ্রকিশোর জমিদারির দেখাশোনা করতেন আর দাদা উপেন্দ্রকিশোরের কাছে তাঁর জন্য নির্ধারিত আয়ের অংশ পাঠিয়ে দিতেন কলকাতায়। উপেন্দ্রকিশোর গড়ে তুললেন মুদ্রণশিল্পের ব্যবসা—'ইউ রে অ্যান্ড সন্স'। জমিদারি অর্থনীতি থেকে উপেন্দ্রকিশোর সরে আসছেন পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে। আবার শুধু শিল্পপতি পরিচয়ের মধ্যেই নিজেকে সীমায়িত রাখছেন না তিনি। উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন বিজ্ঞানী, শিল্পী, সাহিত্যিক এবং সংগীতজ্ঞ। বিশেষত বাংলার শৈশবের সাংস্কৃতিক বিকাশে উপেন্দ্রকিশোর এবং তাঁর 'সন্দেশ' পত্রিকার ভূমিকা অবিস্মরণীয়। আর এখানেই উপেন্দ্রকিশোরের মধ্যে জাতীয়তাবাদীর প্রকাশ দেখেছেন লীলা মজুমদার,"পুরনো সমাজের ধ্বংসাবশেষের ভিতর থেকে যে নতুন সমাজ বেরিয়ে আসছে, সেই সমাজকে একটা চরিত্র দিতে চাইছিলেন এমন তরুণেরাই। নিজের নিজের কাজের মধ্যে দিয়ে তাঁরা প্রত্যেকেই একএকজন দেশপ্রেমিক। এঁরা রাজনীতির মধ্যে যাননি, কিন্তু এঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল উচ্চ চারিত্র্যযুক্ত একটা সবল জাতিগঠন।"[১১] এই 'জাতিগঠন' প্রয়াসের এমনই একটা উদাহরণ দিয়েছেন লীলা মজুমদার, "সাধারণ উদারনৈতিক শিক্ষায় উপেন্দ্রকিশোরের বিশ্বাস ছিল, এই কারণে তিনি সময় করে ছেলেমেয়েদের সবাইকে নিয়ে যেতেন স্বদেশী মেলায়, যা তখন মাঝে মাঝে অনুষ্ঠিত হতো। শিল্পবিষয়ক স্টলগুলিতে তাদের নিয়ে যেতেন, সেখানে নানা কারিগরী উদ্ভাবনগুলি দেখানো হতো। ছেলেমেয়েদের তিনি সব খুঁটিনাটি বিষয় বুঝিয়ে বলতেন, তাই শুনতে লোকেরাও হুমড়ি খেয়ে পড়তো।"[১২] কারিগরী এবং প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা শিশুমনে এবং গণমনে সম্প্রসারণে উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন বিশেষ যত্নশীল। আবার প্রযুক্তিগত গবেষণায় মুদ্রণশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাশ্চাত্য প্রযুক্তিবিদ্দের টক্কর নেমেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর এবং সুকুমার। মেধা এবং উৎপাদন উভয়ে ক্ষেত্রে পিতাপুত্রের এই সংগ্রাম জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক সংগ্রামের তুলনায় কোন অংশে ন্যূন ছিল না। "মুদ্রণ বিশারদ উপেন্দ্রকিশোর রায়ের কারিগরি গবেষণা এই প্রসেস ক্যামেরা-সংক্রান্ত। প্রসেস ক্যামেরা ব্যবহারের পদ্ধতির মধ্যে গাণিতিক নির্ভুলতা আনা ও এই ক্যামেরাকে অভিনব

ভাবে ব্যবহার করার বহু উপায় তিনি বাতলেছিলেন। সেকালের মুদ্রণজগতের লোকের কাছে 'পেনরোজ' পত্রিকাটি ছিল বাইবেলের মতো। এই পত্রিকায় ১৮৯৭ থেকে ১৯১২-র মধ্যে উপেন্দ্রকিশোরের ন'টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র সুকুমারের দু'টি হাফটোন সংক্রান্ত গবেষণাপত্রও এই 'পেনরোজ' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। পিতা-পুত্রের এই গৌরবে আজ অবধি দ্বিতীয় কোনো বাঙালি ভাগ বসাতে পারেনি।"[১৩]

পুত্র সুকুমারকে উপেন্দ্রকিশোর ইংলণ্ড পাঠালেন মুদ্রণপ্রযুক্তির পাঠ নেওয়ার জন্য। ইংলণ্ড-এর পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা যুবকটিকে রীতিমতো মুগ্ধ করেছিল। বোন টুনি ওরফে শান্তিলতাকে চিঠিতে লিখছেন সুকুমার—"এর মধ্যে একদিন একটা প্রকাণ্ড ছাপাখানা দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। ৭ তলা বাড়ি— Electric lift এ চ'ড়ে উপরে উঠলাম। এক জায়গায় একটা প্রকাণ্ড প্রেসে একটা magazine ("The Race Horse") ছাপা হচ্ছে। একটা প্রকাণ্ড রোলারের উপর মাইল ২/৩ লম্বা কাগজের Roll জড়ান রয়েছে। সেই কাগজটা এক দিক দিয়ে ঢুক্‌ছে আর এক [দিক] দিয়ে ছাপান, ভাঁজ করা আস্ত magazine টা ঝুর ঝুর ক'রে পড়ছে—ঘড়ি দিয়ে দেখ্‌লাম মিনিটে দুশোটা magazine বেরোচ্ছে—ভোঁ ভোঁ ক'রে এমন একটা ভয়ানক শব্দ হচ্ছে যে কাছে গেলে কান বন্ধ হ'য়ে আস্‌তে চায়।"[১৪] যান্ত্রিক শক্তির এই ক্ষমতাবৃদ্ধি রবীন্দ্রনাথের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। যন্ত্রক্ষমতার উন্নয়ন প্রত্যাখাত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে,"এবং সেইসঙ্গে এটাও মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, যন্ত্রের অপরিমিত জটিলতা, তার বিকট আওয়াজ, তার দুরন্ত বেগ ও দুর্‌মূল্য উপকরণ, যাতে করে সে বর্তমান যুগের মনকে ছেলে-ভোলানোর মতো করে ভোলায়, সেটাতে তার শক্তির চেয়ে অশক্তিরই পরিচয় বেশি।"[১৫] কিন্তু সুকুমার প্রযুক্তিকৌশল এবং যান্ত্রিক উন্নয়নের মধ্যে 'অশক্তিরই পরিচয়' দেখেননি, বরং তিনি খুঁজতে চাইছেন প্রযুক্তির উন্নতিসাধনের মাধ্যমে উৎপাদনক্ষমতা বাড়ানোর কৃৎকৌশল। প্রযুক্তির মেধাবী ছাত্র সুকুমারের মনোভাবের মধ্যে যন্ত্রনির্ভর উৎপাদনে ভারতবর্ষের স্বাবলম্বন অর্জনের তীব্র আগ্রহের প্রতিফলন নজরে পড়ে। পিতা উপেন্দ্রকিশোরকে একটি চিঠিতে সুকুমার লিখছেন—"যতই দেখছি ততই মনে হ'চ্ছে আমাদের Halftone-এর সঙ্গে একটা Litho department দরকার। কেবল যে poster, lable এই সবেতেই খুব সুবিধা পাওয়া যাবে তা নয়— আমার মনে হয়—অনেক জায়গায় এখন যেখানে হাফ্‌টোন ক'রে ছাপি—সেখানে একটা zinc -এর উপর দশ বারোটা litho transfer খুব সহজেই ক'রে নেওয়া যায় তা থেকে ১০০০ ছাপ্‌লেই একেবারে ১০০০০/১২০০০ ছাপা হ'য়ে যাবে। আমার মনে হয় এই রকম পাতলা zinc sheet-এ litho ক'রে ফেল্লে তাতে বইটই পর্য্যন্ত ছাপা চলে। 150 lines-এর litho transfer ক'রে ছাপ্‌লে সেটা সাধারণ halftone-এর চেয়ে

কোনমতেই খারাপ হবে ব'লে বোধহয় না। তবে প্রথম খরচটা কিছু পড়্‌বে । £150 কিম্বা £ 200 না হলে একটা সুবিধামত rotary litho press হবে না। Flat bed litho আরও কম হ'তে পার্‌বে, কিন্তু তাতে সুবিধা হবে কিনা এখনও বুঝ্‌তে পারিনি।"[১৬] যন্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করার জন্য তরুণ সুকুমার নিজের জন্য যে সুচিন্তিত পরিকল্পনা তৈরি করে নিয়েছিলেন তার উদাহরণ হতে পারে মেজ বোন খুসী বা পুণ্যলতাকে লেখা এই চিটিইট— "মোটের উপর দেখছি স্কুলে অতি সামান্যই শেখা যাবে। তবে যে সব Process আগে করিনি, সেগুলো হাতে-কলমে করে বেশ একটা working knowledge হতে পারবে। পরে বড় বড় factory-তে গিয়ে কাজ দেখলে আরও সুবিধা হতে পারে।"[১৭] রবীন্দ্রনাথের কাছে "কারখানাঘর কুশ্রী কেননা মানুষের অশক্তিই এখানে উৎকট হয়ে উঠেছে,",[১৮] কিন্তু সুকুমারের অবস্থান উল্টোদিকে। উপেন্দ্রকিশোরকে অপর একটি চিঠিতে সুকুমার লিখেছিলেন—"Intaglio Block থেকে Litho transfer নিয়ে ছাপা শিখছি। Intaglio ব্লক ক'রে তা থেকে transfer নিয়ে ছাপলে চমৎকার result পাওয়া যায়—খুব সুন্দর collotype এর মত effect —বিশেষতঃ যদি offset প্রেসে ছাপা হয়। অল্প ছাপতে হ'লে (৫০০ কি ১০০০) halftone-এর প্রায় ডবল খরচ পড়ে—কিন্তু ১০০০০ কি ২০০০০-এর Edition হ'লে অনেক শস্তা পড়ে। এখন মনে হচ্ছে বিলেতে আসায় অনেক উপকার হচ্ছে।"[১৯] ইংলণ্ড-এর পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার ছাত্র সুকুমারের মধ্যে এক পুরোদস্তুর উদ্যোগপতির বিকাশ ঘটছিল। চিঠিতে পিতাকে মুদ্রণশিল্পসংক্রান্ত যে পরিকল্পনার কথা সুকুমার জানিয়েছেন সেটি বিশ্লেষণ করলে এক দূরদর্শী শিল্পপরিচালকের খোঁজ তার মধ্যে খুব সহজেই পাওয়াযায়—"Wet plate ব্যবহার ক'রে আমি কোনই advantage দেখলাম না। অবিশ্যি, dot গুলো একটু clean হয়, (Highlight গুলো close up কর্‌তে proportionate বেশী exposure দরকার হয়) আর actual cost of materials একটু শস্তা পড়ে—কিন্তু তাছাড়া আর সকল বিষয়েই inferior—হাঙ্গামা অনেক বেশী, exposure আর development latitude কম, আলাদা darkroom, dark slides ইত্যাদি দরকার, Intelligent labour অনেক বেশী দরকার (বোধহয় একজন extra লোক রাখতে হবে)।[২০]

আলোচনার শুরুতে প্রযুক্তিগত উৎপাদন এবং ধনতান্ত্রিক দর্শন এই দুটি বিষয়কে আমরা পৃথক করেছিলাম। পুঁজিবাদী ব্রিটিশের উপনিবেশ ভারতের নাগরিক উপেন্দ্রকিশোর এবং সুকুমারের সামনে পুঁজিকেন্দ্রিক উৎপাদনপ্রক্রিয়া শিক্ষণের সুযোগই উন্মুক্ত ছিল। সেই সুযোগটি তাঁরা গ্রহণ করেছেন। দ্বারকানাথের পরবর্তী প্রজন্ম বাণিজ্যবিমুখ হয়ে পড়েছিলেন বা যে উৎসাহে ভারতীয় পুঁজির জন্ম হয়েছিল তার বৃদ্ধির রেখচিত্র কেন

দ্রুত নিম্নগামী আকার নিয়েছিল সেই কারণ খুঁজতে গেলে ব্রিটিশ পুঁজির স্বার্থের বিষয়টি সামনে চলে আসে। ব্রিটিশ পুঁজি তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ভারতীয় পুঁজির উত্থানকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত ছিল না। তাই ভারতীয় পুঁজির বিকাশের হার ধীরগতিপ্রাপ্ত হয়েছিল ব্রিটিশ পুঁজিশক্তির চক্রান্তে। ব্রিটিশ পুঁজির সঙ্গে সংঘাতের প্রস্তুতির জন্য তার উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক পরিকাঠামো সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অর্জন ছিল জরুরী। তার পরবর্তী স্তরে ছিল সেই উৎপাদনব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা। উপেন্দ্রকিশোর এবং সুকুমার এগিয়েছিলেন এপথেই। কিন্তু পুঁজিবাদী দর্শনে তাঁরা গ্রস্ত হয়ে পড়েননি। সুকুমারের 'আবোল তাবোল'-এর অন্তর্ভুক্ত একটি জনপ্রিয় কবিতা হল 'খুড়োর কল'। 'চন্ডীদাসের খুড়ো'-র তৈরি করা যন্ত্রটি জুড়ে দেওয়া হয় ঘাড়ের সঙ্গে। 'কল'-এর সামনে ঝোলানো হয় লোভনীয় খাবার। যে ব্যক্তির ঘাড়ের সঙ্গে 'খুড়োর কল' জুড়ে দেওয়া হয়েছে সে 'লোভের টানে খাবার পানে চেয়ে, / উৎসাহেতে হুঁস রবে না চলবে কেবল ধেয়ে'। 'লোভের টানে'-ই দৌড়ে চলবে, কিন্তু খাবারের নাগাল মিলবে না। 'সন্দেশ' পত্রিকায় 'খুড়োর কল' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায়। সমভাবের আরেকটি কবিতা লিখেছিলেন সুকুমার 'অসম্ভব নয়!' নামে। 'সন্দেশ' পত্রিকার ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল দ্বিতীয় কবিতাটি। দুটি কবিতার পত্রিকাপ্রকাশের কালগত ফারাক দুবছরের। দ্বিতীয় কবিতায় সুকুমার বলছেন এক সাহেব তার লম্বা নাকে মুলোর ঝুঁটি ঝুলিয়ে উঠে বসল তার বাহন গাধাটির পিঠে। সেই গাধা—

"মুলোর গন্ধে টগবগিয়ে
দৌড়ে চলে লম্ফ দিয়ে—
যতই ছোটে 'ধরব' ব'লে
ততই মুলো এগিয়ে চলে।"

সাহেব মুলোর লোভ দেখিয়ে গাধাকে ছোটায় ইচ্ছেমতো। কবিতাটিতে যে শাসক ব্রিটিশের 'মুলোর' টানে নিয়ন্ত্রিত 'গাধা' ভারতবাসীর অসহায় রূপই প্রকট হয়েছে। ব্রিটিশ পুঁজি তার ঐশ্বর্যের লোভ দেখিয়ে চালিত করছে কমজোরি ভারতবাসীকে। এই করুণ দৃশ্যটির পরিবর্তন চেয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোর এবং সুকুমার। ব্রিটিশের প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠার জন্য তাঁরা পৌঁছে গিয়েছেন শিল্পবিপ্লব উত্তীর্ণ ক্রমশ উন্নতিশীল প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদনপ্রক্রিয়ার কলাকৌশলের কারখানাঘরে। না, পুঁজিপতির মুনাফা লোভ বা ধনতান্ত্রিক দর্শনের স্বার্থবাদী অর্থনৈতিক চিন্তার মালিন্য তাঁদের স্পর্শ করেনি।

উল্লেখ উৎস ঃ

১। " কলাবুদ্ধি ও কল-বুদ্ধি", 'সাহিত্যের পথে', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ-মাঘ ১৪০০ব., পৃ. ২৬৪

২। "শিক্ষার মিলন", 'শিক্ষা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী—একাদশ খণ্ড (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮ব., পৃ. ৬৬৯

৩। 'সুকুমার', লীলা মজুমদার, প. ব. বাংলা আকাদেমি, মে ১৯৮৯, পৃ. ২৫

৪। " 'টগ সমাজ', দ্বারকানাথ ঠাকুর ও হানিফ সারেং", 'কলের শহর কলকাতা', সিদ্ধার্থ ঘোষ, আনন্দ, কলকাতা, ৩য় মুদ্রণ জুলাই ২০১৫, পৃ. ৬৯

৫। ঐ, পৃ. ৭০

৬। ঐ, পৃ. ৭১

৭। ঐ, পৃ. ৬৯

৮। "জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পাঁচ কল-কন্যা", 'কলের শহর কলকাতা', সিদ্ধার্থ ঘোষ, পৃ. ৭৪

৯। 'উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী', লীলা মজুমদার, অনুবাদ-সৈয়দ কওসর জামাল, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৭ খ্রি. পৃ.২০

১০। ঐ, পৃ. ২

১১। ঐ, পৃ. ২৫

১২। ঐ, পৃ. ২৬

১৩। "ছবি ছাপার কল—কৌশল ও উপেন্দ্রকিশোর", 'কলের শহর কলকাতা', সিদ্ধার্থ ঘোষ, পৃ. ১২৯

১৪। 'সুকুমার সাহিত্য সমগ্র' (তৃতীয় খণ্ড) সম্পাদক—সত্যজিৎ রায়, আনন্দ, কলকাতা, ৫ম মুদ্রণ, মে ২০১১, পৃ. ১৮৪

১৫। "কলাবুদ্ধি ও কল-বুদ্ধি", 'সাত্যিেরপথে', পৃ. ২৬৪-২৬৫

১৬। 'সুকুমার সাহিত্য সমগ্র' (তৃতীয় খণ্ড), পৃ. ১৭২

১৭। ঐ, পৃ. ১৮১

১৮। "কলাবুদ্ধি ও কল-বুদ্ধি", 'সাহিত্যের পথে' পৃ. ২৬৫

১৯। 'সুকুমার সাহিত্য সমগ্র' (তৃতীয় খণ্ড), পৃ. ১৮৭

২০। ঐ, পৃ. ২২২

সখা পত্রিকার দুই সখা ঃ প্রমদাচরণ ও উপেন্দ্রকিশোর

ভীষ্মদেব মুখোপাধ্যায়

বাংলায় প্রথম সার্থক শিশুপাঠ্য পত্রিকা হল 'সখা'। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৩ সালের ১ জানুযারি তারিখে। নতুন বছরের প্রথম দিনেই আত্মপ্রকাশ পত্রিকাটির। সম্পাদক ছিলেন প্রমদাচরণ সেন। মানুষটির জীবনকাল মাত্র সাতাস বছর। "সুকুমার রায়ের অকাল প্রয়াণের মতোই শিশু সাহিত্যে ইহা (প্রমদাচরণ সেনের মৃত্যু পরম শোকাবহ ঘটনা।"[১] মানুষটি আজ আমাদের স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছেন। কিন্তু মানুষটি বলা যেতে পারে প্রথম শিশুদের মতন মন নিয়ে ভাবার চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৮৩ সালের ১জানুয়ারি তারিখে 'সখা' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করলো। পত্রিকার সেই প্রথম সংখ্যায় 'প্রস্তাবনা' অংশে সম্পাদক প্রমদাচরণ লিখলেন "সখা, পিতামাতার উপদেশ এবং শিক্ষকের শিক্ষা দুইই প্রদান করিবে। যাহাতে বালক বালিকারা বাস্তবিক মানুষ হইতে পারেন, তজ্জন্য 'সখা'র লেখক ও লেখিকাগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন—ফলতঃ যাহাতে পত্রিকা খানির 'সখা' এই নাম সার্থক হয়। সেদিকে সকলেরই দৃষ্টি থাকিবে।"[২] এই লেখার সূত্রে সম্পাদক আরও লিখলেন ঃ "বালক-বালিকাদিগের সকলের মনের গতি সমান নহে, সুতরাং একই উপদেশ যে সকলের পক্ষে সমান কার্যকর হইবে, এ রূপ আশা করা যায় না। অভিভাবকগণ যদি অনুগ্রহপূর্বক পত্রদ্বারা আমাদিগকে আপন আপন সন্তানদিগের চরিত্র বিষয়ে জানান তাহা হইলে আমরা বিশেষ বিশেষ চরিত্রের উপযোগী গল্পময় প্রস্তাব সকলেরও অবতারণা করিতে পারি।"[৩] এই ভাবনাটা কালের বিচারে যথেষ্টই নতুন। অভিনব। আজকের দিনেও আমরা মা-বাবা, কতজন শিশুদের 'মনের গতি'র ব্যাপারে সচেতন, তা বোধ করি প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে। প্রমদাচরণের এই সচেতনতা ছিল। সেই সচেতনতা থেকেই 'সখা' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা সম্পাদক প্রায় একাই সম্পূর্ণ করেছিলেন। "দুটি কবিতা—'ছেড়ে দাও না কুকুরচন্দ্র, মায়ের কাছে যাই ও 'ঠযা', 'ভীমের কপাল' নামে ধারাবাহিক বালকপাঠ্য উপন্যাস, গল্প 'সতীশ ও তাহার সঙ্গী', 'মহাত্মা হেয়ার সাহেব' নামে জীবনী, 'মেয়েরা আমাদের কে' এই নামে স্ত্রী জাতি সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ একটি আলোচনা, কথোপকথনের মাধ্যমে 'বৃষ্টি' নামে বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ, 'বাঁধা'—ইহাদের সব কয়টি তাঁহার একক রচনা।

এমন কি, প্রথম সংখ্যার টাইটেল পেজের ছবিটি পর্যন্ত তাঁহার নিজের হাতে আঁকা?"[৪] শিশুদের প্রতি একান্ত ভালোবাসা না থাকলে এমনটা সম্ভব নয়। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় মনোনিবেশ করলে সম্পাদকের মনের অন্দরমহলে খানিকটা প্রবেশ করা যেতে পারে। 'মেয়েরা আমাদের কে?' শীর্ষক রচনায় সম্পাদক লিখছেন—"অতি বাল্যকালে আমার মাতার মৃত্যু হয়। তখন মা কি ধন তাহা জানিতাম না।"[৫] কিংবা 'সতীশ ও তাহার সঙ্গী' শীর্ষক গল্পটা শুরুই হচ্ছে এইভাবে 'সতীশ তাহার পিতার একমাত্র ছেলে, তাহাতে আবার সতীশের মা ছিলেন না, এইজন্য সতীশের পিতা সতীশকে অত্যন্ত ভালোবাসিতেন।"[৬] আবার কখনো বা 'উষা' কবিতায় লিখছেন "আঃ ছেড়ে দেও না কুকুরচন্দ্র মায়ের কাছে যাই/এখন কি আর খেলা করবার সময় আছে ভাই?/দেখ্ছো না কি হাঁড়ি হাতে চাল ধোয়া রয়েছে তাতে/মা বলেছেন নিয়ে যেতে 'চাকরবাকর' নাই।"[৭] আড়াই বছর 'সখা' পত্রিকা সম্পাদনা করার পর প্রমদাচরণ অকালে মারা গেলেন ২১ জুন, ১৮৮৫ তারিখে জুলাই, ১৮৮৫ থেকে 'সখা' পত্রিকার সম্পাদনা ভার তুলে নিচ্ছেন শিবনাথ শাস্ত্রী। জুলাই, ১৮৮৫ সংখ্যার শুরুতেই সম্পাদকীয় হিসেবে তিনি লিখলেন নিবন্ধ ঃ 'স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন'। সেখানে দেখা গেল ঃ " ৭ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার জননীর মৃত্যু হয়। যার সংসারে মা নাই তার কেহ নাই। মায়ের মৃত্যুর পর প্রমদাচরণের পিতা ও তাঁহার দাদা তাঁহাকে অত্যন্ত যত্ন করিতেন, কিন্তু তবু তিনি বড় হইয়াও মা নাই বলিয়া কত দুঃখ করিতেন। বালককালে কতসময় বৃথা গিয়াছে, কত অন্যায় কাজ হইয়াছে বড় হইলে তাহা স্মরণ করিয়া অনেক দুঃখ করিতেন।" দুঃখের কথা খানিকটা প্রমদাচরণ লিখে গেছেন 'সখা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'মেয়েরা আমাদের কে' 'শীর্ষক রচনায়। প্রমদাচরণ সেখানে লিখছেন ঃ "আমার স্বভাব অত্যন্ত দুরন্ত এবং অবাধ্য ছিল—এই অবাধ্যতাতে যে আমার মাতার ভয়ানক ক্লেশ হইত, তাহা আমার ছোট বুদ্ধিতে আসিত না। ....মাতা যখন মৃত্যুশয্যায় পড়িলেন, তখন আমি নির্ব্বোধ! মার স্নেহ বুঝিলাম না—ভাবিলাম 'পীড়া হইয়াছে, তাহাতো ভালই! এখন নিরাপদে যেখানে সেখানে বেড়াইতে পারিব।"[৯]—প্রমদাচরণের মৃত্যুর পর ১৮৮৭ সালে 'সখা কার্যালয় হইতে প্রকাশিত' হয় 'সখা সম্পাদক স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন' শীর্ষক একটি বই। বইখানি কে লিখেছিলেন তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু বইটাতে প্রমদাচরণের জীবনের নানা ঘটনার সূত্রে মানুষটার জীবন্ত পরিচয় অনেকখানি পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যাচ্ছে, প্রমদাচরণ লিখছেন ".... মার মৃত্যুতে আহ্লাদিত হইবার একমাত্র কারণ মার অত্যাচার। আমি বাল্যকালে বড় দুষ্ট ছিলাম, কাজে কাজেই মা একদিনের তরেও

আমাকে স্নেহ দেখান নাই।"[১০] এই বোধ থেকেই 'সখা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বালক বালিকাদের মনের গতি সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতন করতে চেয়েছিলেন।

যাইহোক, 'সখা' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হল ১৮৮৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে। সেখানে 'সম্পাদকের নিবেদন' অংশে 'সখা' সম্পাদক প্রমদাচরণ আহ্লাদিত হয়ে লিখলেন "...এই একমাসের মধ্যেই 'সখা'র গ্রাহক সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে।....প্রায় প্রত্যহই নুতন গ্রাহকের নাম আসিতেছে এবং অনেক স্থান হইতে উৎসাহপূর্ণ, উপদেশ পূর্ণ পত্রাদি পাওয়া যাইতেছে।"[১১] এই পত্রাদির মধ্যে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের পত্রও ছিল। 'বঙ্গ দর্শন' সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র 'সখা' সম্পাদককে লিখলেন "'সখা' পড়িয়াছি। 'তাহাতে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। 'সখা' প্রধানত বালক বালিকাদের সহায় বটে, কিন্তু এই 'সখা'র সাহায্য অনেক পালিত কেশ বৃন্ধের পক্ষেও সকল পড়ি নাই, কিন্তু যতদূর পড়িয়াছি, অনবলম্বনীয় নহে। বালক বালিকার সদ্বুদ্ধ অতি দুর্লভ। এই পত্রের রচনা অতি সরল, বিষয়গুলি জ্ঞানগর্ভ, রুচি মার্জ্জিত। এই 'সখা'র সঙ্গে এদেশীয় তরুণ বয়স্ক মাত্রেরই সখিত্ব করা উচিত। 'সখা'র জন্য, যাহার ঘরে শিক্ষণীয় বালকবালিকা আছে, সেই আপনার ঋণী। আপনি যশস্বী ও কৃতকার্য্য হউন, জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি।"[১২]

'সখা'র সঙ্গে সখিত্ব করার জন্য কিংবা প্রমদাচরণের টানেই বছর কুড়ির এক তরুণ সখা পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। সেই তরুণের নাম উপেন্দ্রকিশোর রায়। 'সখা' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় তিনি লিখছেন 'মাছি' নামক একটি সচিত্র নিবন্ধ। এই উপেন্দ্রকিশোরই হলেন 'টুনটুনির বই' খ্যাত আমাদের আশৈশব পরিচিত মানুষটি। 'সখা' পত্রিকায় তিনি যখন লিখতেন, "তখনও তিনি রায়চৌধুরী ব্যবহার করিতেন না। ('মাছি' নামে এই নিবন্ধটাই) উপেন্দ্রকিশোরের প্রথম শিশুপাঠ্য রচনা।"[১৩] 'সখা' পত্রিকায় প্রকাশিত সেই রচনাটির দিকে তাকালে দেখা যাবে ছোট মাছের একটি ছবি বড়ো করে আঁকা রয়েছে। লেখক শুরু করছেন ঃ "ভাবিলেও বুঝিতে পার কি; এটী একটি মাছি? অণুবীক্ষণ নামে একরূপ যন্ত্র আছে তাহার তলায় ছোট জিনিষও খুব বড় দেখায়; সেই যন্ত্রের তলায় মাছিকে যেরূপ দেখায় ছবিটি সেইরূপ আঁকা হইয়াছে।[১৪] এই তরুণটি যে ভবিষ্যতে একজন দিকপাল শিশু সাহিত্যিক হয়ে উঠবেন তার আভাস 'মাছি' রচনাটির থেকে খানিকটা পাওয়া যায়। কয়েকটি প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ

(ক) "(মাছি) ভিন্ ভিন্ করিয়া আসিয়া গায়ে বসে, বার হাতযোড় করে, আর শুঁড়ের মতন একটা কি বাহির হইয়া চাটিতে থাকে। ছি!"[১৫]

(খ) "মাছিগুলি যেন পরিষ্কার জায়গায় থাকাটাকে পাপ মনে করে। কিন্তু এক একটা অপরিষ্কার ছেলে মাছির চেয়েও খারাপ।"[১৬]

(গ) "তোমার আমার মুখ দাঁতে ভরা। কিন্তু মাছির দাঁত নাই। দাঁতের আবশ্যকও নাই।"[১৭]

(ঘ) " না ভাবিয়া কাজ করার বড় বিপদ। মাছিগুলি খাইবার কিছু দেখিলে বুদ্ধিহীন হইয়া যায়।"[১৮]

'সখা' সম্পাদক প্রমদাচরণ বোধহয় উপেন্দ্রকিশোরকে যথার্থই চিনতে পেরেছিলেন। বছর পঁচিশের প্রমদাচরণ আর বছর কুড়ির উপেন্দ্রকিশোর দুইয়ে যেন 'গঙ্গাযমুনা মিলিয়া গেল।'—পরের মাসের 'সখা' পত্রিকা প্রকাশিত হল ১লা মার্চ ১৮৮৩ তারিখে, বৃহস্পতিবার, এই সংখ্যায় একটি বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশিত হল। নিবন্ধটির নাম হল 'ধূমপান'—লেখক দুজন। সখা-উপেন্দ্রকিশোর আর 'সখা' সম্পাদক প্রমদাচরণ। 'ধূমপান' নিবন্ধটির দিকে মনোনিবেশ করা যেতে পারে। শুরুটাই হচ্ছে বেশ সুন্দরভাবে "একদিন পটলডাঙ্গার বাজারের এক দোকানে কি কিনিতে গিয়াছি, এমন সময় ছোট ছোট দুটি বাবু আসিয়া উপস্থিত।....মানিলাম তাঁহারা চুরট কিনিতে আসিয়াছেন। দোকানদার চুরুট দেখাইল। চুরুট পসন্দ হইল না, একজন বলিলেন 'এর চাইতে গুলি খাওয়া ভাল যে!'—আমি হতবুদ্ধি হইয়া থাকিলাম। ছেলে মানুষ তামাক খায়! কি লজ্জার কথা!"[১৯]—এইভাবে আস্তে আস্তে ধূম্রপানের কুফল স্তরে স্তরে আলোচিত হয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে, "তুমি বসিয়া রহিয়াছ, তামাকখোর তাঁহার যন্ত্র হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আর ভ্রূড় ভ্রূড় শব্দে রাশি রাশি ধূম তোমার নাকে মুখে দিতে লাগিলেন। তখন কি ইচ্ছা হয় না যে কাছে একটা লাঠি থাকিলে লোকটাকে কিছু ওষধ দিয়ে দাও?"[২০] এইখানে ফুটনোট দিয়ে পৃষ্ঠার তলায় লেখা আছে "এই শক্ত শাস্তি না দেওয়াই ভাল। যাহা হইক, লেখকের তামাকের প্রতি কত বিদ্বেষ, ইহাতে তাহাই বুঝা যাইতেছে। স, স,"[২১] —এখানে 'স. স' হলে 'সখা' সম্পাদক। —আলাদা করে নির্দিষ্ট করা সত্যিই কঠিন কতটা অংশ প্রমদাচরণ লিখছেন আর কতখানি লিখছেন তরুণ উপেন্দ্রকিশোর। —তবে রচনাটির বিষয় আর ভাষার আন্তরিক আবেদনের গুণে একটা চমকপ্রদ ঘটনা ঘটলো। মাসখানেকের মধ্যে 'স.স' অর্থাৎ 'সখা' সম্পাদকের কাছে একটি চিঠি এলো। কি লেখা ছিলো সে চিঠিতে। বিষয়টি প্রমদাচরণের কাছ থেকেই জানা যাক। 'সখা' পত্রিকার '১লা এপ্রিল, ১৮৮৩' তারিখে প্রকাশিত চতুর্থ সংখ্যায় সম্পাদক প্রমদাচরণ 'একটী আশার কথা' শিরোনামে 'সখা'র পাঠকদের জানাচ্ছেন ঃ

"একটি আশার কথা

আমরা অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত আমাদিগের পাঠকগণকে জানাইতেছি, যে আমাদিগের মফস্বলের কোন পাঠক গতবারের ধূমপান বিষয়ক প্রস্তাবটা পাঠ করিয়া তামাক খাওয়া একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি এ সম্বন্ধে আমাদিগকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল। নাম প্রকাশ লজ্জার কারণ হইতে পারে বলিয়া প্রকাশ করা গেল না।

'মহাশয়!

আমি পূর্ব হইতে তামাক খাইতাম; কিন্তু 'সখা'র একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অদ্য হইতে তামাক খাওয়া চিরদিনের মত পরিত্যাগ করিলাম ইতি, তারিখ ১০ই চৈত্র, ১২৮৯ সাল।"—শ্রী—"[১২]

এরপর থেকে 'সখা' পত্রিকায় একের পর এক প্রকাশিত হতে থাকল উপেন্দ্রকিশোরের রচনা। 'সখা' পত্রিকার মে, ১৮৮৩ সংখ্যায় উপেন্দ্রকিশোর লিখলেন ধারাবাহিক রচনা ঃ 'মাকড়সা' (সচিত্র)'। এই সংখ্যায় সম্পাদক প্রমদাচরণ 'আর একটী আশার কথা' শোনালেন। লিখলেন ঃ "আমাদিগের কোন বন্ধু লিখিয়াছেন যে এই বালকটী মাতার নিকট হইতে জলখাবারের জন্য একটি টাকা পাইয়াছিল, কিন্তু সে তাহা জলখাবারে জন্য খরচ না করিয়া তাহার দ্বারা সখার গ্রাহক হইয়াছে।" 'সখা' পত্রিকায় জুন, ১৮৮৩ সংখ্যায় উপেন্দ্রকিশোর লিখলেন 'গিল্‌কয় সাহেবের অদ্ভুত সমুদ্রযাত্রা'। —'সখা' পাঠকরা এইরচনা সূত্রে আমেরিকার সঙ্গে পরিচিত হল। আগষ্ট, ১৮৮৩ সংখ্যার 'সখা'তে উপেন্দ্রকিশোর 'টরান্টুলা' মাকড়শার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। অক্টোবর ১৮৮৩ সংখ্যার 'সখা' তে লিখলেন ঃ বানর (সচিত্র)। নভেম্বর ১৮৮৩ লিখলেন ঃ 'একটী অম্বসীলের কথা।' ক্লু উপসাগরে একটি সীলমাছের ছানা কীভাবে সমুদ্রের ধারে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে আস্তে আস্তে বড়ো হয়ে উঠলো সে গল্পই শুনিয়েছেন উপেন্দ্রকিশোর। ডিসেম্বর, ১৮৮৩ সংখ্যায় লিখলেন ঃ 'নিয়ম এবং অনিয়ম; বাধ্যতা এবং অবাধ্যতা' শীর্ষক গল্প। এটি অবশ্যই উপেন্দ্রকিশোরের মৌলিক রচনা নয়। উপেন্দ্রকিশোর ঐ পাতারই ফুটনোটে স্পষ্ট করে লিখেছিলেন 'Parables from Nature নামক পুস্তকের গল্প অবলম্বনে লিখিত।'[২৪] অনুবাদের বাংলাভাষাটি অসাধারণ। ধরণটা একেবারেই চলিত ভাষার। শুরুটা একটু শোনা যাক ঃ

"গ্রীষ্মকাল; সকালবেলা একদিন বড় সুন্দর দেখতে হয়েছে। একটী কর্ম্মকার মৌমাছি মধু আন্‌বার জন্য বাহির হল। এমন সুন্দর রোদ! বেশ গরম বাতাস! সে উড়ে

উড়ে অনেকদূর গেল। শেষে একটী সুন্দর বাগানে এসে পড়ল এবং সেইখানে ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়াতে লাগল।"[২৫]

সম্পাদক প্রমদাচরণ এবং সহযোগী উপেন্দ্রকিশোরের হাত ধরে 'সখা' পত্রিকাও নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো এবং আরও আরও বেশি জনপ্রিয় হতে লাগলো। তথ্য বলছে, বছর শেষ 'সখা' পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ছয়শোতে পৌঁছে গিয়েছিল। আর প্রথম বছর থেকেই সম্পাদক ও উপেন্দ্রকিশোর 'সখা'কে একটা শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বছরের শেষে সখার গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছিলে প্রায় হাজারেরও ওপরে। আড়াই বছর ধরে 'সখা' সম্পাদনা করে সম্পাদক প্রমদাচরণ মারা গেলেন। 'সখা' পত্রিকা ছিল তাঁর সন্তান তুল্য। 'সখা' উপেন্দ্রকিশোর 'সখা'কে সমৃদ্ধ করতে থাকলেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে 'সখা' পত্রিকার নানা সংখ্যায় প্রকাশিত উপেন্দ্রকিশোরের বেশিরভাগ রচনাই 'সখা' "প্রকৃতি বিজ্ঞান সাধারণ জ্ঞান বিষয়ক ঝরঝরে সহজ ভাষায় লেখা প্রবন্ধ। ভারি সরস করে লেখা। মন পড়া গল্প সরস করে লেখা অনেক সহজ। তথ্যমূলক প্রবন্ধ ছোটদের উপভোগ্য করে লেখা বড় কঠিন কাজ।"[২৬] প্রমদাচরণের 'সখা' হিসেবে এমন কঠিন কাজটাই সাবলীলভাবে করে দেখালেন উপেন্দ্রকিশোর। কারণ উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন আশ্চর্য এক মানুষ। "...ফর্সা সুন্দর চেহারা কালো কোঁকড়া দাড়ি আর সমস্ত দেহ থেকে ঝরে পড়ছে এমন একটা সুষমা, যে দেখছে সেই মুগ্ধ হচ্ছে।.... যেমন ভালো ছবি আঁকতেন, তেমনি চমকৎকার বেহালা বাজাতেন আর কলমটি তুলে যেই না ছোটদের জন্য লিখতে শুরু করতেন, অমনি কলমের আগা দিয়ে মধু ঝরত।"[২৭] 'সখা' পত্রিকা ছিল সেই সুন্দর বাগান। প্রমদাচরণ ছিলেন সেই বাগানের রূপকার। এমনি করেই 'সখা' পত্রিকা একই সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোরের রায়চৌধুরীর জন্ম দিয়েছে। প্রমদাচরণের মৃত্যুর পর 'সখা' পত্রিকার জুলাই ১৮৮৫ সংখ্যায় সম্পাদক শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদকীয় হিসাবে লিখেছেন 'স্বর্গীয় প্রমদাচরণ' শীর্ষক নিবন্ধ। ঐ একই সংখ্যাতে উপেন্দ্রকিশোর লিখলেন 'নূতন গল্প'। রূপকথার ঢঙে সখার পাঠকদের সঙ্গে আমাদেরও শোনালেন বিজ্ঞানের গল্প। কিন্তু লেখক উপেন্দ্রকিশোরের সামান্য পরিবর্তন ঘটে গেল। সূচীপত্রে দেখা গেল আমাদের অশৈশব পরিচিত সেই নামটি—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। আর তার পাশাপাশি একই সঙ্গে 'সখা' নামটিও সার্থক করে তুলেছে।

উল্লেখপঞ্জি ঃ

১। বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০-১৯০০) ঃ আশা গঙ্গোপাধ্যায় ঃ ড়ি এম লাইব্রেরি ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ প্রথম মুদ্রণ ১৩৬৬ পৃষ্ঠা ঃ ১৪৩

২। সখা পত্রিকা ঃ প্রথমভাগ ঃ প্রথম সংখ্যা ঃ প্রস্তাবনা অংশ ঃ পৃষ্ঠা-২

৩। তদেব, পৃষ্ঠা ঃ ২

৪। বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০-১৯০০) ঃ আশা গঙ্গোপাধ্যায় ঃ পৃষ্ঠা ঃ ১৪৪

৫। 'মেয়েরা আমাদেরকে?' ঃ প্রমদাচরণ সেন ঃ সখা পত্রিকা ঃ প্রথম ভাগ ঃ প্রথম সংখ্যা ঃ পৃষ্ঠা ঃ ১২

৬। 'সতীশ এবং তাহার সঙ্গী' ঃ প্রমদাচরণ সেন ঃ সখা পত্রিকা ঃ প্রথম সংখ্যা ঃ পৃষ্ঠা ঃ ৫

৭। 'আ ঃ ছেড়ে দাও না' ঃ প্রমদাচরণ সেন ঃ সখা পত্রিকা ঃ প্রথম সংখ্যা ঃ পৃষ্ঠা ঃ ৫

৮। স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন ঃ শিবনাথ শাস্ত্রী ঃ সখা পত্রিকা ঃ জুলাই, ১৮৮৫ ঃ পৃষ্ঠা ঃ ৯৮

৯। 'মেয়েরা আমাদের কে' ঃ প্রমদাচরর সেন ঃ সখা পত্রিকা ঃ প্রথম সংখ্যা ঃ পৃষ্ঠা ঃ ১২

১০। সখা সম্পাদক স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন ঃ সখা কার্যালয় হইতে প্রকাশিত ঃ কলিকাতা, ২১০/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে শ্রী মণিমোহন রক্ষিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ঃ ১৮৮৭ঃ পৃষ্ঠা ঃ ৯

১১। সম্পাদকের নিবেদন ঃ সখা ঃ প্রথম ভাগ ঃ দ্বিতীয় সংখ্যা ঃ পৃষ্ঠা ঃ ১৭

১২। সখা সম্পাদক স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন ঃ পৃষ্ঠা

১৩। বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০-১৯০০) ঃ আশা গঙ্গোপাধ্যায় ঃ পৃষ্ঠা ঃ ১৪৬

১৪। মাছি ঃ উপেন্দ্রকিশোর রায় ঃ সখা পত্রিকা ঃ প্রথঙ ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যা ঃ পৃষ্ঠা ঃ ২৮

১৫। তদেব, পৃষ্ঠা ঃ ২৮

১৬। তদেব, পৃষ্ঠা ঃ ২৮

১৭। তদেব, পৃষ্ঠা ঃ ২৮

১৮। তদেব, পৃষ্ঠা ঃ ২৮

১৯। ধূমপান ঃ প্রমদাচরণ সেন ও উপেন্দ্রকিশোর রায় ঃ সখা পত্রিকা ঃ মার্চ, ১৮৮৩ সংখ্যা ঃ পৃষ্ঠা ঃ ৪৫

২০। তদেব, পৃষ্ঠা ঃ ৪৬

২১। তদেব, পৃষ্ঠা ঃ ৪৬

২২। একটী আশার কথা ঃ প্রমদাচরণ সেন ঃ সখা ঃ ১ এপ্রেল, ১৮৮৩ সংখ্যা ঃ পৃষ্ঠা ঃ ৬২-৬

২৩। আর একটী আশার কথা ঃ প্রমদাচরণ সেন ঃ সখা পত্রিকা ঃ মে, ১৮৮৩ সংখ্যা ঃ পৃষ্ঠা ঃ ৭৮

২৪। নিয়ম এবং অনিয়ম ঃ বাধ্যতা এবং অবাধ্যতা ঃ উপেন্দ্রকিশোর রায় ঃ সখা পত্রিকা ঃ পৃষ্ঠা ১৭৯

২৫। তদেব, পৃষ্ঠা ঃ ১৭৯

২৬। শিশু সাহিত্য ঃ লীলা মজুমদার (উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র রচনাবলী), পৃষ্ঠা ৭

২৭। উপেন্দ্রকিশোর ঃ লীলা মজুমদার ঃ নিউস্ক্রিপ্ট প্রকাশিত ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ বৈশাখ, ১৮৮৫ শকাব্দ = ১৮৮৫ + ৭৮ = ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ।

বাংলা শিশুসাহিত্য ঃ উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ পর্ব

সুব্রত দাস

মূলত বিদ্যায়তনিক প্রয়োজনে ছোটদের জন্য লেখালেখির সূত্রপাত হয়েছিল উনিশ শতকে। নানান প্রাইমারের ভিড়ে নীতিশিক্ষামূলক বইগুলিতে হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্রে কাহিনি আবর্তিত হচ্ছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পাঠ্যপুস্তকের এই জগৎ ছাড়িয়ে সাময়িক পত্রিকাতে ছোটদের জন্য এসেছে জীবজগতের কথা, ভূগোল, বিজ্ঞানের সাধারণ বিষয়, স্বাস্থ-বিষয়ক রচনা, টুকরো খবর, প্রভৃতি। ছোট ছোট অনুচ্ছেদে রচিত শিক্ষামূলক বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে ছোটদের পত্রিকার জগতে। বিশুদ্ধ ছড়া, কবিতা বা শিশুতোষ কাহিনির জন্য ছোটদের অপেক্ষা করতে হয়েছে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত। মদনমোহন তর্কালঙ্কার[১] বিক্ষিপ্ত দু' একটি কবিতা লিখেছেন, সমাজ-এর (১৮৫১) উদ্যোগে অনুবাদের সোপান বেয়ে ছোটদের বিশ্বসাহিত্যের আস্বাদ দিয়েছেন মধুসূদন মুখোপাধ্যায়[২]। উনিশ শতকের পাঁচ ও ছয়ের দশকে ক্রমে ছোটদের জন্য লেখা হলো উপন্যাসকল্প কাহিনি। এক্ষেত্রে এগিয়ে এলেন হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল হরিনাথ), সর্বানন্দ রায়। ছোটদের জন্য কবিতা লিখলেন কামাখ্যাচরণ ঘোষ, হরিশচন্দ্র মিত্র, রাধামাধব মিত্র, তিনকড়ি, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ভিখারীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। অর্থাৎ ছোটদের জন্য সাহিত্যের পরিসর ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে এসময়। ছোটদের জন্য রচিত এই সাহিত্যসম্ভার শিশুদের উপযোগী কিনা সে বিষয়ে সংশয় দেখা দিতে শুরু করেছে উনিশ শতকেই। অথচ ছোটদের জন্য রচিত সমস্ত সাহিত্যকে শিশুসাহিত্যের বন্ধনীভুক্ত করে দেখার প্রবণতা ও অভ্যাস প্রথম থেকেই লক্ষ করা গেছে।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছোটদের মানসজগতে পরিবর্তনের স্তরভেদ লক্ষ করা যায়। শিশু, বালক বা বালিকা এবং কিশোর বা কিশারী—এই তিনটি স্তরের ছেলে-মেয়েদের মানসিক গঠন একরকম নয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে ক্রমিক যোগাযোগ যত বাড়তে থাকে ততই বদলে যেতে থাকে বোধের পরিসর, বদলে যায় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের জগৎ। লোকগল্পের আঙ্গিকে পশু-পাখির সঙ্গে অনায়াসে কথা বলতে পারে শিশু ও বালক-বালিকা, রূপকথার রাজপুত্র-রাজকন্যা, রাক্ষস-রাক্ষসী শৈশবের কল্পনায়, একান্তই সত্যি বলে মনে হয়। কিশোর-কিশোরীদের কাছে রূপকথা

অলীক কল্পনা মাত্র। অন্যদিকে গোয়েন্দা গল্প বা কল্পবিজ্ঞানের গল্প বা গল্পবাজ দাদাদের বুদ্ধিদীপ্ত কাহিনি শিশুদের পক্ষে হৃদয়াঙ্গম করা সাধারণত অসম্ভব ব্যাপার। প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তা হলে বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে এই যে, শিশুসাহিত্যের শিরোনামে উনিশ শতকে প্রচলিত সামগ্রিক সাহিত্য শিশু কিংবা বালক-বালিকাদের মনের উপযোগী নাও হতে পারে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্পাদকেরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতন ছিলেন। পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁদের লক্ষ্য ও অভীষ্ট নির্ধারণ করেছে এই নির্দিষ্ট বয়সের পাঠকেরা। 'খ্রিশ্চান ভার্নাকুলার এডকেশন সোসাইটি'-র পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'সত্যপ্রদীপ'-এর (জানুয়ারি, ১৮৬০) ভূমিকায় বলা হলো—'হে প্রিয় বালক ও বালিকাগণ; তোমাদের নিমিত্তেই এই পত্রিকা প্রস্তুত হইতেছে।.....তোমরা যেন বুঝিতে পার এই জন্যে সরল বাক্য প্রয়োগ করিব ও মনোরম্য পাঠে ইহা পরিপূরিত থাকিবে।'[৩] প্রমদাচরণ সেন 'সখা'-র (জানুয়ারি, ১৮৮৩) প্রস্তাবনাতে জানালেন—'আমাদিগের হতভাগ্য দেশে বালক-বালিকাদিগের জ্ঞানের ও চরিত্রের উন্নতির জন্য অধিক লোক চিন্তা করেন না; অথবা করিবার অবকাশ হয় না, এই জন্যই "সখা" জন্ম হইল।'[৪] পাঠকের বয়স আরও সুনির্দিষ্ট করে 'মুকুল' (১৩০২) পত্রিকার প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৩০২, শ্রাবণ) সম্পাদক শিবনাথ শাস্ত্রী বললেন—'অনেকের ধারণা আছে মুকুল ছোট ছোট শিশুদের জন্য, অর্থাৎ যাহাদের বয়স ৮/৯ বৎসরের মধ্যে প্রধানত তাহাদের জন্য। 'মুকুলে' এমন কথা থাকে, যাহা এত অল্প বয়স্ক শিশুগণ বুঝিতে পারে না, এবং বুঝিবার কথাও নহে। যাহাদের বয়স ৮/৯ হইতে ১৬/১৭-এর মধ্যে ইহা প্রধানত তাহাদের জন্য। আমরা লিখিবার সময় এই বয়সের বালক-বালিকাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লিখি।'

'শিশুসাহিত্য' পরিভাষাটির জন্য অপেক্ষা করতে হবে উনিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যোগীন্দ্রনাথের 'খুকুমনির ছড়া'-র (১৮৯৯) ভূমিকায় 'শিশুসাহিত্য' পরিভাষাটি সংযুক্ত করার আগে পর্যন্ত ছোটদের জন্য রচিত সাহিত্য হয় বালক বা বালিকা, বা অল্প বয়স্ক 'যুবালোক' (Young Adult) বা কিশোর-কিশোরীদের সাহিত্য হিসেবে বিশেষিত হতো। বিভিন্ন বইয়ের আখ্যাপত্রে, উৎসর্গে বা প্রস্তাবনায় এবং পত্রিকার সম্পাদকীয়, ভূমিকা ও বিজ্ঞাপনে এমনটাই লক্ষ করা গেছে। আসলে প্রজন্মবাহিত লৌকিক ছড়া ও গল্পের বিস্তৃত ক্ষেত্রে ছড়া শুধুমাত্র ছোটদের জন্য সাহিত্য রচনার অভ্যাস প্রাচীন ও মধযুগের বাংলা সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয় নি। উনিশ শতকের সূচনায় ছোটদেরকে উদ্দেশ্য করে যে সাহিত্যের সূচনা, তা ছিল প্রকৃতপক্ষে স্কুলশিক্ষার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার প্রাতিষ্ঠানিক বা ব্যক্তিগত প্রয়াস মাত্র। ছয়-সাত-আট বছরের

ছেলেদের জন্য (পরে মেয়েরাও এই তালিকাভুক্ত হবে) এবং প্রাথমিকের গণ্ডী পেরোনো ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লেখালেখির বিপুল আয়োজন এই প্রয়োজনের সূত্রেই লক্ষ্য করা গেছে। আর মনোরঞ্জনের জন্য রচিত সাহিত্যও মূলত উচ্চ-নৈতিক আদর্শ স্থাপেনর জন্যই লেখা হয়েছে। উনিশ শতকের বখে যাওয়া বাবুসংস্কৃতির হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্য সামনে রেখে ছোটদের নৈতিকতার বুনিয়াদটি পোক্ত করা হলো বাংলার ছোটদের জন্য রচিত সাহিত্যে। সাহিত্যের এই সামাজিক ভূমিকায় কোলের শিশুটি বা সদ্য অক্ষরজ্ঞান হওয়া শিশুর মানসিক চাহিদার কথা, তার বিস্ময় ও ভয়, বিশ্বাসের সরল জগতের কথা উপেক্ষিত থেকে গেছে। দু' একটি স্ফুলিঙ্গ ছাড়া প্রকৃত শিশুসাহিত্য পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে 'সখা', 'বালক' বা 'মুকুল' পত্রিকা পর্যন্ত। পত্রিকাকেন্দ্রিক উদ্যোগে সামিল হয়ে অন্তত দু'জন লেকক বাংলা সাহিত্যে অবতীর্ণ হবেন এসময়, যাঁরা বাংলার শৈশবের জন্য সাহিত্যের স্বর্ণদুয়ার খুলে দেবেন।

প্রকৃতপক্ষে উপেন্দ্রকিশোর রায় (পরবর্তীতে রায়চৌধুরী) এবং যোগীন্দ্রনাথ সরকার বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রধান দুই পথিকৃৎ। তাঁদের সারর্থে এই প্রথম শিশু ও বালক-বালিকাদের জন্য লেখা হলো মনোহরণকারী কবিতা ও কাহিনির জগৎ। ছোটদের মতো করে এবং ছোটদের ভাষায় লেখা তাঁদের রচনা বাংলা শিশুসাহিত্যের সম্ভবনাময় আলোকশিখাকে উস্‌কে দিয়েছে। এ বিষয়ে প্রমেন্দ্র মিত্র জানিয়েছেন—'দুটি নাম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে সোনার জলে লেখা বললেও সবটা বলা হয় না। কিছুই যেখানে ছিল না সাহিত্যের তেমনি একটি বিশেষ বিভাগে, একেবারে নতুন পথ কেটে বার করবার অগ্রপথিক হিসেবে তাঁদর কীর্তি কোন দিন ভোলবার নয়। নাম দুটি হল উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, আর যোগীন্দ্রনাথ সরকার। দুজনেই বাংলা ভাষার শিশুসাহিত্যের আদি স্রষ্টা ও পথিকৃৎ।'[৫]

অবশ্য এভাবে বললে সত্যের সামান্য অপলাপ হবে। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, আর যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সামান্য আগে থেকেই শিশুদের জন্য গল্প ও কবিতার আয়োজন শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে বঙ্গীয় খ্রিষ্টিয় সমাজ এবং ব্রাহ্মসমাজের অবদান অনস্বীকার্য। খ্রিষ্টান মিশনারিদের পক্ষ থেকে উনিশ শতকে একাধিক বালক ও কিশোরপাঠ্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। 'খ্রিশ্চান ভার্নাকুলার এডুকেশন সোসাইটি'র 'সত্যপ্রদীপ' (১৮৬০, সম্পাদক-পাদ্রি স্টাবো) বা 'কলিকাতা ট্রাক্ট সোসাইটী'র 'জ্যোতিরিঙ্গণ'(১৮৬৯, সম্পাদক—এস. সি. ঘোষ) পত্রিকায় ছোটদের জন্য গল্প বা কবিতার আয়োজন ছিল। এই দুটি পত্রিকার বিরুদ্ধে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার ও ভারতবিদ্বেষের অভিযোগ থাকলেও, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে শিশুসাহিত্যের প্রাথমিক লক্ষণ দেখা গেল এখানকার বিভিন্ন সংকলনে ঠাঁই পাওয়া কবিতা ও আখ্যানমূলক রচনায়। খ্রিষ্টান মিশনারিদের

মতো ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য না থাকলেও নীতিকথার বীজমন্ত্র নিয়ে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতিপয় মানুষজন ছোটদের সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। কেশবচন্দ্র সেনের 'বালকবন্ধু'তে (১৮৭৮) বালক ও কিশোরদের পাশাপাশি শিশুদের উপযোগী লেখার সন্ধান পাওয়া গেল। তবে মনে রাখতে হবে, 'সত্যপ্রদীপ', 'জ্যোতিরিঙ্গণ' পত্রিকার মতো 'বালকবন্ধু'র লেখাগুলির স্রষ্টার সন্ধান পাওয়া যায়নি। সূচিপত্রে বা লেখার সঙ্গে লেখকের নাম না থাকায় এই পত্রিকাগুলির ব্যক্তিলেখকদের পরিচয় জানা সম্ভব হয় নি।

তবে ছোটদের পত্রিকায় শিশুদের জন্য ব্যক্তিলেখকের সন্ধান পাওয়া গেল 'সখা' (১৮৮৩) পত্রিকায়। উপেন্দ্রকিশোর, যোগীন্দ্রনাথের লেখকজীবনের প্রতিষ্ঠাপর্বে এই পত্রিকার অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষত উপেন্দ্রকিশোরের জীবনে 'সখা'র ভূমিকা অপরিসীম। মনে রাখতে হবে যে উপেন্দ্রকিশোর, যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত এবং তাঁদের সাহিত্যজীবন ব্রাহ্মসমাজের ছত্রছায়ায় পল্লবিত হয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ছোটদের জন্য প্রকাশিত পত্রিকার অধিকাংশই ছিল ব্রাহ্মযুবকদের ও নেতৃবৃন্দের উদ্যোগের ফসল। এই পত্রিকারগুলির লেখক তালিকার অনেকেই ছিলেন ব্রাহ্মধর্মের মানুষ। 'বালকবন্ধু' (১৮৭৮, সম্পাদক-কেশবচন্দ্র সেন), 'সখা' (১৮৮৩, সম্পাদক—প্রমদাচরণ সেন), 'বালক' (১৮৮৫, সম্পাদক—জ্ঞানদানন্দিনী দেবী), 'মুকুল'(১৮৯৫, সম্পাদক—শিবনাথ শাস্ত্রী) পত্রিকার লেক্‌গোষ্ঠী ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার সুবাদে ছিলেন যুক্তিবাদী এবং নৈতিক চরিত্রের দিক থেকে শুদ্ধতাবাদী। ছোটদের সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদনা এবং লেখক হিসেবে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে এর প্রভাব লক্ষ করা গেছে। এই পত্রিকাগুলির সারথ্য (একমাত্র ব্যতিক্রম 'বালক') উপেন্দ্রকিশোর, যোগীন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনের পথ সুপ্রশস্ত করেছে।

ময়মনসিংহের কিশারগঞ্জ থেকে কলকাতায় ছাত্রবৃত্তি নিয়ে এফ. এ. পড়তে এসে (১৮৭৯) প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র উপেন্দ্রকিশোর উঠলেন ৫০ নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রিটের (অবশ্য প্রথমে উঠেছিলেন কলুটোলার কাছে রতু সরকার লেনে) মেস বাড়িতে। এই বাড়ি সেসময়ে পরিচিত ছিল ব্রাহ্মকেল্লা বা ব্রাহ্ম যুবকদের মেসবাড়ি হিসেবে। উপেন্দ্রকিশোরকে দত্তক নেওয়া পিতা হরিকিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন রক্ষণশীল হিন্দু। পিতার মতামত উপেক্ষা করে ব্রাহ্মসমাজে উপেন্দ্রকিশোরের যাতায়াত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই নিয়ে পিতার সঙ্গে মতবিরোধ ও মনান্তর ঘটেছে। পিতার মৃত্যুর পর (১৮৮৩) ১৮৮৫ সালে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন। উপেন্দ্রকিশোরের সাহিত্যজীবনের সূচনায় এই ব্রাহ্মধর্ম বিশেষত ব্রাহ্মসমাজের অবদান অপরিসীম। সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রিটের মেসবাড়িতে উপেন্দ্রকিশোরের সহআবাসিক ছিলেন প্রমদাচরণ সেন। বন্ধু প্রমদাচরণের

অনুপ্রেরণা ও প্রযত্নে ছোটদের সাহিত্যভুবনে তাঁর আবির্ভাব। প্রমদাচরণ সম্পাদিত 'সখা' পত্রিকাতেই লেখকরূপে উপেন্দ্রকিশারের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। শিশুসাহিত্যে নিবেদিতপ্রাণ প্রমদাচরণের উৎসাহে উপেন্দ্রকিশোর ছোটদের জন্য ছোটদের জন্য লেখা ব্যাপারে উৎসাহী হয়েছেন। প্রমদাচরণের সম্পাদনায় 'সখা' পত্রিকা প্রকাশিত হলে সভার দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৮৮৩, ফেব্রুয়ারি) লেখকরূপে উপেন্দ্রকিশোর আত্মপ্রকাশ করেন। 'মাছি' নামে একটি সচিত্র নিবন্ধ লিখেছিলেন তিনি। লেখকের পদবি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল 'রায়'; পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যায় 'রায়' পদবি বহাল থাকবে। (বোধকরি এই পদবি ব্যবহারের নেপথ্যে ছিল বি. এ. ক্লাশের ছাত্র উপেন্দ্রকিশোরের ব্রাহ্ম-সংসর্গ নিয়ে ঘটে চলা পারিবারিক বিবাদ।) পরে 'সখা'র তৃতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৫) থেকে ব্যবহৃত হলো 'রায়চৌধুরী' পদবি। অব্যবহিত পরেই (১৫ জুন ১৮৮৫) তিনি দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা বিধুমুখীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবেন। ছবি আঁকা, সংগীতচর্চার পাশাপাশি চলতে থাকে সাহিত্যরচনার কাজ।

প্রথমদিকে তরুণ উপেন্দ্রকিশোর ছোটদের জন্য মূলত বিজ্ঞানবিষয়ক লেখা লিখতেন। 'মাছি', 'মাকড়সা', 'বানর', 'মশা', 'জলকণার গল্প' প্রভৃতি তথ্যবহুল আলোচনায় প্রকৃতির গাছপালা—মাটি-জল— আলো-আকাশ-নক্ষত্র-পোকামাকড়-জীবজন্তুদের সঙ্গে ছোট ছোট পাঠকদের পরিচয় ঘটানোই তাঁর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল। ছোটদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার কাজ তিনি শুরু করেছিলেন 'সখা'-র পাতাতে। পাশাপাশি 'সখা'তে গল্পকথক উপেন্দ্রকিশোরেরও জন্ম। 'সখা'-র দ্বিতীয় ভাগের প্রথম সংখ্যা (জানুয়ারি ১৮৮৪) থেকে পর পর ছয় মাস ধরে প্রকাশিত হয় উপেন্দ্রকিশোরের ছোটদের জন্য নভলেট জাতীয় লেখা 'সহজে কি বড় লোক হওয়া যায়?'। এছাড়াও 'দুষ্টুবাঘ', 'শেয়ালের গল্প', 'নূতন গল্প', প্রভৃতির মধ্যয়িে উপেন্দ্রকিশোর প্রবেশ করেন ছোটদের গল্প-জগতে। 'সখা' বন্ধ হয় যাওয়ার পর নিয়মিত লিখেছেন 'সখা ও সাথী' (১৩০১, ভুবনমোহন রায়), 'দাসী' (১৮৯০, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়), 'প্রদীপ' (১৩০৪, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়) 'মুকুল' (১৮৯৫, শিবনাথ শাস্ত্রী) পত্রিকায়। বিশ শতকে এসে তিনি নিজেই প্রকাশ করবেন তাঁর সম্পাদিত শিশু-কিশোর পত্রিকা 'সন্দেহ' (১৩২০, বৈশাখ)। মৃত্যুর আগে (১৯১৫, ২০ ডিসেম্বর) তাঁর সম্পাদিত 'সন্দেশ'-এর ৩৩টি সংখ্যায় উপেন্দ্রকিশোর নিয়মিত লিখেছেন প্রবন্ধ, গল্প। ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অবিস্মরণীয় এই 'টুনটুনির বই' (১৯১০)। লেখক হিসেবে তাঁকে অমরত্ব দিয়েছে 'টুনটুনির বই'। পাশাপাশি সামান্য আগে-পরে ছোটদের জন্য প্রকাশিত হয়েছে 'ছেলেদের রামায়ণ' (১৮৯৭), 'সেকালে কথা' (১৯৩০), 'ছেলেদের মহাভারত' (১৯০৮), 'মহাভারতের গল্প' (১৯০৯), 'ছোট রামায়ণ' (১৯১১), 'পুরাণের গল্প'। উপেন্দ্রকিশোরের এই বিপুল রচনাসম্ভারের অধিকাংশ

প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। বিশেষত উনিশ শতকে যখন তিনি আত্ম-প্রকাশ করেছেন একজন লেখক হিসেবে, তখন তাঁকে পৃষ্ঠাপোষকতা দিয়েছে ছোটদের সাহিত্যপত্রিকা। উনিশ শতকের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত উপেন্দ্রকিশোরের লেখার তালিকায় নজর দেওয়া যেতে পারে। ঃ

	প্রকাশিত লেখা	পত্রিকা	সংখ্যা	প্রকাশ কাল
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	মাছি	সখা	১ ভাগ, ২ সংখ্যা	১৮৮৩, ফেব্রুয়ারি
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	ধূমপান	সখা	১ ভাগ, ৩ সংখ্যা	১৮৮৩, মার্চ
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	মাকড়সা	সখা	১ ভাগ, ৪ সংখ্যা	১৮৮৩, মে
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	গিল্‌ফয় সাহেবের অদ্ভুত সমুদ্র-যাত্রা	সখা	১ ভাগ, ৫ সংখ্যা	১৮৮৩, জুন
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	মাকড়সা	সখা	১ ভাগ, ৬ সংখ্যা	১৮৮৩, আগষ্ট
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	একটি অন্ধ সীলের কথা	সখা	১ ভাগ, ১১ সংখ্যা	১৮৮৩, নভেম্বর
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	নিয়ম এবং অনিয়ম; বাধ্যতা এবং অবাধ্যতা	সখা	১ ভাগ, ১২ সংখ্যা	১৮৮৩, ডিসেম্বর
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	সহজে কি বড়লোক হওয়া যায়?	সখা	২ ভাগ, ১-৬ সংখ্যা	১৮৮৪, জানুয়ারি-জুন
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	চালনি বলেন ছুঁচ ভাই তুমি কেন ছেঁদা?	সখা	২ ভাগ, ৮ সংখ্যা	১৮৮৪, আগষ্ট
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	খুঁতধরা ছেলে	সখা	২ ভাগ, ১০ সংখ্যা	১৮৮৪, অক্টোবর
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	বড় লোক কিসে হয়	সখা	২ ভাগ, ১২ সংখ্যা	১৮৮৪, ডিসেম্বর
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	দুষ্ট বাঘ	সখা	২ ভাগ, ১২ সংখ্যা	১৮৮৪, ডিসেম্বর
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	রাগ	সখা	২ ভাগ, ৮ সংখ্যা	১৮৮৪, আগস্ট
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	ভূতের গল্প	সখা	৩ ভাগ, ২ সংখ্যা	১৮৮৫, ফেব্রুয়ারি
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	শেয়ালের গল্প	সখা	৩ ভাগ, ৪ সংখ্যা	১৮৮৫, এপ্রিল
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	সংকেত	সখা	৩ ভাগ, ৪ সংখ্যা	১৮৮৫, এপ্রিল
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	নূতন গল্প	সখা	৩ ভাগ, ৭ সংখ্যা	১৮৮৫, জুলাই
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	মূল বর্ণ	সখা	৩ ভাগ, ৮ সংখ্যা	১৮৮৫, আগস্ট
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	পূজার ছুটির আমোদ	সখা	৩ ভাগ, ১০ সংখ্যা	১৮৮৫, অক্টোবর
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	চীনের গল্প	সখা	৪ ভাগ, ১ সংখ্যা	১৮৮৬, জানুয়ারি
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	বেলুন	সখা	৪ ভাগ, ২,৩-৫ সংখ্যা	১৮৮৬, ফেব্রুয়ারি-মার্চ,মে
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	ভোঁদড়	সখা	৪ ভাগ, ৪ সংখ্যা	১৮৮৬, এপ্রিল
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	নানা প্রসঙ্গ	সখা	৪ ভাগ, ৫ সংখ্যা	১৮৮৬, মে
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	গরিলা	সখা	৪ ভাগ, ৫-৬ সংখ্যা	১৮৮৬, মে-জুন
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	নানা প্রসঙ্গ	সখা	৪ ভাগ, ৬-৭,১১ সংখ্যা	১৮৮৬, জুন-জুলাই, নভেম্বর
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	মশা	সখা	৪ ভাগ, ১০ সংখ্যা	১৮৮৬, অক্টোবর
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	মুদ্রাযন্ত্র	সখা	৪ ভাগ, ১১ সংখ্যা	১৮৮৬, নভেম্বর
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	দীপশিখা	সখা	৪ ভাগ, ১২ সংখ্যা	১৮৮৬, ডিসেম্বর
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	গ্লটন	সখা	৪ ভাগ, ১২ সংখ্যা	১৮৮৬, ডিসেম্বর
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	দীপশিখা	সখা	৫ ভাগ, ১ সংখ্যা	১৮৮৭, জানুয়ারি
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	নানা প্রসঙ্গ	সখা	৫ ভাগ, ৬ সংখ্যা	১৮৮৭, জুন
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	জলকণার গল্প	সখা	৬ ভাগ, ২ সংখ্যা	১৮৮৮, ফেব্রুয়ারি
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	বিড়াল	সখা	৭ ভাগ, ২ সংখ্যা	১৮৮৯, ফেব্রুয়ারি
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	টিয়া পাখী	সখা	৭ ভাগ, ৩ সংখ্যা	১৮৮৯, মার্চ
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	দাসত্ব প্রথা	সখা	৭ ভাগ, ৪-৫ সংখ্যা	১৮৮৯, এপ্রিল-মে
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	জ্যেষ্ঠ তাত	সখা	৭ ভাগ, ৫ সংখ্যা	১৮৮৯, মে
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	পুরাতন কথা	সখা	৮ ভাগ, ৮-১০ সংখ্যা	১৮৯০, আগস্ট-অক্টোবর
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	আদব কায়দা	সখা	৯ ভাগ, ২ সংখ্যা	১৮৯১, ফেব্রুয়ারি
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	দারজিলিং প্রবাসীর পত্র	সখা	৯ ভাগ, ৮ সংখ্যা	১৮৯১, আগস্ট
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	অন্ধদিগের কথা	সখা	১ ভাগ, ৫ সংখ্যা	১৩০১, ভাদ্র
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	গল্প নয় (সত্য ঘটনা)	সখা ও সাথী		১ ভাগ, ৬ সংখ্যা ১৩০১, আশ্বিন

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	নলিনী	সখা	১ ভাগ, ৪ সংখ্যা	১৩০০, শ্রাবন
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	গরিলা	সখা	১ ভাগ, ৫ সংখ্যা	১৩০০, ভাদ্র
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	হাতির দাঁতের গাছ	সখা	১ ভাগ, ৬ সংখ্যা	১৩০০, আশ্বিন
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	বেচারাম ও কেনারাম (সচিত্র নাটিকা)	সখা	১ ভাগ, ৭ সংখ্যা	১৩০০, কার্ত্তিক
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	আগ্নেয় পর্ব্বতের কথা	সখা	১ ভাগ, ৯ সংখ্যা	১৩০০, আশ্বিন
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	স্বরলিপি	দাসী	৪ ভাগ, ২ সংখ্যা	১৮৯৫, ফেব্রুয়ারি
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	এতদ্দেশীয় ও উইরোপীয় সঙ্গীত	দাসী	৪ ভাগ, ৩ সংখ্যা	১৮৯৫, মার্চ
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	হাফটোনের ছবি	প্রদীপ	১ ভাগ, ১০ ও ১১ সংখ্যা	১৩০৫, আশ্বিন ও কার্ত্তিক
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	উদয়াস্তের চন্দ্রসূর্য কেন বড় দেখায়?	প্রদীপ	২ ভাগ	১৩০৫-০৬
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	কর্ণকুন্তী সংবাদ	প্রদীপ	৪ ভাগ, ১০ ও ১১ সংখ্যা	১৩০৮, আশ্বিন ও কার্ত্তিক
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	ছেলেদের রামায়ন	মুকুল	২ ভাগ, ৪ সংখ্যা	১৩০৩, শ্রাবন
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	মহারাণী ভিক্টোরিয়া	মুকুল	৩ ভাগ, ৩ সংখ্যা	১৩০৪, আষাঢ়
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	ন্যানসেন	মুকুল	৩ ভাগ, ৬ ও ৭ সংখ্যা	১৩০৪, আশ্বিন ও কার্ত্তিক
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	সূর্য্যগ্রহণ	মুকুল	৩ ভাগ, ১০ সংখ্যা	১৩০৪, মাঘ
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	দুঃখীরাম	মুকুল	৪ ভাগ, ১,২,৩ সংখ্যা	১৩০৫,বৈশাখ,জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	স্যান্ডো	মুকুল	৪ ভাগ, ৪,৫ সংখ্যা	১৩০৫, শ্রাবণ, ভাদ্র
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	ধূমকেতু	মুকুল	৪ ভাগ, ৫ সংখ্যা	১৩০৫, ভাদ্র
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	ঘ্যাঁঘাসুর	মুকুল	৪ ভাগ, ৭ সংখ্যা	১৩০৫, কার্ত্তিক
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	শিয়াল পণ্ডিত	মুকুল	৪ ভাগ, ৮ সংখ্যা	১৩০৫, অগ্রহায়ণ
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	তিব্বত	মুকুল	৪ ভাগ, ৯ সংখ্যা	১৩০৫, পৌষ
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	বিড়ালের জাত	মুকুল	৪ ভাগ, ১০ সংখ্যা	১৩০৫, মাঘ
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	রামজীবন	মুকুল	৪ ভাগ, ১০ সংখ্যা	১৩০৫, মাঘ
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	ডাক্তার ফ্রান্‌জ্‌ হারমান মূলার	মুকুল	৪ ভাগ, ১২ সংখ্যা	১৩০৫, চৈত্র
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	লাল সূতা আর নীল সূতা	মুকুল	৪ ভাগ, ১২ সংখ্যা	১৩০৫, চৈত্র
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	কাঠবিড়ালী	মুকুল	৪ ভাগ, ১২ সংখ্যা	১৩০৫, চৈত্র
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	সেকালের কথা	মুকুল	৫ ভাগ, ১ সংখ্যা	১৩০৬, বৈশাখ
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	বুদ্ধুর বাপ	মুকুল	৫ ভাগ, ১ সংখ্যা	১৩০৬, বৈশাখ
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	বাদসাহি সারকাস্‌	মুকুল	৫ ভাগ, ২ সংখ্যা	১৩০৬, জ্যৈষ্ঠ
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	সেকালের কথা	মুকুল	৫ ভাগ, ২-৪,৬-৭, ৯-১২ সংখ্যা	১৩০৬, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ আশ্বিন-কার্ত্তিক, পৌষ-চৈত্র
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	বুদ্ধুর বাপ	মুকুল	৫ ভাগ, ২ সংখ্যা	১৩০৬, জ্যৈষ্ঠ
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	নরহরি দাস	মুকুল	৫ ভাগ, ৪ সংখ্যা	১৩০৬, শ্রাবণ
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	বাণ-ডাকা	মুকুল	৫ ভাগ, ৬ সংখ্যা	১৩০৬, আশ্বিন
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	পাকা ফলার	মুকুল	৫ ভাগ, ৮ সংখ্যা	১৩০৬, অগ্রহায়ণ
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	উকুনে বুড়ী	মুকুল	৫ ভাগ, ১২ সংখ্যা	১৩০৬, চৈত্র
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	আকাশের কথা	মুকুল	৬ ভাগ, ৪-৬, ৮ সংখ্যা	১৩০৭, শ্রাবণ-আশ্বিন, অগ্রহায়ণ
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	সাতমার পালোয়ান	মুকুল	৬ ভাগ, ৬ সংখ্যা	১৩০৭, আশ্বিন
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	দূরবীণ	মুকুল	৬ ভাগ, ১১ সংখ্যা	১৩০৭, ফাল্গুন
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	আষাঢ়ে গল্প	মুকুল	৭ ভাগ, ৩ সংখ্যা	১৩০৮, আষাঢ়
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	পুরী	মুকুল	১১ ভাগ, ১-৩,৫-৮ সংখ্যা	১৩১২, বৈশাখ-আষাঢ়, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	ঋতু	মুকুল	১১ ভাগ, ৯ সংখ্যা	১৩১২, পৌষ
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	জানোয়ারের শিক্ষা	মুকুল	১১ ভাগ, ১১ সংখ্যা	১৩১২, ফাল্গুন
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	মাছরাঙ্গার স্কুল	মুকুল	১২ ভাগ, ১ সংখ্যা	১৩১৩, বৈশাখ
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	আবার পুরীতে	মুকুল	১২ ভাগ, ১২,১৩ ভাগ,	১৩১৩, চৈত্র, ১৩১৪, আষাঢ়

			৩ সংখ্যা	
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	মহারাজা সায়াজী রাও গাইকোয়ার	মুকুল	১৩ ভাগ, ১ সংখ্যা	১৩১৪, বৈশাখ
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	অসন্তোষ	মুকুল	১৩ ভাগ, ১০ সংখ্যা	১৩১৪, মাঘ
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	ছেলেদের মহাভারত	মুকুল	১৩ ভাগ, ১১ সংখ্যা	১৩১৪, ফাল্গুন
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	মহাভারত	মুকুল	১৩ ভাগ, ১২ সংখ্যা	১৩১৪, চৈত্র
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	মহাভারত	মুকুল	১৪ ভাগ, ১-৬ সংখ্যা	১৩১৪, বৈশাখ-আশ্বিন
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	সাক্ষী শেয়াল	মুকুল	৮ ভাগ, ২ ও ৩ সংখ্যা	১৩০৯, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	দারজিলিঙ্গের পথে	মুকুল	৯ ভাগ, ২ সংখ্যা	১৩১০, জ্যৈষ্ঠ
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	দারজিলিং	মুকুল	৯ ভাগ, ৩, ৫/৬, ৮-১১ সংখ্যা	১৩১০, আষাঢ়, ভাদ্র ও আশ্বিন, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন

উপেন্দ্রকিশোরের মতো যোগীন্দ্রনাথও কলকাতায় উচ্চশিক্ষার জন্য এসে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হলেন। সাহিত্য রচনায় যোগীন্দ্রনাথের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল, কলকাতায় এসে জড়িয়ে পড়লেন ব্রাহ্মকেল্লার প্রমদাচরণদের সঙ্গে। 'সখা' পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেন অচিরেই। মূলত ছড়া, কবিতা ও গল্পের মনভোলানো সম্ভারে তিনি মোহিত করলেন বাংলার শিশু-কিশোরদের। অবশ্য বাংলার ছোটদের কাছে তিনি অধিক পরিচিত শিশুশিক্ষার গ্রন্থ প্রণেতা হিসেবে। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলার শিশুশিক্ষার প্রাথমিক বইয়ের শরীর থেকে নীতিশিক্ষার নিরেট বর্ম খুলতে পারেন নি। যোগীন্দ্রনাথ ছোটদের জন্য বর্ণশিক্ষার বই লিখতে এসে প্রথমেই মনোযোগ দিলেন শিশুতোষ মনের দিকে। ছোটদের মনের মতো করে একের পর এক প্রকাশিত হল তাঁর অবিস্মরণীয় বই। তবে নীতিকথার জগৎ থেকে যে পুরোপুরি মুক্তি পেলেন না তিনি, তার কারণ সমকালীন যুগপ্রবণতা পুরোপুরি উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু 'গুরুগিরি মুক্ত আনন্দময়তাই হল যোগীন্দ্রসাহিত্যের প্রথম কথা।' এ কারণেই আজও 'হাসিখুশি'র (১ম ভাগ, ১৮৯৭) 'অ-এ অজগর আসছে তেড়ে/ আমটি আমি খাব পেড়ে, বাঙালির কাছে সর্বাধিক জনপ্রিয় বর্ণবোধক ছড়া। শিশুদের মানসিক গঠনে একই সঙ্গে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং আনন্দের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন বলেই তিনি অদ্যাবধি বাংলার শ্রেষ্ঠ 'প্রাইমার' রচয়িতা।

কলকাতার সিটি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ ছোটদের জন্য লিখতে শুরু করছেন বিভিন্ন শিশুশিক্ষামূলক গ্রন্থ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—'হাসি ও খেলা' (১৮৯১), 'ছবি ও গল্প' (১৮৯২), 'রাঙা ছবি' (১৮৯৬), 'হাসি খুশি' (১৮৯৭), 'খুকুমণির ছড়া' (১৮৯৯), 'হাসিরাশি' (১৮৯৯), 'আষাঢ়ে স্বপন অথবা জানোয়ারের মেলা' (১৯০০), 'ছবির বই' (১৯০১), 'আদর্শ কবিতা' (১৯০২), 'নতুন ছবি' (১৯০৩), 'বন্দেমাতরম' (১৯০৫), 'মজার গল্প' (১৯০৬), 'বিদ্যাসাগর জীবনী' (১৯০৮), 'প্রাণী পরিচয়' (১৯১১), 'পশুপক্ষী' (১৯১১), 'ছোটদের মহাভারত' (১৯১৯), 'শিশুসাথী' (১৯২০), 'হাসির গল্প' (১৯২০), 'ছড়া ও পড়া' (১৯২১), 'ছেলেদের

কবিতা' (১৯২২), 'আদর্শ পাঠ' (১৯২৫), 'ছোটদের রামায়ণ' (১৯২৭), 'বনেজঙ্গলে' (১৯২৯),'ছোটদের চিড়িয়াখানা' (১৯২৯), প্রভৃতি। পাশাপাশি পত্র-পত্রিকায় চলছে নিয়মিত লেখার কাজ। উনিশ শতকে প্রকাশিত যোগীন্দ্রনাথের এই লেখাগুলির একটি তালিকা দেওয়া যেতে পারে।

	কাশিত লেখা	**পত্রিকা**	**সংখ্যা**	**প্রকাশ কাল**
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	বামন ও দানব	দাসী	৪ ভাগ, ১ সংখ্যা	১৮৯৫, জানুয়ারি
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	বেজায় গরম	মুকুল	১ ভাগ, ২ সংখ্যা	১৩০২, শ্রাবণ
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	সাপের গল্প	মুকুল	১ ভাগ, ৩ সংখ্যা	১৩০২, ভাদ্র
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	সখের সেনা	মুকুল	১ ভাগ, ৪ সংখ্যা	১৩০২, আশ্বিন
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	বানরের গল্প	মুকুল	১ ভাগ, ৪ সংখ্যা	১৩০২, আশ্বিন
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	অদ্ভুত কৌশল	মুকুল	১ ভাগ, ৪ সংখ্যা	১৩০২, আশ্বিন
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	ভালুক শিকার	মুকুল	১ ভাগ, ৫ সংখ্যা	১৩০২, কার্ত্তিক
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	তিন ভাই	মুকুল	১ ভাগ, ৬ সংখ্যা	১৩০২, অগ্রহায়ণ
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	বীর শিশু	মুকুল	১ ভাগ, ৭ সংখ্যা	১৩০২, পৌষ
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	শিশুর সঙ্গীত	মুকুল	১ ভাগ, ৮ সংখ্যা	১৩০২, মাঘ
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	শিশুর খেলা	মুকুল	১ ভাগ, ৯ সংখ্যা	১৩০২, ফাল্গুন
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	পাখীর বাসা	মুকুল	১ ভাগ, ১০ সংখ্যা	১৩০২, চৈত্র
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	নববর্ষের আমোদ	মুকুল	২ ভাগ, ১ সংখ্যা	১৩০৩, বৈশাখ
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	ভোজবাজি ও ভেল্কিবাজি	মুকুল	২ ভাগ, ১ সংখ্যা	১৩০৩, বৈশাখ
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	আচ্ছা জব্দ	মুকুল	২ ভাগ, ১ সংখ্যা	১৩০৩, বৈশাখ
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	সিংহের খেলা	মুকুল	২ ভাগ, ২ সংখ্যা	১৩০৩, জ্যৈষ্ঠ
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	লোভের শাস্তি	মুকুল	২ ভাগ, ৩ সংখ্যা	১৩০৩, আষাঢ়
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	পাখী ও হরিণছানা	মুকুল	২ ভাগ, ৬ সংখ্যা	১৩০৩, আশ্বিন
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	হিতে বিপরীত	মুকুল	২ ভাগ, ৬ সংখ্যা	১৩০৩, আশ্বিন
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	কে তুই বনের পাখী?	মুকুল	২ ভাগ, ৬ সংখ্যা	১৩০৩, আশ্বিন
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	ছুটির আমোদ	মুকুল	২ ভাগ, ৬ সংখ্যা	১৩০৩, আশ্বিন
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	সুন্দরবনে যাত্রা	মুকুল	২ ভাগ, ৭ সংখ্যা	১৩০৩, কার্ত্তিক
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	ইন্দু ও সরযু	মুকুল	২ ভাগ, ৭ সংখ্যা	১৩০৩, কার্ত্তিক
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	কুকুরের প্রভুভক্তি	মুকুল	২ ভাগ, ৭ সংখ্যা	১৩০৩, কার্ত্তিক
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	মাতালের পরিণাম	মুকুল	২ ভাগ, ৭ সংখ্যা	১৩০৩, কার্ত্তিক
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	কাকাতুয়ার গল্প	মুকুল	২ ভাগ, ৮ সংখ্যা	১৩০৩, অগ্রহায়ণ
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	সুখের মিলন	মুকুল	২ ভাগ, ৮ সংখ্যা	১৩০৩, অগ্রহায়ণ
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	অতিও লোভের সাজা	মুকুল	২ ভাগ, ৮ সংখ্যা	১৩০৩, অগ্রহায়ণ
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	বীর ফটিকচাঁদ	মুকুল	২ ভাগ, ১০ সংখ্যা	১৩০৩, মাঘ
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	পেটুক দামু	মুকুল	৩ ভাগ, ১ সংখ্যা	১৩০৪, বৈশাখ
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	কালা হারে কি ধলা হারে	মুকুল	৩ ভাগ, ১২ সংখ্যা	১৩০৪, চৈত্র
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	কাজের ছেলে	মুকুল	৪ ভাগ, ১ সংখ্যা	১৩০৫, বৈশাখ
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	মজার মুল্লুক	মুকুল	৪ ভাগ, ৭ সংখ্যা	১৩০৫, কার্ত্তিক
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	হাতী ও ব্যাঙ্	মুকুল	৬ ভাগ, ৪ সংখ্যা	১৩০৭, শ্রাবণ
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	খুকু যাবে শ্বশুরবাড়ী	মুকুল	৬ ভাগ, ৫ সংখ্যা	১৩০৭, ভাদ্র
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	উচিত শিক্ষা	মুকুল	৬ ভাগ, ৮ সংখ্যা	১৩০৭, অগ্রহায়ণ
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	প্রতিশোধের মজা	মুকুল	৮ ভাগ, ১ সংখ্যা	১৩০৯, বৈশাখ
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	আদর	মুকুল	৮ ভাগ, ২ ও ৩ সংখ্যা	১৩০৯, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	জীবদেহে তাড়িত	মুকুল	৮ ভাগ, ৮ সংখ্যা	১৩০৯, অগ্রহায়ণ
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	কাজ	মুকুল	৮ ভাগ, ১০ ও ১১ সংখ্যা	১৩০৯, মাঘ ও ফাল্গুন
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	আবাহন	মুকুল	১ ভাগ, ১ সংখ্যা	১৩০০, বৈশাখ
যোগীন্দ্রনাথ সরকার	নীতি ও বিদ্যা	মুকুল	৬ ভাগ, ২ সংখ্যা	১৮৮৮, ফেব্রুয়ারি

উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথের ছোটদের জন্য রচিত সাহিত্যের প্রধানগুণ এর সারল্য। দুজনে যখন সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করলেন তখন তাঁরা নিতান্তই তরুণ। শিশুসাহিতের ঊষালগ্নে তখন সবেমাত্র সলতে পাকানোর কাজ শুরু হয়েছে। বেহালা ও হারমোনিয়ামে মজে থাকা উপেন্দ্রকিশোর কলকাতায় পড়তে এসে ব্রহ্মকেল্লায় যাঁদের সহবাসী হলেন, তাঁদের অনেকেই ছোটদের জন্য লেখালেখি শুরু করেছেন। যোগীন্দ্রনাথ সামান্য পরে এসে যোগ দেবেন তাঁদের সঙ্গে। প্রথম থেকেই তিনি ছড়া, কবিতা ও গল্পের জগতে নিজেকে সঁপে দেবেন। উপেন্দ্রকিশোর বরাবরই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতিঅণুরক্ত। অথচ ততদিনে ছোটদের জন্য কাহিনি পরিবেশনের প্রয়াস শুরু হয়ে গেছে। 'সখা'র পাতায় এই ধারাবাহিক কাহিনির পাশাপাশি 'সখা'তে তিনি লিখলেন বেশকিছু গল্প। গল্প লেখা শুরু করলেন মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, হেমলতা দেবী, বিপিন বিহারী সেন, বিপিনচন্দ্র পাল, কুঞ্জবিহারী ঘোষ, প্রমুখ লেখক। গল্প পরিবেশনের এই আবহে উপেন্দ্রকিশোর 'সখা'র দ্বিতীয় ভাগ প্রথম সংখ্যায় (১৮৮৪, জানুয়ারি) লেখা শুরু করলেন তাঁর প্রথম ধারাবাহিক উপন্যাসধর্মী কাহিনী 'সহজে কি বড়লোক হওয়া যায়?' পরবর্তীতে 'সখ্যা'র পৃষ্ঠায় লিখবেন 'চালনি বলেন ছুঁচ ভাই তুমি কেন ছেঁদা?' 'খুঁত ধরা ছেলে', 'দুষ্ট বাঘ', 'ভূতের গল্প', 'শেয়ালের গল্প', ইত্যাদি। গল্প পরিবেশনের অভ্যাস বজায় থাকলে 'সখা ও সাথী', 'মুকুল', 'সন্দেশ' পত্রিকাতে। পত্রিকার জগৎ থেকে যখন তিনি পৌঁছুবেন 'টুনটুনির বই'-য়ে, তখন যে পরিণত, কৌতুকপটু উপেন্দ্রকিশোরকে দেখা যাবে, তার শিকড় সুপ্রোথিত আছে এই সময়ের গল্পগুলির মধ্যে।

'টুনটুনির বই'তে প্রকাশিত চরিত্ররা লোকসমাজ থেকে উঠে আসা। উপেন্দ্রকিশোর তাঁর বইয়ের উৎস প্রসঙ্গে ছেলে ভুলানো গল্পের ঋণ স্বীকার ক'রে জানিয়েছেন—'সন্ধ্যার সময় শিশুরা যখন আহার না করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িতে চায়, তখন পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলের স্নেরূপিনী মহিলাগণ এই গল্পগুলি বলিয়া তাহাদের জাগাইয়া রাখেন। সেই গল্পের স্বাদ শিশুরা বড় হইয়াও ভুলিতে পারে না। আশা করি আমার সুকুমার পাঠক-পাঠিকাদেরও এই গল্পগুলি ভালো লাগিবে।' লোকগল্পের প্রবণতা টুনটুনির বইয়ের প্রধান চরিত্ররা টুনটুনি, বাঘ, শিয়াল, কুমিরের মতো পশু-পাখি। মানুষও আছে, তারা শ্রেণিগত ভাবে নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক মানুষ হিসেবেই এই গল্পগুলিতে উপস্থিত হয়েছে। এই চরিত্রগুলির কাণ্ডকারখানা বিশ্বাস করা কেবলমাত্র ছোটোদের পক্ষেই সম্ভব। টুনটুনি ও বিড়ালনীর কথোপকথন, পণ্ডিত শিয়াল, বোকা বাঘ—শৈশবের কল্পনাকে উসকে দিতে অসম্ভব সফল।

'টুনটুনির বই'-এ মোট গল্পের সংখ্যা ছাব্বিশটি। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও একটি

সমাপ্তিমূলক গল্প 'পিঁপড়ে আর পিঁপড়ীর কথা'। এদের মধ্যে পাখির গল্প পাঁচটি। শেয়াল এসেছে তেরোটি গল্পে। বাঘের উপস্থিতি বারোটি গল্পে। কুমিরের গল্প তিনটি গল্পের অন্যতম চরিত্র হিসেব মানুষ এসেছে তেরোটি গল্পে। অর্থাৎ শিশুদের পরিচিত জগতের লোকেরাই উপেন্দ্রকিশেঅরের গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। চেনা চরিত্র অথচ তাদের স্বভাব আমুল বদলে গেছে। উপেন্দ্রকিশেঅরের পশুরা লোকগল্পের প্রকৌশলে লাভ করেছে মানুষের স্বভাব-চরিত্র। লোকগল্পের চেনা ছকে অবশ্য আটকে থাকলেন না উপেন্দ্রকিশোর, বরং চরিত্র সমূহের আশ্চর্য বিনির্মাণে তিনি আধুনিক যুগবিশ্বকে আবিষ্কারে সচেষ্ট হলেন। রাজতন্ত্র বনাম প্রজাতন্ত্র, সুবিধাবাদ, পুঁজিবাদী শিক্ষাতন্ত্র, ঔপনিবেশিক বাংলার চারিত্রিক স্খলন, বাঙালির চিরায়ত আকাশ-কুসুম কল্পনা 'টুনটুনির বই'-এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে আছে। বোকা বাঘ, ধূর্ত শেয়াল, মূর্খ জোলার কাহিনি আসলে পরাধীন বাঙালিজীবনের উনিশ শতকীয় শিশুসংস্করণ।

বাঘ শাসকের ক্ষমতার চূড়ান্ত প্রতীক। ক্ষমতার দম্ভে সাধারণ মানুষকে পীড়ন করা তার বিশেষ অধিকার। লোকগল্পগুলিতে এই বাঘকে জব্দ করার অজস্র কাহিনি আছে। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনজাগরণের নীতিগল্প নয়,'টুনটুনির বই'-তে শাসক সত্তার মিথে সাজোরে আঘাত করেছেন উপেন্দ্রকিশোর। ক্ষমতার সুউচ্চ মিনারে বসে থাকলেও রাজন্যবর্গ যে প্রকৃতপক্ষে পরজীবী, তাদের আচার-আচরণ যে শূন্যগর্ভ আস্ফালন, 'টুনটুনির বই'-এর বাঘেরা সে কথাই বলে। এখানে বাঘের উপস্থিতি বারোটি গল্পে। প্রত্যেকটি গল্পেই বাঘের আশ্চর্য বোকামি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'নরহরি দাস' গল্পে একটি ছাগলছানা বাঘের প্রবল কর্তৃত্বের বেলুনটি চুপসে দিয়েছে। শেয়ালের গর্তে বসে থাকা নরহির দাস তার মনে এমন কাঁপুনি ধরিয়েছে যে সে পঁচিশ হাত লম্বা এক লাফ দিয়ে শিয়ালকে সুদ্ধ নিয়ে পালাল'। অথচ খানিক আগেই সে সগর্বে বলেছিল 'বটে, তার এত বড় আস্পর্ধা! চল তো ভাগ্নে! তাকে দেখাব কেমন পঞ্চাশ বাঘে তার এক গ্রাস!' 'বাঘের উপর টাগ' কিংবা 'বাঘখেকো শিয়ালের ছানা' গল্পেরও বাঘেদের এই বীরত্বের ননুনা রয়েছে। অথচ এই বাঘেরাই ক্ষমতার স্বাদে পারেনা এহেন কাজ নেই। 'বাঘ-বর' গল্পে জোর ক'রে এক গরীব ব্রাহ্মণের মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছে সে। 'বাঘের রাঁধুনি' গল্পে একটি মেয়েকে অপহরণ করেছিল। ত্রৈলোক্যনাথের 'লুল্লু' ও উপেন্দ্রকিশোরের মাঘ উনিশ শতকের লোলুপ জমিদারের কথা স্মরণ করায়।

বাঘের মিথ ভেঙে দিয়েছে ছাগল ও শেয়াল। ছাগল একেবারেই সাধারণ বৈশিষ্ট্যহীন নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রতিনিধি। বিপ্লবের জন্ম্য সেই নিম্নবর্গীয় অবস্থান থেকেই। 'নরহরি দাস' গল্পের ছাগল মা তার ছানাকে গর্তের বাইরে যেতে দিত না। বলতো—'যাসনে! ভালুকে ধরবে, বাঘে নিয়ে যাবে, সিংহে খেয়ে ফেলবে!' উনিশ

শতকের বাঙালি এই বীজ মন্ত্র জপেছে ঔপনিবেশিকতার ফলশ্রুতিতে। সবকিছু নীরবে নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া ছিল তার ভবিতব্য। এমনকি উনিশ শতকের ছোটদের সাহিত্য-পত্রিকাগুলি নিয়মিত ইংল্যাণ্ডেশ্বরীর স্তাবকতায় ছোটোদের মনে পরাধীনতার মায়াকাজল রঙিন করে এঁকে দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়মিতভাবে সুসম্পন্ন হতো। ঔপনিবেশিক মননে সুকুমার প্রবৃত্তির সন্তান তৈরির শিক্ষাযন্ত্রে তৎকালীন সমাজ নিজেদের দিব্যি আঁটিয়ে নিয়েছিল, সেভাবেই উনিশ শতকের ছোটদের সাহিত্য পরিকল্পিত হয়েছে। উপেন্দ্রকিশোর সুকৌশলে পরিহার করবেন এই ঐতিহ্য। বঙ্গভঙ্গের প্রণোদনায় বাঙালির মোহমুক্তি ঘটেছিল। ফলে ছোট্ট ছাগল ছানা একদিন বাইরে বেড়িয়ে বিশ্বজয় (বাঘকে বোকা বানানো) করলো। পরাধীন দেশের বালক-বালিকারা বাঘের বোকামি দেখে হেসে গড়িয়ে পড়লো; কিন্তু ভুললো না, শক্তিমান মানেই অজেয় নয়, বুদ্ধিমান লোকেরা অনায়াসেই জয় করতে পারে দুর্গমকে। 'ঠাকুরমার ঝুলি','রাজকাহিনী', রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ' ও একই অভয়বাণী শুনিয়েছিল সেই ঝড়ের সময়ে।

শিশুসাহিত্যে বড়দের জগতের জটিলতা আসবে না অথচ উপেন্দ্রকিশোর সুকৌশলে সমাজের সঙ্গে পরিচয় ঘটান ছোটদের। অথচ গল্প পড়তে গিয়ে একবারও মনে হবার উপায় নেই যে তিনি ছোটদের মনের মতো করে এগুলি সৃজন করেন নি। বরং উপেন্দ্রকিশোরের আছে সেই বিরল দৃষ্টি, শিশুসুলভ মন, যা তাঁকে সহজ করেছে। পশু-পাখিদের মুখের ভাষাও হয়ে উঠেছে শিশুবোধক। যেমন—'টুনটুনি আর নাপিতের কথা' গল্পে 'টুনটুনি গিয়েছিল বেগুন পাতায় বসে নাচতে। নাচতে-নাচতে খেল বেগুন কাঁটার খোঁচা। তাই থেকে হল তার মস্ত বড় ফোঁড়া।' সে ফোঁড়া সারানোর জন্য টুনটুনি নাপিতের কাছে গেল। তখন—

"নাপিত তার কথা শুনে ঘাড় বেঁকিয়ে নাক সিঁটকিয়ে বললে, 'ঈস! আমি রাজাকে কামাই, আমি তোর ফোড়া কাটতে গেলুম আর কি!"

ভাষার এই সহজ-সারল্য যোগীন্দ্রনাথের রচনারও প্রধান বৈশিষ্ট্য। টুনটুনির এই একই কাহিনি তিনি শুরু করবেন এইভাবে—'এক যে ছিল টুনি, তার ছিল এক বেগুন গাছ। সেই গাছে আঁকশি দিয়ে রোজ রোজ সে বেগুন পাড়ত। বেগুনের বোঁটায় কাটা থাকে, তা তো জান। একদিন হয়েছ কী, টুপ করে একটা বেগুন পড়ে টুনির পিঠে কাঁটা ফুটে গেল। অমনি ব্যথায় ছটফট করতে করতে সে নাপিতের বাড়ি ছুটল'। নিজেদের সখ্যতার মতো, বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও উপেন্দ্রকিশোর এবং যোগীন্দ্রনাথ কখনও কখনও একবিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছেন। টুনটুনি, বাঘ, পান্তাবুড়ি দুজনেরই প্রিয় প্রসঙ্গ।

উনিশ শতকের ছোটদের আখ্যানবৃত্তান্তে সৎচরিত্র গঠন, পিতা-মাতাকে মান্য করার সুপরামর্শ, ব্রিটিশ রাজপুরুষ বা দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জীবনী পরিবেশনের যে

ঝোঁক ছিল, উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ সেখান থেকে সরে এসে ছোটদের জন্য বিশুদ্ধ গল্প পরিবেশনের আয়োজন সুসম্পন্ন করেন। এক্ষেত্রে তাঁরা লোকগল্পের আঙ্গীক যেমন ব্যবহার করেছেন,তেমনি কাহিনিবৃত্তে এনেছেন উপকথা, রূপকথার আমেজ। চরিত্র হিসেব বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন পশু-পাখি, মনুষ্যেতর প্রাণীদের। এমন কি ছোটদের জন্য বিশুদ্ধ গল্প পরিবেশনের আয়োজন সুসম্পন্ন করেন। এক্ষেত্রে তাঁরা লোকগল্পের আঙ্গীক যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমনি কাহিনিবৃত্তে এনেছেন উপকথা, রূপকথার আমেজ। চরিত্র হিসেব বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন পশু পাখি, মনুষ্যেতর প্রাণীদের। এমন কি ছোটদের মনের কাছাকাছি পৌঁছানোর জন্য তাদের 'ডিকনস্ট্রাকট' করেছেন। যেমন উপেন্দ্রকিশোরের 'বোকা জোলা আর শিয়ালের কথা' গল্পে শিয়ালের ঘটকালিতে বোকা জোলার বিয়ে হয় এক রাজকন্যার সঙ্গে। উপেন্দ্রকিশোরের এই শিয়াল—"কানে কলম গুঁজে, পাগড়ি এঁটে, জামা জুতো পরে, চাদর জড়িয়ে ছাতা বগলে করে, শিয়াল যখন রাজার কাছে উপস্থিত হলো, তখন রাজামশায়ই ভাবলেন, এ খুব পণ্ডিত লোক হবে।" এই শিয়াল পণ্ডিত বাঙালির শূন্যগর্ভ আত্মম্ভরিতার প্রতীক। গল্পের মূল তাৎপর্য শিশুদের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর না হলেও, এর মজা তারা অনায়াসে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। শিশুসাহিত্যের জন্য এই অনুধাবনযোগ্যতা একান্ত জরুরি। এমনকি রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনি পরিবেশনের পত্রিকাকেন্দ্রিক যে বিপুল আয়োজন এসময় লক্ষ্য করা গেছে, তা সারল্য ও কৌতুকের মিশেলে কাহিনির বিন্দুমাত্র অঙ্গহানি না ঘটিয়ে চমৎকারভাবে পরিবেশন করেছেন উপেন্দ্রকিশোর এবং যোগীন্দ্রনাথ।

ছোটদের বাংলা কবিতায় ইতিমধ্যে বদল শুরু হয়েছে। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, কামাখ্যাচরণ ঘোষ, হরিশচন্দ্র মিত্র, রাধামাধব মিত্র, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়,যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ভিখারীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখের লেখা ছোটদের বাংলা কবিতার মূল সুর ছিল উচ্চ নৈতিক আদর্শের বা নীতিবোধের সুরে বাঁধা। যেমন যদু গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের 'পদ্যপাঠ'—এর (১৮৮৪) একটি কবিতায় সময়ের মূল্য সম্পর্কে শিশুদের সচেতন করে বলা হলো—

'রাশি রাশি ধন দাও অমূল্য সময়
একবার গেলে আর আসিবার নয়।
নিতান্ত নির্বোধ যেই শুধু সেই জন,
অমূল্য সময় করে বৃথায় যাপন।'

ছোটদের জন্য প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত গদ্য ও ছড়ার যে বিপুল আয়োজন লক্ষ্য করা গেল, সেখানেই এই নীতিবোধই প্রকৃত নির্ণায়ক ভূমিকায় অবতীর্ণ

হয়েছে। 'বালকবন্ধু'র কয়েকটি কবিতায় অবহ্য নীতিকথার পরিবর্তে প্রকৃতি ও ঈশ্বরপ্রীতি স্থান পেয়েছে, কিন্তু কবিতায় শিশু মনোরঞ্জনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে 'সখা' পত্রিকা পর্যন্ত। 'সখা'র প্রথম সংখ্যায় (১৮৮৩, জানুয়ারি) সম্পাদক প্রমদাচরণ লিখলেন 'আঃ ছেড়ে দাও না!' নামের একটি কবিতা—

'আঃ ছেড়ে দাও না কুকুরচন্দ্র
এখন কি আর খেলা করবার সময় আছে, ভাই?
দেখ্‌ছ না কি হাঁড়ি হাতে, চাল ধোওয়া রয়েছে তাতে,
মা বলেছেন নিয়ে যেতে, 'চাকর বাকর' নাই।
কাজটা সেরে ফিরে এলে, এখন তোমায় আমায় কিলে
মনের সুখে ক'রব খেলা যত ভেবে পাই।
কাজ ছেড়ে না ক'রব খেলা, ছেড়ে দাও না হলো বেলা!
আগে কাজ কি আগে খেলা জানতে আমি চাই!'

এই কবিতার শেষে সময়ের যথার্থ ব্যবহারের জন্য সচেতন করার সামান্য আভাষ রয়েছে ঠিকই, কিন্তু কবিতার ভাষা ও ভঙ্গি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, কবিতার সুর বদলাচ্ছে। নীতিবোধের বন্ধন শিথিল হয়ে কবিতা ছোটদের মনের সামগ্রী হওয়ার দিকে যাত্রা শুরু করেছে। এই বদল লক্ষ্য করা গেল 'সখা'র অন্যান্য কবিদের লেখাতেও। 'প্রকৃতর শোভা' (সভা, ১৮৮৩, প্রথম ভাগ, ষষ্ঠ সংখ্যা) কবিতায় মনোরঞ্জন গুহ লিখলেন—'কালি হবে বাকি পড়া/আজি পড়া রেখে দাও। হয়েছে অনেক রাতি/ বই রেখে ঘুম যাও।।' মনে রাখতে হবে, 'শিশুগণ'-এর 'নিজ নিজ পাঠে' মন দেওয়ার চিত্র দিয়েই মদনমোহনের ছোটদের জন্য বাংলা কবিতার সূচনা হয়েছিল। শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবী 'সখা'র দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় বালক-বালিকাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে আস্ত একটি কবিতা লিখছেন অথচ সেখানে 'পড়াশুনা', 'ভালো হওয়া' 'সুকুমার প্রবৃত্তি' ইত্যাদি অত্যন্ত আবশ্যকীয় শব্দ অনুপস্থিত। হিরন্ময়ী দেবী 'বাগানেতে খেলা' গদ্য বরং লিখলেন— 'বালক বালিকা দুটী/খেলিছে মনের সুখে,/করিতেছে ছুটাছুটী,/হাসিটী না ধরেমুখে।' অথচ বিদ্যাসাগর মহাশয়দের আপ্রাণ চেষ্টা ছিল অহেতুক ছোটাছুটিতে না গিয়ে, বাংলার ছেলে-মেয়েরা যেন মন দিয়ে লেখা-পড়া করে গোপাল বালকটি হয়ে ওঠে। কবিতার এই বদলে যাওয়া মুহূর্ত প্রকৃতপক্ষে বাংলার শিশু ও কিশোরদের বন্ধনমুক্তির টুকরো ঝলক হয়ে উঠবে।

এই বদলে যাওয়া সময়ে রাজপুত্রের মতো উপস্থিত হলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার। শিশুতোষ সোনার কাঠির ছোঁয়ায় তিনি ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললেন ছোটদের বাংলা কবিতাকে। সাময়িকপত্রের পাশাপাশি নিজেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে ছোটদের জন্য একের

পর এক ছড়া ও কবিতার বই প্রকাশ শুরু করলেন। এমন কি শিশুশিক্ষার মতো নিতান্ত নিরেট একটা জগতেও কবিতা প্রাণের নরম স্পর্শ ছুঁইয়ে দিল, সম্পূর্ণ নতুন একটি খাতে বইতে শুরু করলো বাংলা কবিতা। উদ্ভট ও আজগুবি বিষয়ে অবগাহন করে কেজো নীতিকথার জগতের বিদায়দৃশ্য রচিত হলো।

'শিশুশিক্ষা'র জন্য লিখতে বসে তিনি ভোলেন না, 'শিশুদের মধ্যে যথেষ্ট কাব্যরসগ্রাহিতা আছে এবং তারা উপদেশকে ভালোবাসে না।' তাই শিশুদের জন্য রচিত তাঁর কবিতায় একধরণের সৃষ্টিশীল সৌন্দর্যের সঞ্চার ঘটে যায়। ময়ূরের বর্ণনায় তিনি অনায়াসে তাই লিখতে পারেন—

'আয় রে ময়ূর আয়—
প্যাখম্ ধরে নেচে নেচে যাদুর কাছে আয়!
আসতে যেতে খুঙুর বাজে, সোনার নূপুর পায়!' ('ময়ূর'/'ছবির বই')

১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত 'হাসি ও খেলা' বইটি। এরপরে কবিতা ও ছড়া নিয়ে প্রকাশিত হয় 'হাসিখুশি', 'খুকুমণির ছড়া', 'হাসিরাশি'। এই তিনটি বইয়ের ছড়া ও কবিতা তাঁকে তুমুল জনপ্রিয়তা দিল, একই সঙ্গে ছোটদের বাংলা কবিতা পেল নতুন পথের দিশা।

যোগীন্দ্রনাথের ছড়া ও কবিতার মূল বৈশিষ্ট্য সহজ সারল্য ও নির্মল আনন্দ, যা শিশুদের বোধের পক্ষে একান্ত জরুরী। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই আনন্দ কৌতুকের আবহ সৃষ্টি করেছে। যেমন 'হাসিরাশি'র 'পেটুক দামু' কবিতায় পেটুক দামু কলা খাওয়ার লোভো করিম মিঞাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে। কলার খোসায় পা পিছলে পড়ে করিম মিঞা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিপদে পরে 'দামু'। কেননা, কলার খোসায় পিছলে করিম মিঞা পড়ে দামুর-ই কাঁধে।—

'হাঁউ মাঁউ খাঁউ করে দামু ঠোঁট দু'খানি কাঁপে;
পিঠটা বুঝি গেল ভেঙে করিম মিঞার চাপে।
পেটের চেয়েও পিঠের জ্বালা দামু কেঁদে সারা
তার প্রতিফল পায়, যেমন কাজটি করে যারা।' ('পেটুক দামু'/'হাসিরাশি')

এই বইয়ের 'দুষ্টু তিনু' কবিতায় তিনুর কাজই হলো 'ফাঁকি দিয়ে গাড়ি চড়া।' তাই কোচম্যানকে ফাঁকি দিয়ে সে চেপে বসতো ঘোড়ার গাড়ির পিছনে। একদিন হাতে নাতে তাকে ধরতে কোচম্যান যেই গাড়ির ছাদের উপরে দিয়ে গদীয়ান/ তিনুর দিকে চুপিসারে এগিয়েছে, তিনু অমনি গাড়ির সামনে চলে যায়। কোচবাক্স বসে লাগাম ধরে সে—'কোচ্‌ম্যান ভ্যাবাচাকা,/সারা গায়ে ঘাম;/মহা খুশি তিনকড়ি—/ধরিল লাগাম।/ তারপরে দিল ঘোড়া/ জোরে ছুটাইয়া;/ পথে পড়ে হাহাকার/ করে বুড়ো মিয়া।' এমন

ছেলেমানুষী ও দুষ্টুমি যোগীন্দ্রনাথের ছড়া, কবিতা ও গল্পে অজস্র ছড়িয়ে আছে। শৈশবের দুষ্টুমির দিনগুলি তাঁর কবিতায় অনবদ্যভাবে ফিরে এসেছে, বাংলা শিশুসাহিত্য এ কারণে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

বাংলা শিশুসাহিত্যে নন্‌সেন্স রস বা আজগুবী ও উদ্ভট বিষয়ের প্রচলনের ক্ষেত্রে যোগীন্দ্রনাথ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। বাৱলার শিশু পাঠকদের কাছে তিনি সুকুমার রায়ের বহু আগেই উপহার দিলেন আজব ও আজগুবি প্রাণিদের। 'খুকুমণির ছড়া' তে একটি উদ্ভট প্রাণীর বর্ণনা দিয়ে লিখলেন সেই অবিস্মরণীয় ছড়া—'হাট্টিমা টিম্‌টিঙ/ তারা মাঠে পাড়ে ডিম/ তাদের খাড়া দুটো শিং/ তারা হাট্টিমা টিম্‌টিম'। ছড়ায় শামুক জাতীয় প্রাণীর দিকে ইঙ্গিত থাকলেও ছোটদের কাছে এই প্রাণী শিহরণ জাগানো অদ্ভুত কোনো প্রাণী বলেই উপস্থিত হয়। তাঁর অবাস্তব ও আজগুবি প্রাণী ও ভুত ইত্যাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—'একানেড়ে', ড্যামরাচোখো, হুসুর-মুসুর। ছোটদের ভয় দেখানোই এদের কাজ। 'হিজিবিজি'-র 'আজব চিড়িয়াখানা' ছড়ায় একাধিক কাল্পনিক আজব প্রাণীর বর্ণনা আছে—

'বাঘের মুখে ঝুলতো যদি, রামছাগলের দাড়ি,
শূয়োর যদি পাখির মত, উড়তো ডানা নাড়ি;
গাছের ডালে বসে বাঁদর গোঁফে দিত চাড়া,
ভূতম পেঁচা আসত ছুটে, বাগিয়ে বিষম দাঁড়া,'

নিজেদের সৃজনশীলতায় ছোটদের কবিতা ও গল্পের জগতে আমূল পরিবর্তন এনেছেন উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ। এর বাইরেও তাঁরা শিশুসাহিত্যের বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবেন। বিশেষত ছোটদের প্রকাশনার জগৎ তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথ—দুজদেই সরাসরি যুক্ত হয়েছেন প্রকাশনার ব্যবসায়। প্রমদাচরণে 'সখা' বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর 'সখা'র ছাপার ব্লক কিনে নিয়ে ৬৪নং কলেজ স্ট্রিটে যোগীন্দ্রনাথ খুললেন 'সিটি বুক সোসাইটি'। বিদেশ থেকে এলকিছু ব্লক। লিথোগ্রাফে তৈরি ব্লকগুলির জন্য ছবি এঁকে দিতেন 'স্টেটস্‌ম্যানে'-এর বিখ্যাত চিত্রকর পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, বন্ধুবর উপেন্দ্রকিশোর এবং বাণিজ্যিক ছবির আইকন যতীন্দ্রনাথ সেন। নিজের বই ছাপানোর পাশাপাশি অন্যদের লেখা প্রকাশের জন্য উদ্যোগ নিলেন। উপেন্দ্রকিশোরের 'ছেলেদের রামায়ণ'— এর দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯০৭) প্রকাশিত হবে 'সিটি বুক সোসাইটি' থেকে। আর বাংলা প্রকাশনার জগতে যন্ত্রবিপ্লব ঘটানো উপেন্দ্রকিশোর বহুদিন ধরেই ছাপার ব্লক (বিশেষত হাফটোন ফটোগ্রাফি) নিয়ে সিরিয়াস চর্চা করেছেন। 'পেনরোজেস পিক্টোরিয়াল অ্যানুয়াল' পত্রিকার মতো বিখ্যাত মুদ্রণ বিষয়ক পত্রিকায় চর্চিত হচ্ছে তাঁর প্রবন্ধ। ফলে ১৮৯৫ সালে যখন ব্লক-সংক্রান্ত ব্যবসা

শুরু করবেন, বাংলা শিশুসাহিত্যের ভবিস্যৎ নতুন সম্ভাবনা দেখতে শুরু করবে। উপেন্দ্রকিশোর প্রতিষ্ঠিত ইউ রায় এণ্ড সন্স (বারবার ঠিকানা বদলে যা স্থায়ী হবে গড়পারে) তাঁর একাধিক বইয়ের প্রকাশক। গ্রন্থের সুচারু নির্মাণের দিকে উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথের সতর্ক নজর ছিল। উপেন্দ্রকিশোর সম্পাদিত 'সন্দেশ' পত্রিকা এই নির্মাণ-সৌর্কর্যের জন্য ছোটদের মনোলোভা হয়েছিল অচিরেই।

উপেন্দ্রকিশোর শিল্পী মানুষ। এমনকি বন্ধু রবীন্দ্রনাথের লেখাও তাঁর অলংকরণ ও চিত্রে শোভিত হয়েছে। সুতরাং তিনি যে ছোটদের সাহিত্য ভরিয়ে তুলবেন ছবি ও অলকরণে, তা খুবই প্রকাশিত। ব্লক প্রিন্টিংয়ের পাশাপাশি মুদ্রণের নতুন প্রযুক্তি ও ফটোগ্রাফি নিয়ে পড়ার জন্য স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে ছেলে সুকুমার রায় পড়তে যাবেন খানিকটা এই চিত্রশোভিত শিশুসাহিত্যের জন্যই। যোগীন্দ্রনাথও গল্প ও কবিতা পরিবেশনের ক্ষেত্রে জোর দিয়েছেন ছবি ও অলংকরণের উপর। যোগীন্দ্রনাথের প্রায় প্রতিটি বই-ই সচিত্র। এর কারণ ঐ শিশুর মনে রঙের নেশা জাগানো। 'জ্ঞানমূকুল' প্রসঙ্গে ১৩০০ সনের মাঘ মাসের 'সাথী' পত্রিকায় তিনি ছোটদের বইয়ের অলংকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেছেন—'গল্পচ্ছলে সুন্দর সুন্দর চিত্রের সাহায্যে, সকল বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারিলে, শিক্ষা অতিশয় সহজ হয়, এবং তাহার ফলও হয় আশানুরূপ।—বালক-বালিকা ইহাতে শিক্ষা ও আমোদ উভয়ই পাইবে।'

যোগীন্দ্রনাথের বইয়ে লেখা ও ছবি যেন একে অপরের পরিপূরক। লিখেছেন চিত্রের মাধ্যমে বর্ণের ছড়া। এই রেখাক্ষর বর্ণমালাতে তিনি বিভিন্ন বর্ণকে মানুষের অথবা পশুর আদলে গড়েছেন। সংখ্যা চেনাবার জন্য। 'হাসিখুশি'র ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলিকে তিনি দিয়েছেন সঙের সাজ।

সাহিত্য শুধুমাত্র অক্ষরে ছাপা মাধ্যম হিসেবে নয়, তা যেন হতে পারে ছোটদের কল্পনা উস্‌কে দেওয়া ছবিরও স্বর্গরাজ্য, এই বিষয়ে অসামান্য সচেতন ছিলেন পাশাপাশি উপেন্দ্রকিশোর এবং যোগীন্দ্রনাথ। ফলে শুধুমাত্র স্রষ্টা হিসেবে নয়, বাংলা শিশুসাহিত্য তাঁরা জাদুকর শিল্পী হিসেবে উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন।

রায়চৌধুরী পরিবার ঃ বাংলা শিশুসাহিত্যের লালনঘর

রাসবিহারী দত্ত

শৈশব কৈশোরেই লুকিয়ে থাকে মহিরুহের সম্ভাবনা। তাকে অনুশীলন ও চর্চায় যথার্থ রূপ দিতে পারলেই ভবিষ্যতে এক বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়। বিস্তার করে তার অজস্র শাখাপ্রশাখা। যেমনটি ঘটেছে রায়চৌধুরী পরিবারে। এই পরিবারেই একদিন বাংলা শিশুসাহিত্য-বৃক্ষ অঙ্কুরোদ্গম থেকে ধীরে ধীরে ডালপালা প্রসারিত করে পাতায় ফুলে ফলে সজ্জিত হয়ে এক বনস্পতিতে পরিণত হয়েছে। আর এই বৃক্ষের বীজ যিনি বপন করেছিলেন, তিনি আর কেউ নন, বাংলা শিশুসাহিত্যাকাশের অন্যতম এক উজ্জ্বল নক্ষত্র উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। জন্ম বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার মসুয়া গ্রামে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফল বেরোতেই বৃত্তি পান। তারপর গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন উপেন্দ্রকিশোর। তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুটি পরস্পর ভাবধারার এক প্রবল দ্বন্দ্ব চলছিল কলকাতায়। এক কথায় নবজাগরণের নবজীবনের জোয়ার। রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল দ্বন্দ্বে মধ্যপন্থী রাজা রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ। এখানে এসে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির শিশুসাহিত্য চর্চা এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বন্ধুত্ব তাঁর জীবনে নতুন দিক খুলে দেয়।

তখনো পর্যন্ত বাংলা শিশুসাহিত্য সূতিকাগারেই আটকে ছিল। বেশির ভাগ লেখাই বিদেশি রচনার অনুকরণ ও ভাবানুকরণ। বাংলা শিশুসাহিত্য রচনা ও প্রকাশনার হাল তাঁকে চিন্তিত করে তোলে। তিনি জোট বাঁধলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে। চিন্তা ও গবেষণায় গড়ে উঠল 'স্কুল বুক সোসাইটি'। এই সংস্থা থেকে উপেন্দ্রকিশোরের প্রথম বই 'ছেলেদের রামায়ণ' প্রকাশিত হয়। সব ছবি তিনিই এঁকেছিলেন। তখন ছবি ছাপার পদ্ধতির জন্যই ছবিগুলি মার খায়। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে নিজের খরচে বিলেত থেকে আধুনিক যন্ত্রপাতি আনিয়ে ৭নং শিবনারায়ণ দাস লেনে নতুন বাড়ি ভাড়া নিয়ে 'ইউ রায় এণ্ড সন্স' নামে প্রেস প্রকাশনা ও স্টুডিও হাফটোন ব্লক প্রিন্টিংয়ে তাক লাগিয়ে দেন। তাঁর নতুন কৃতিত্ব ছড়িয়ে পড়ল কলকাতায়।

কঠোর শ্রমে এরপর আনলেন বৈচিত্র্যের শিশুসাহিত্য রচনা, অনুসারী ছবি, চিত্রাঙ্কন, ব্লক নির্মাণ ও মুদ্রণ। পারিপাট্য তাঁকে পৌঁছে দিল খ্যাতির সীমানায়। কলকাতায় উন্নতমানের ছাপা, ছবি সহ অপূর্ব অলংকরণ, পাঠকচিত্তকে জয় করে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি ময়মনসিংহ থেকে শুরু করেছিলেন বাঁশি ও বেহালায় সংগীতচর্চা। কলকাতায় এসে ভর্তি হন আঁকার স্কুলে। গ্রামীণ সংস্কৃতির পল্লীগীতি থেকে তীক্ষ্ণ মেধায় বিজ্ঞানাশ্রয়ী

শিশুসাহিত্যরচনায় উৎকর্ষ ছড়ালেন সমকালীন পত্রপত্রিকায়। তাঁর লেখার শুরু ১৮৮৩ তে, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রজীবনে। প্রমদাচরণ সেনের 'সখা' তখন সবে বেরিয়েছে। মুগ্ধ উপেন্দ্রকিশোর যোগাযোগ করলেন সম্পাদকের সঙ্গে। দ্বিতীয় সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় বিশেষ রচনা 'মাছি'। ১৮৮৩ তেই ভুবন রায় প্রকাশ করেছিলেন 'সাথী'। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মুকুল' পত্রিকার সঙ্গে প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন। কিন্তু এইসব পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকতে থাকতেই বুঝেছিলেন যে নিজস্ব উদ্যোগে পত্রিকা প্রকাশ ছাড়া পরিতৃপ্তি সম্ভব নয়। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করলেন নিজস্ব পত্রিকা 'সন্দেশ'। সূচনা হল রায়চৌধুরী পরিবারের শিশুসাহিত্য জগতে অন্তর্ভুক্তি। শিশুসাহিত্যের লালন-পালন-চর্চার তীর্থক্ষেত্র। সেই সময়ের প্রকাশিত পত্রিকার তুলনায় 'সন্দেশ' নিজে প্রমাণ করে মুদ্রণ পারিপাট্যের অন্য নিদর্শন। লেখক হিসেবে উপেন্দ্রকিশোর পান রবীন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস রায়, ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলদারঞ্জন রায়, সীতাদেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, কেদার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখদের। আর দেখা দিল কীভাবে একটি পরিবার সম্পূর্ণরূপে শিশুসাহিত্য সাধনার পীঠস্থান হয়ে উঠতে পারে।

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ই মে, মনান্তরে ১০ই মে, উপেন্দ্রকিশোরের জন্ম। সুপণ্ডিত, আরবি, ফার্সি ও সংস্কৃতভাষার অধিকারী কালীনাথ রায় আটটি সন্তানের জন্ম দেন। তৃতীয় পুত্র কামদারঞ্জনই অপুত্রক জমিদার হরিকিশোর রায়চৌধুরীর দত্তক পুত্র হন। তখন কামদারঞ্জনের নতুন নাম হয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। প্রথম পুত্র সারদারঞ্জন বাংলা ক্রিকেটের জনক। ডবলিউ, জি, গ্রেস, নামে খ্যাত। গণিত ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। তিনি কালিদাসের 'রঘুবংশম' বাংলায় সম্পাদনা করেন। চতুর্থ ভাই কুলদারঞ্জন অনুবাদে সমর্পিত প্রাণ। 'সন্দেশে'-র উপযোগী ইলিয়াড ওডিসি, রবিনসন ক্রুশো, শার্লক হোমস-এর পাশাপাশি পুরাণের গল্প, কথাসরিৎসাগর, বেতাল পঞ্চবিংশতি, পঞ্চতন্ত্র বত্রিশ সিংহাসন ছোটোদের মতো করে প্রকাশ করেছেন 'সন্দেশ'-কে সমৃদ্ধ করার জন্য। ছোটোভাই প্রমদারঞ্জন চাকুরিসূত্রে জরিপ বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মী। বনজঙ্গল, পাহাড়ের রোমাঞ্চকর কাহিনি তুলে ধরতেন 'সন্দেশ'-এর পাতায়। শিশু-কিশোর সাহিত্য এই বাংলায় তাঁর কাছে চিরঋণী।

বীরসিংহের অনমনীয় সিংহ ঈশ্বরচন্দ্রকে কলকাতায় কল্কে পেয়ে বিদ্যাসাগর হতে সময় লেগেছিল বিস্তর। ঠাকুর-চাকরের বেড়া পেরিয়ে শিশু রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যের মহিরুহ হতে কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে অনেক। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোরকে শিশুসাহিত্যের ঘরানা তৈরি করতে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল ঠিকই কিন্তু পূর্বোক্ত জনদের মতো বেগ পেতে হয় নি। শিশুমনস্কতাকে অনুধাবন করে ভারতীয় পরম্পরার ধাঁচে তিনি

ঝকঝকে মুক্তোর মতো নিটোল কথকতা তুলে এনেছেন শিশুচিত্তকে আকৃষ্ট করতে। তাঁর নিজের কথাতেই বলি, *সন্ধ্যার সময় শিশুরা যখন আহার না করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িতে চায়, তখন পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের স্নেহরূপিনী মহিলাগণ এই গল্পগুলি বলিয়া তাহাদের জাগাইয়া রাখেন। সেই গল্পের স্বাদ শিশুরা বড় হইয়াও ভুলিতে পারে না।* উপেন্দ্রকিশোর ছবিতে, গল্পে, টুনটুনির বইতে এমন রস পরিবেশন করেছেন যা বাংলা শিশুসাহিত্য জগতে প্রবেশের তোরণদ্বার। ঠিক যেমনি পুরাণের কথাও সেকালের কথায় গল্প বলার ঢঙে শিশুচিত্তকে উসকে দিয়েছেন। তাঁর উপলব্ধিততে ধরা পড়ে ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডের রত্নময় গচ্ছিত সম্পদ। ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিকৃত মণ্ডলে নিজেদেরকে বাঁধা রেখে আমরাই উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করতে শিখেছি। পুরাণ অর্থে পুরাতন। পুরাতন হলেও এই শ্রুতি-স্মৃতি-সংহিতা শাশ্বত, সনাতন ও চিরনতুন। আমাদের কাজ, গ্রাম্যতা, পশ্চাদপদতা ঝেড়ে পুঁছে বিজ্ঞানভাবনায় জাগর করে তোলা। শিশুর অন্তর্নিহিত প্রবণতা কাহিনি বা গল্প শোনা। আজগুবি ও গালগল্পের আঙ্গিকে রূপকের অন্তরালে আসল সত্যটির সন্ধান দেওয়া। পৃথিবী কীভাবে সৃষ্টি হল, কীভাবেই বা জগতে প্রাণের সৃষ্টি। যা ছিল সূত্রাকারে শ্লোকে, সেগুলিকে কাহিনির আঙ্গিকে পরিবেশন করে গণচেতনার উদ্‌বোধন ঘটানোই পুরাণকারের কাজ। এইখানেই উপেন্দ্রকিশোরের পটুতা। জনশিক্ষায় শিশুশিক্ষাকে রূপান্তরিত করা। উপেন্দ্রকিশোরের নিজের ভাষায় তুলে ধরছি, *"অবসরকালে পড়িয়া বালক বালিকাগণ শিক্ষা এবং আনন্দ লাভ করিবে, এই আশায় এই পুস্তকখানি লেখা হইল। বিষয়টি বৈজ্ঞানিক হলেও, সে হিসাবে তাহার কোনরূপ চর্চার চেষ্টা হয় নাই; বালক বালিকাদিগকে প্রাচীনকালের কাহিনী শুনাইবার জন্য এই পুস্তক লেখা; বিজ্ঞানের কথা বলা ইহার উদ্দেশ্য নহে।* অথচ বিজ্ঞান ভাবনার রেশ জেগে উঠবে কাহিনির ফাঁকে ফাঁকে। যা বার্ধক্য পর্যন্ত স্মৃতিতে মুখর থাকবে।" সমগ্র জীবনকে কোনো না কোনোভাবে পরিচালিত করবে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষার অধিকারী বিরল ব্যতিক্রমী জীবনকেও যে ঘরানায় উদ্ভুদ্ধ হয়ে পিতার ধারাকে পাথেয় করে ছন্দের মোড়কে বিজ্ঞানকথাকেই উসকে দিয়ে বুদ্ধিতে শান দিয়েছেন সুকুমার। ছন্দের মজার মধ্যে বুদ্ধির প্রশ্ন জাগিয়ে তুলে মনভোলানো রুমঝুমিকে, অসঙ্গতিকে কখন কোথায় কতদূরে ফেলে থুয়েছেন তা ভাববার অসবর পাবে না শিশু। যেমন—'আকাশের গায়ে যেন টকটক গন্ধ' বা 'ফুল ফোটে? তাই বল, আমি ভাবি পটকা।' প্রভৃতি। অধিক উদাহরণ দেওয়ার সুযোগ নেই এখানে।

শব্দের ঝুমঝুমিকে পেছনে ফেলে কখন নিজস্ব ভঙ্গিমায় বিশ্বাসের অন্তরমহলে বুদ্ধি ও মননে রণন তোলে। শিশুসাহিত্যে সঞ্জীবন ঘটানো, উসকে দেওয়া ও সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে 'সন্দেশ'-কে ঘিরে যে সন্দেশ পরিবেশন করা হয়েছে তা বাংলা শিশুসাহিত্য

জগতের বিশাল পাওনা। যে কাজ নির্বাচিত গণতন্ত্রের সরকার পর্যন্ত দিতে অপারগ সেই পৃষ্ঠপোষকতা নিজেদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করেও উপহার দিয়েছে রায়চৌধুরী পরিবার। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার তেমনই আকর্ষণীয় মহিমায় বাংলা সাহিত্যের ঘরানা তৈরি করছে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষা ও শিশুপাঠ্যের বই নিয়ে ঘোর সংকট, সেখানে ভারতভূমিতে বিশেষ করে এই বাংলায় শিশুসাহিত্যের খনি চর্চায় পরির্চর্যায় তা আরও অমূল্য রত্নখচিত হয়েছে বিদ্যাসাগর, উপেন্দ্রকিশোর ও রবীন্দ্রনাথের রূপোর কাঠি ও সোনার কাঠির ছোঁয়ায়। শিশুপাঠ ও বিদ্যালয় পাঠ্য বইয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা এখন অনেকটাই প্রশমিত। কিন্তু তাকে একুশ শতকের উপযোগী করে ফের গড়ে তুলতে হবে। এখন আর যৌথ পরিবার নেই। আনবিক পরিবারও ভাঙছে। দানবিক স্বজন্ম তত্ত্বের গবেষণা চলছে পশ্চিমে জিন পদ্ধতির আলোকে। বিজ্ঞানকে নামানো হচ্ছে বিভীষিকায়। সেখানে রক্ষে একমাত্র সংগঠিত উদ্যোগ, যা ভারত জুড়ে শুরু করেছে নিখিল ভারত শিশুসাহিত্য সংসদ। সরকারি প্রকল্প কেবল গজদন্ত মিনারের জন্য আঁতে ভাতে থাকা পরিবার পরিজনদের শিশু কিশোরের বিকাশের দিকে নজর কোথায়। আবার সরকারি প্রকল্প বিস্তর ব্যয় আটকে থাকে গজদন্ত মিনারে কুশীলবদের আনাচেকানাচে। প্রদীপের নীচের অন্ধকারের দিকে তার নজর দেওয়ার সময় কই? নজর দেওয়ানোর উদ্যোগইবা কোথায়? হায় বাংলা, বুড়ো আংলা বুরোক্রেটদের নিয়ন্ত্রণ করার মানুষ কই? তর্জনগর্জন না হোক, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোরদের মতো ব্যক্তিত্বই বা কই? একুশ শতকেও আমরা সকলকিছুই সহ্য করে চলেছি। স্থৈর্য, ধৈর্য, নিবিড় অনুশীলনই এখান থেকে মুক্তির উপায়। ঘরোয়া পত্রিকা কীভাবে বাংলার পত্রিকা হিসেবে শিশু-কিশোর সাহিত্যের দিগ্‌দর্শন হয়ে উঠতে পারল, তার দীর্ঘ ইতিহাস এই রায়চৌধুরী পরিবারকে ঘিরেই অনুবর্তিত হয়েছে। ভায়েদের পাশাপাশি উপেন্দ্রকিশোরের পুত্রকন্যারা কীভাবে শিশুসাহিত্যের দিগদিশারি হয়ে উঠতে পারেন তার প্রস্তুতিপর্ব উপেন্দ্রকিশোরের হাতে তৈরি। আসলে যে-কোনো মহামানবের জন্মকে ত্বরান্বিত করে সুসমঞ্জস পরিবেশ। আর সেই পরিবেশ বংশ পরম্পরায় গড়ে তুলতে হয়। উপেন্দ্রকিশোরের অবদান সেখানেই। ঘরের ইট কাঠ কংক্রিট যেমন, তেমন মন, মগজ, মনন, পাড়া, প্রতিবেশি, পরিবেশ, দশ ও দেশ সকলকিছুকেই মন্থন করে উপযোগী করে তুলতে হয় উত্তরণের পটভূমি। সেই পটভূমির উপর দাঁড়িয়ে নিয়ত চর্চা চেতনায় পারঙ্গম পরিবার হয়ে ওঠে আবিভাবের লগ্ন। উপেন্দ্রকিশোরের চার পুত্র, তিন কন্যাই জন্মগত অধিকারের নিবিড় পরিচর্যায় 'সন্দেশে'-র জমিতে ফলালেন সোনার ফসল। অমৃতি ওষধি হিসেবে উঠে এল সুকুমারের সাহিত্য। অথচ পরিবারের প্রত্যেকেই কলমের চাষ করে বহুস্রাবী শিশু-কিশোর সাহিত্য উপহার দিয়েছেন। বড়ো মেয়ে

সুখলতা নিজের আঁকা ছবিতে গল্প, কবিতা, রূপকথা রঙে রসে রাঙিয়ে তুলতেন। অধ্যাবসায় ও অনুশীলনে উপহার দিয়েছেন 'নিজে লেখ', 'নিজে পড়', 'পড়াশুনা'-র মতো শিশুদের হাতেখড়ির বই। বোন পুণ্যলতাও কম যান নি ঃ 'ছেলেবেলার দিনগুলি' লিখে অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন শিশু-কিশোর সাহিত্যে। বোন শান্তিলতা ছড়া ও গদ্যের চর্চা করেছিলেন। তাঁর অনন্য সৃষ্টি, 'ওগো রাঁধুনি শোন গো শোন'; নির্ভেজাল ছড়া। কিন্তু রচনা নৈপুণ্যে, বিষয়ের অভিনবতায় আজও জনপ্রিয়।

এই পরিবারের অনন্য প্রতিভাধর মহামানব সুকুমার। শিশু-কিশোর সাহিত্যের রূপরেখা যে কোন অসামান্য উচ্চতায় পৌঁছোতে পারে, পরিবেশনের গুণে, বিষয়ের গভীরতায়, চিরনতুনের আঙরাখায় সমাজকে শাসন, সংমার্জন করতে পারে, তার অনন্য সৃষ্টি সেই 'আবোল তাবোল'। যদিও 'সন্দেশ' সম্পাদনার সূত্রেই, পত্রিকাকে অভিনবত্ব দান করার নিরিখেই তাঁর শিশুসাহিত্য জগতে পা রাখা। অঙ্কন, মুদ্রন শিক্ষা সমাপ্ত করে কী অপরূপ তাঁর ছন্দ সৃষ্টি! ছন্দের সঙ্গে বিষয় নির্বাচন, বিষয়ের সঙ্গে অঙ্কন পটুতা, সর্বোপরি মুদ্রন পারিপাট্য যে কোন উচ্চতায় বাঁধা যেতে পারে, তা যেন সহজ সাবলীল পরিকাঠামোয় উত্তীর্ণ হতে পারে, তা তিনি নিজে হাতেকলমে প্রমাণ করেছেন। গুরুগম্ভীর বিষয়কে হাস্যরসের চটুতলায় নাবালক-সাবালক-চিরবালকের পাঠ্য হিসেবে রসের ভিয়েনে চির আধুনিক করা যায় তা তাঁর মন মগজ ও মননের পরীক্ষানিরীক্ষায় রূপায়ণ করেছেন। কী নেই সেখানে! নাটক, বিজ্ঞান, আবিষ্কারের কথা, রোমাঞ্চ, রহস্য, গল্প, গান, সৃজন ও অনুবাদে পিতৃপ্রতিষ্ঠিত 'সন্দেশ'কে গবেষকের কঠোর অনুধ্যানে শিশু-কিশোর সাহিত্যের মুখপত্র হিসেবে পরিপূর্ণতার শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন নিজের সৃষ্টি ও নির্মাণ কর্ম দিয়ে। সুকুমারের অকাল প্রয়াণে 'সন্দেশ' বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বছর পাঁচেক। পরের ভাই সুবিনয় তখন হাল ধরেন। বিজ্ঞানমনস্ক সুবিমলের বিশেষ অবদান, পিতা উপেন্দ্রকিশোরও দাদা সুকুমারের আরব্ধ কর্ম বাঁধাকে শিশু-কিশোর সাহিত্যে অনন্য মহিমায় মণ্ডিত করেছিলেন। শব্দ ও ছবি দিয়ে যে ধাঁধাকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, তা তিনি প্রমাণ করেছেন। 'বল তো'? বলে তাঁর ধাঁধার বইটি আজও অনন্য। তাঁর অন্যান্য বইগুলি হল, 'খেয়াল', 'রকমারি', 'জীবজগতের আজব কথা', 'কাড়াকাড়ি' ও 'আজব বই'। প্রমদারঞ্জনের কন্যা লীলা মজুমদার বংশগত সূত্র ধরেই শিশু-কিশোর সাহিত্যের ঘরানায় ছোটোদের ও বড়োদের সেরা লিখিয়ে। নারীজীবনের আজব কথা তাঁর কলমে অমর কথাশিল্প হয়ে উঠেছে। উপেন্দ্রকিশোরের আর এক ভাই নরেন্দ্রকিশোরের চতুর্থ সন্তান হিতেন্দ্রকিশোর শিশু-কিশোর সাহিত্যে বিশেষ অবদান রেখেছেন কিশোর নাট্যসাহিত্যে। আর জীবনের শেষ প্রান্তে লিখেছিলেন স্মৃতিকথা 'উপেন্দ্রকিশোর ও মসুয়া রায় পরিবারের গল্পসল্প'। রায়চৌধুরী পরিবারকে বিশেষভাবে

সমৃদ্ধ করলেন সুকুমারের পুত্র সত্যজিৎ। সৃজনী সাহিত্যকে যে সেলুলয়েডের পারিপাট্যে বিশ্ববন্দিত করা যায়, তা তাঁরই পক্ষে সম্ভব হয়েছে। জীবনের প্রথম ভাগে তাঁর লেখার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। শান্তিনিকেতন পর্বে ইংরেজি গল্প প্রবন্ধ লিখলেও তা ছিল অকিঞ্চিৎকর, পারিবারিক পরমম্পরায়। কিন্তু চলচ্চিত্রে আগ্রহ জন্মাবার পর তাঁর জীবনের চাকা অভিনব বলয়স্পর্শী হয়। পরিবারের পরম্পরা তাঁকে আস্তব্যস্ত করে তোলে। 'সন্দেশ' পুনর্প্রকাণের ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে শিশু-কিশোর সাহিত্যে তাঁর দিগন্ত উন্মোচিত হয়। 'সন্দেশ' ভরাতেই যাঁর শুরু, তা অনন্য মাত্রায় ফেলুদা-তপসে-জটায়ুর হাত ধরে আজ তাঁর ৩৩টি ফেলুদা কাহিনি, ৩৮টি শঙ্কু, ৭০ অধিক গল্প, চলচ্চিত্র নিয়ে দুটি বই ছড়া ছবি অনুবাদের বাইরে তাঁর পরিক্রমা সাফল্যের চূড়ান্ত ধাপে। পুণ্যলতার দুই সন্তান কল্যাণী ও নলিনী। দু-একটি শিশু-কিশোর গ্রন্থ আলোচনা ছাড়া কল্যাণীর অবদান তেমন কিছু ছিল না। নলিনী কিন্তু 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীতে সম্পাদনার কাজ দীর্ঘদিন করেছেন। চার স্কুলছাত্রীকে ঘিরে তাঁর রহস্য রোমাঞ্চমূলক কাহিনিটি বেশ জমাটি। পারিবারিক ঘরানাকে বয়ে নিয়ে চলেছেন সত্যজিৎ-পুত্র সন্দীপ। রায়চৌধুরী পরিবার বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যসাধনায় আজও সমান পারদর্শী। যেমন ভাবে একসময় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবার 'বালক' পত্রিকার মাধ্যমে শিশু- কিশোর-কিশোরীদের মানসিক জগতকে নানাভাবে জাগিয়ে তোলার জন্য সচেতন প্রচেষ্টা করেছিলেন। যে অনুকূল পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ একজন সূক্ষ্ম সংবেদনশীল অনুভূতিপ্রবণ বালক ক্রমে ক্রমে বাল্মীকি প্রতিভায় উন্মেষিত হয়েছিলেন। এই দুই পরিবার বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যকে লালন পালনের ঘরানায় মঞ্জরিত সকাল উপহার দিয়েছিলেন।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর টুনটুনির বই ঃ এক বিজিতের গল্পপাঠ

মেহেবুব হোসেন

বিজাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষজন যখন উনিশ শতকের প্রথম দিকে ভারতবর্ষে আসতে শুরু করেন তখন ভারতবাসীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল বিজয়ী ও বিজিতের সম্পর্ক। তাঁরা প্রায় সকলেই চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের উপর প্রশাসনিক প্রভাব বিস্তার করতে উপযোগবাদীনীতির সান্নিধ্যে। একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষের মনের গতিকে করে তুলতে চেয়েছিলেন একমুখী, যাতে তাদের এবং পরোক্ষে সাধারণ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে সুবিধা হয়। উনিশ শতকের দীর্ঘ সময় জুড়ে ভারতবর্ষে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠা করা হয়; সেগুলির প্রায় সবকটিরই উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনিক কাজের উপযুক্ত কর্মচারী গড়ে তোলা। এই প্রতিষ্ঠানগুলির হাত ধরে বাংলার লোকসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্র উর্বর ও প্রশস্ত হল।

উইলিয়াম মর্টন, মার্শম্যন, উইলিয়ম কেরী, রেভারেণ্ড লঙ, গ্রীয়ার্সন, জি. এইচ. ড্যামান্ট এডওয়ার্ড ডেল্টন প্রমুখেরা বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার অগ্রপথিক। তাঁদের অনুসারী হিসেবে একদল এদেশীয় অনুরাগী পেলাম—উমেশচন্দ্র দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ, যাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অথচ দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। একদিকে এঁরা দেশীয় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার করলেন অপরদিকে নির্মাণ করলেন বাংলাদেশের লোকসাহিত্য চর্চার ব্যক্তিক উদ্যোগ। পূর্বতনদের এই উদ্যোগ পরবর্তীকালে দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার বা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন 'ঠাকুমার ঝুলি' বা 'টুনটুনির বইয়ের মতো গ্রন্থরচনায়। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র', গোলোক নাথ শর্মার হিতোপদেশ, তারিণীচরণ মিত্রের 'ঈশপের গল্প', চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস' ইত্যাদি গ্রন্থে লোককথার বাংলা নন্দনতত্ত্বের স্বর জেগে উঠল, তার সুর নিবিড়তর হল উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীদের কলমের আঁচড়ে। বয়স্ক মনের গহনে ঘুমিয়ে থাকা শিশুটিকে জাগিয়ে দেবার ক্ষমতা যিনি রাখেন, যিনি মানবিক মূল্যবোধের নীতিকথা রূপকথা উপকথার আদলে ঔপনিবেশিক ভারতের পাঠককে কি শোনান তিনি অবশ্যই উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫) ওরফে কামদা রঞ্জন রায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন তার জন্ম ও বড় হয়ে ওঠা সে সময় বাংলা শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব প্রবহমান। সেই উনিশ

শতকীয় সমাজ উপেন্দ্রকিশোরকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলা শিশু সাহিত্য সম্পর্কে উদাসীনতা তাঁকে ব্যথিত করেছিল। সেই যন্ত্রণা থেকেই তিনি চেয়েছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বহন করে নতুন প্রজন্মের কাছে বিশেষভাবে প্রেরণ করতে। বিজ্ঞান মনস্ক হলেও তিনি চাইতেন শিশুরা জানুক তাদের সংস্কৃতিকে। শুধুমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষা নয়, শিশুকে সম্পূর্ণভাবে গড়ে তুলতে গেলে তাকে তার শিকড় সম্পর্কে, নিজের দেশ, জাতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগত করে তুলতে হবে। 'টুনটুনির বই' 'গল্পমালা', 'পুরাণের গল্প' 'ছেলেদের রামায়ণ' রচনার মধ্যে প্রাচ্যতত্ত্বচর্চার যে অনুষঙ্গ প্রদর্শিত হয় তা প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, মহেন্দ্রনাথ সরকার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের ভারতবিদ্যাচর্চার গল্পরূপেই অনাবৃত হয়।

পুরাণের কাহিনি, মহাকাব্যের কাহিনিকে স্বল্প পরিসরে সহজ বাংলায় অপূর্ব নাটকীয়তায় রস উপভোগ্য করে বাংলা সাহিত্যকে উপেন্দ্রকিশোরে মতো খুব কম লেখকই শিশু কিশোরদের জন্য উন্মুক্ত করতে পেরেছিলেন, প্রতিটি গল্পের সাথে বিষয় সাদৃশ্যে ছবির সংযোজন স্বতন্ত্রতা এনে দিয়েছে। ঠাকুমা-দিদিমাদের মুখ নিংসৃত প্রচলিত রূপকথা, কল্পকাহিনি লোককাহিনকে এক সুন্দর নাটকীয়তার ছোট ছোট গল্পের কথকথায় লোভনীয় রসনায় পরিবেশন করেছেন যা আজও শিশুদের মনকে আবিষ্ট করে, মুগ্ধ করে হৃদয়। একই সঙ্গে গল্পের খোলসের অন্দরে থাকে উনিশ-বিশ শতকের বিজিত জাতির পরাধীনতার যন্ত্রণা, নানান সামাজিক-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত। বাংলা ছোটগল্প-উপন্যাসের কার্ণিভাল দ্বিবাচনিকতার প্রত্নভূমিতে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী উনিশ-বিশের ক্রনেটিপকে রূপকথার গল্পের আদলে নির্মাণ করলেন। তাই শিশুপাঠ্য 'টুনটুনির বই' গল্পটি সকলের জন্য সহজপাঠ্য থাকে না। বরং 'বাংলার নবচেতনার ইতিহাস' এর পরিপূরক হয়ে ওঠে। টুনটুনি পাখি নিয়ে অনেকেই গল্প লিখেছেন। সেই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রবোধচন্দ্রিকায় শুরু। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীতে বহুল প্রচারিত হল। ছোটোদের রামায়ণ, মহাভারতকার হিসেবে তাকে যতটা না পাঠক জেনেছে তার চেয়ে অনেক বেশি করে চিনেছে 'টুনটুনির বই' এর গ্রন্থকার নামে, উপকথা, নীতিকথার প্রচ্ছন্নতা থাকলেও, রূপকথার অঙ্গসজ্জা ব্যবহৃত হলেও কোথাও সমকালীনতাকে অস্বীকার করা হয়নি। রাজা, বিড়াল, শিয়াল, নাপিত, টুনটুনির কাহিনীর হাত ধরে ঔপনিবেশিক বাংলার অর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিমণ্ডল অসাবধানতাবশত আমরা জেনে যাই, শিখে নিই বিজিতের ভাষা ও ব্যথা। উপেন্দ্রকিশোর রচনাসমগ্র দ্বিতীয়খণ্ডে (কামিনীপ্রকাশলয়) 'টুনটুনির বই' সিরিজে মোট সাতাশটা গল্প পাচ্ছি। এর মধ্যে পঁচিশটি গল্পে বিজিতের যন্ত্রণা ও স্বপ্নের সুর অনুরনিত হয়েছে।

১। টুনটুনি আর বিড়ালের কথা — আধিপত্য ও ক্ষমতাশালী বিড়ালের টুনটুনির

ছানা খাওয়ার স্বপ্ন নস্যাৎ হচ্ছে। বিনিময়ে বেগুনের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। অর্থাৎ বিজিতের জয় হয়েছে। মহারাণীর সম্মান ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে সামান্যতম টুনটুনির কাছে।

২। টুনটুনির আর নাপিতের কথা— টুনটুনি জীব সমাজে নগন্য বলে নাপিত তার ফোঁড়া ফাটাতে অস্বীকার করলেও শেষে রাজার আদেশে ফোঁড়া কাটতে বাধ্য হয়েছে। নিম্নবর্গের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও সম্মান প্রাপ্তির অনুসঙ্গ এখানে স্বীকৃতি পেয়েছে। তাছাড়া হাতুড়ে অস্ত্রাপচার ব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষ এবং পরিণামে পরবর্তীকালে ১৮৩৫ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

৩। টুনটুনি আর রাজার কথা— রাজা ঈর্ষা কাতর হয়ে ক্ষমতার দর্পে টুনটুনিকে শায়েস্থা করতে গিয়ে নিজের নাক কেটেছে। অর্থাৎ সমাজপতি রাষ্ট্রনেতার সম্মানহানি নিম্নশ্রেণীর হাতে।

৪। নরহরিদাস— ধূর্ত ছাগলছানার কাছে শিয়াল ও বাঘের শাস্তি পাওয়া। জ্ঞানীর কাছে নির্বোধ সবলের দণ্ডপ্রাপ্তি। বনের রাজার পরাজয় সামান্য ছাগলছানার ফন্দিতে।

৫। বাঘ মামা আর শিয়াল ভাগ্নে—ধূর্ত ভাগ্নে শিয়াল ক্ষমতাগর্বী বাঘ মামাকে শাস্তি দিতে কুমিরকে দিয়ে খাওয়ায়। ক্ষমতালোভীর পরাজয়, শিক্ষিত, জ্ঞানীর জয়।

৬। বোকা জোলা আর শিয়ালের কথা —দরিদ্রবোকা জোলাকে রাজা সাজিয়ে রাজার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া এবং পরবর্তী পর্বে ঐ রাজ্যের রাজা হওয়ায়। যা কিছু সম্ভব হয়েছে ধূর্ত শিয়ালের ফন্দিতে। অর্থাৎ সমাজপতি রাজাকে বোকা বানানো। সাধারণ মানুষের রাজা হওয়ার স্বপ্নপূরণের কাহিনিতে বিজিতের আবার বিজয়ী পদে উন্নীত হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

৭। কুঁজো বুড়ির কথা— কুঁজো বুড়িকে রাস্তায় বাঘ, ভাল্লুক, শিয়াল হুমকি দিলেও শেষে মেয়ের বুদ্ধির জোরে কুমড়োর ভিতর ঢুকে গড় গড়িয়ে ঘরে ফেরে আর পোষা কুকুরের আক্রমণে শিয়ালকে মারে। দুর্বল হলেও ঐক্যের মন্ত্রে কৌশলে শত্রু-দমন নীতি লক্ষ্যণীয়।

৮। উকুনে বুড়ির কথা—সাধারণ জন থেকে রাজামশাই পিঁড়িতে আটকে গেলে একজন নাপিত এসে ছুতোর ডেকে পিঁড়ি কেটে রাজাকে মুক্ত করে। শ্রমজীবী নিম্নবর্গের সহযোগিতার উচ্চবর্গের ধনপ্রাণলাভ-যা আজীবন চলে আসছে।

৯। পান্তা বুড়ির কথা— সকলের ঐক্যের বিনিময়ে, সহযোগিতায় বিনিময়ে চোরের শাস্তি প্রদানের কাহিনী এখানে আছে। শ্রমজীবী মানুষের ঔপনিবেশিক সমাজের মানুষ নিজেদেরে ঐক্যের বিনিময়ে অন্যায় অব্যবস্থার অবসান ঘটাতে পারে তারই ইঙ্গিত।

১০। চড়াই আর কাকের কথা—নাগরিক মননের নিষ্ঠুরতার ছবি এখানে আছে। নির্বোধ দুষ্ট কাক চড়াইয়ের বুকের মাংস খেতে গিয়ে নিজেই আগুনে ভস্ম হয়ে গেছে।

১১। চড়াই আর বাঘের কথা—চড়াই আর চড়ানীর বাঘের সাহায্যে পিঠে খাওয়া অথচ বোকা বাঘকে পচা পিঠে খাওয়ানো, উচ্চশ্রেণিকে, ক্ষমতাশীলকে হেয় করা হয়েছে সাধারণের হাতে।

১২। দুষ্টু বাঘ—খাঁচাবন্দী বাঘ মুক্তির প্রার্থনা করলে এক ব্রাহ্মণ ঠাকুর তাকে মুক্তি দিলে যে তাকে খেতে উদ্যত হলে জ্ঞানী শেয়াল কৌশলে বাঘকে আবার খাঁচা বন্দী করে উচিত শিক্ষা দেয়। উপকারীর অপকার হেতু অকৃতজ্ঞের শাস্তি প্রদান। এহেন ব্যবসায় সুযোগ নিয়ে রাজা হওয়ার কাহিনি।

১৩। বাঘবর—ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গে বাঘের বিয়ের আশা নির্বাপিত হয়েছে গ্রামবাসীদের ফাঁদে পড়ে কুয়ো বন্দী হয়ে। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে বঙ্কিম যেমন ফস্টরের শৈবালিনী সঙ্গলাভের আশা নির্মূল করেন ফস্টরের শাস্তিপ্রদানে। সমকালের শ্বেতাঙ্গ সাহেবদের এদেশীয় নারীর প্রতি আসক্তিপ্রদান বিনিময়ে শাস্তি পাওয়ার অনুষঙ্গে তাদের প্রতি বিদ্রুপের ইঙ্গিত আছে।

১৪। বাঘের উপর টাগ—বাঘ জোলাকে টাগ ভেবে পুজো করা। দুর্বলের কাছে সবলের পরাজয়।

১৫। বাঘের পালকি চড়া—এখানে শিয়ালের ধূর্তামির কাছে বাঘের পরাজয় হয়েছে। বিয়ের নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে গ্রামবাসীদের সম্মিলিত আক্রমণে বাঘ নিহত হয়েছে। সবলের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গের ইঙ্গিত প্রদর্শিত হয়েছে।

১৬। বুদ্ধর বাপ—বুড়ো চাষী বুদ্ধের বাপের হাতে বাঘ বারবার নিগৃহীত হয়েছে। দুর্বলের জয় দেখানো হয়েছে। উচ্চবিত্তের বারবার পরাজয় হয়েছে।

১৭। বোকা বাঘ—ধূর্ত শিয়ালের কাছে বোকা বাঘের নিগ্রহের পৌণঃপুনিকতা এখানে লক্ষ্যণীয়।

১৮। বাঘের রাধুনি—বাঘের পরাজয় দেখানো হয়েছে সাধারণ মানুষের হাতে।

১৯। বোকা কুমিরের কথা—বোকা কুমির চাষের ফসল ঘরে তুলতে পারেনি জ্ঞানী শিয়ালের চালাকিতে। সবলের পরাজয়, দুর্বলের জয় হয়েছে।

২০। শিয়াল পণ্ডিত—বোকা কুমির তার ছানাগুলোকে চালাক, জ্ঞানী করার অভিপ্রায়ে শিয়ালের আশ্রয়ে রাখলে তারা খাদ্য হয়ে যায়। ঔপনিবেশিক শিক্ষা কতটা ভারতবাসীর পক্ষে গ্রহণীয় এ যেন সে প্রশ্নের গল্পকথা।

২১। সাক্ষী শিয়াল— সওদাগরের ঘোড়া চোর চুরি করলে শিয়াল সওদাগরের ঘোড়া ফিরিয়ে দেয় রাজার কাছে সাক্ষ্য দিয়ে। এখানে রাজা বিচারক হলেও নির্বোধ

হিসেবে দেখানো হয়েছে।

২২। বাঘ খেকো শিয়ালের ছানা—শিয়ালের বুদ্ধির কাছে বাঘের পরাজয় হয়েছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কাছে সমাজপতির পরাজয়।

২৩। আখের ফল—শিয়াল পণ্ডিত হলেও এখানে যে আখের ফল খেতে গিয়ে নির্বোধের মতো ভিমরুলের কামড় খেয়েছে। শিক্ষিত জাতির আহাম্মকি চালে সে নিজেই নিগৃহীত হয়েছে।

২৪। হাতির ভিতরে শিয়াল—মরা হাতির মাংস খেতে গিয়ে হাতির পেটের ভিতরে প্রবেশ করে ধূর্ত শিয়ালের প্রস্থানের কাহিনী। লোভের করুণ পরিণতি ও তা থেকে নিস্তারের অনুষঙ্গ এখানে পাচ্ছি। লোভ ও ভোগের উনিশ শতকীয় অবক্ষয়ের ছবি।

২৫। মজতালী সরকার— গোয়ালার বিড়াল আর জেলেদের বিড়ালের বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতা দিয়ে সূত্রপাত। জেলেদের বিড়ালের ফাঁদে পড়ে গোয়ালার বিড়ালের অপমৃত্যু, তারপর গোয়ালার বাড়িতে দুধু-ঘি খেয়ে 'মজতালী সরকার' হয়ে ওঠা আর বাঘ বাঘিনীদের কাছে খাজনা চাওয়া। কোথাও যেন উনিশ শতকের হঠাৎ বাবুদের গজিয়ে ওঠা কাহিনিকে উপকথার আদলে সাজালেন লেখক। নব্য জমিদারদে বণিকগিরির অর্থে সূর্যাস্ত আইনে জমির নতুন মালিক হয়ে ওঠা, অপরদিকে পুরাতন জমিদাররা তাদের শ্রী ও অর্থ হারিয়ে সমাজে ক্ষয়িষ্ণু শক্তিতে পরিণত হয়। ইংরেজ শক্তির সহায়ক আঞ্চলিক প্রশাসক হিসেবে এই সব বণিক জমিদারশ্রেণী তখন কলকাতার আখড়াই হাফ আখড়াই তালে মজে কলকাতার আদিমতা আবিষ্কারে মগ্ন। সাধারণ মধ্যবিত্তের শিক্ষিতকরণে তারা সরকারী কর্মচারীর পদ গ্রহণে সমাজের প্রথমশ্রেণির পদ দ্রুত পূরণ করলে হঠাৎ বাবুদের দর্প ক্ষয়িষ্ণু হতে থাকে। মজতালী সরকারদের শক্তিমত্তা হ্রাস পায়।

'অরিয়েন্টালিজম' (১৯৭৮) গ্রন্থে এডওয়ার্ড সাঈদ জ্ঞানের সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখিয়েছেন পশ্চিমের জ্ঞান কিভাবে পশ্চিমের ক্ষমতা তৈরি করে, সেই ক্ষমতা কিভাবে উপনিবেশ বানায়, সেই উপনিবেশ কিভাবে একটা বৈধ সম্প্রসারণবাদে বদলে যায়। প্রাচ্যকে প্রাচ্যের মতো জানলে চলবে না, প্রাচ্যকে পাঠ করতে হবে পশ্চিমের চোখে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে 'অরিয়েন্টালিজম' একটা বিশুদ্ধ জ্ঞানপ্রকল্প মাত্র। কিন্তু সাঈদে দেখান 'অরিয়েন্টালিজমের বিদ্যাচর্চার আড়ালে বিচিত্র ও নিগূঢ় প্রক্রিয়ায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রশক্তির প্ররোচনা ও সহিংস সাম্রাজ্যবাদ অসামান্য চাতুর্যে বিস্ফোরিত। অরিয়েন্টালিষ্ট বিশেষজ্ঞেরা সবসময় সচেতনভাবে সম্প্রসারণবাদের পক্ষে কাজ করেননি। কিন্তু জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে তাদের প্রাচ্যচর্চা, পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান

উপনিবেশ-নির্মাণের পথ সুগম করেছে। শ্রীরামপুর মিশন, ফোর্টউইলিয়াম কলেজ, এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠালগ্নে এই উদ্দেশ্যকল্প লগ্ন ছিল। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তাঁর প্রাচ্যতত্ত্বচর্চার মধ্যে এই অভিসন্ধিকে ভাঙতে চেয়েছেন। কেবল সুদূর অতীত নয় বরং সমকালীনতা তার সমস্যা ও দ্বন্দ্ব তাঁর উপকথার গল্পে স্থান পায়। সমাজের ক্ষমতাধরের পরাজয় ঘটে। খেটে খাওয়া মানুষ, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষের জয় আসে। তাঁর 'টুনটুনির বই' 'গল্পমালাটি কোথাও যেন প্রতিস্পর্ধী বিকল্প ভারততত্ত্বের সন্ধান দেয়। যা বিজিতের বন্ধনমুক্তির স্বপ্ন দিয়ে গড়া। টুনটুনিরই প্রসঙ্গে আরেকটি গ্রন্থের কথা মনে আসে ফ্রান্যস ফ্যানোঁর জগতের হতভাগ্য (১৯৬১)—পুরাণের বিভিন্ন চরিত্র, মুখ্যত আদল এই টেক্সটে ব্যবহার করে গণমানুষের বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতার ছবি এঁকেছেন লেখক। ফ্যানোঁ পৌরাণিক মুখ এনেছেন তার লেখায়, লেখক মনে করেন পুরাণের মুখচ্ছদ ছাড়া আলজিরিয়ার ঔপনিবেশিক মুহূর্ত কিছুতেই ধরা যায় না। ফ্যাঁনো জানেন নেটিভরা ক্ষমতাটা বোঝে, বোঝে আর হাসে, তারা বোঝে তারা জন্তু নয়, তারা মানুষ। যখন বোঝে তখন তার হাতে উঠে আসে অস্ত্র। 'টুনটুনির বই' উপকথা মূলক গল্পে মানুষ, মনুষ্যতের প্রাণীর মুখাবয়বে নেটিভদের অস্তিত্ব রক্ষা, প্রাণে বেঁচে থাকার সংগ্রামের ইতিবৃত্ত হাস্যরসের আধারে পরিবেশিত হয়েছে। টুনটুনি, চড়াই, ছাগল ছানা, ব্রাহ্মণ ঠাকুর, জোলা, বুদ্ধুর বাপ, বোকা কুমির নেটিভ সমাজের প্রতিনিধি, অপরদিকে 'মজতালী সরকার' নামক গোয়ালাদের বিড়াল, বোকা বাঘ, শিয়াল পণ্ডিত, দুষ্টু বাঘ, রাজা আধিপত্যকামী সমাজের প্রতিনিধি, শাসকযন্ত্রের অধিপতি। তাদের ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্কের টানাপোড়েন শৈশবদ্রবীভূত কথনস্বরে শোনালেন পাঠককে। তবে অস্ত্র নয়, বৌদ্ধিক ফন্দির মারে তথাকথিত বিজয়ীর পরাজয় হয়েছে বিজিতের কাছে। ক্ষমতাবানদের আশ্চর্য পরিণতি দেখে বিজিত পাঠকরা আগামী মুক্তির স্বপ্নে উপকথারগল্পে আস্থা রাখে আর সরস আকুলতায় আবিষ্ট হয়।

গ্রন্থঋণ ঃ

১। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র দ্বিতীয়খণ্ড। কামিনী প্রকাশনালয়।

২। পারভেজ হোসেন। মিশেল ফুকো পাঠ ও বিবেচনা। সংবেদপ্রকাশনা। ঢাকা।

৩। সালাহউদ্দীন আইয়ুব। সংস্কৃতির জিজ্ঞাসা। বাংলা একাদেমী। ঢাকা।

৪। শোভনা ঘোষ, প্রদীপ বৈদ্য, রিজওয়ানা নাসিরা। অনালোকিত উপেন্দ্রকিশোর ষাটশতবর্ষের আলোয়। রিডাস সার্ভিস। কল-৭৫

৫। সত্যজিৎ বসু। স্বপ্নকল্পক। ১ বর্ষ ২য় সংখ্যা। সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০১২।

উপেন্দ্রকিশোরের ছেলেদের মহাভারত

সুবিমল মিশ্র

ছোটোদের জন্য মহাভারত কাহিনি পরিবেশনে সম্ভবত প্রথম উদ্যোগী হন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১)। তাঁর ঋজুপাঠ (৩য় ভাগ, ১৮৫১) বইতে হিতোপদেশ, বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাভারতের অংশ বিশেষ সংস্কৃত থেকে অনূদিত হয়েছে। অবশ্য এটি কোনো গল্পের বই নয়, পাঠ্য। বই এবং এর ভাষাও সংস্কৃত ঘেঁষা।

মহাভারতের মূল কাহিনি কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ ছাড়াও এতে নল-দময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবান, ধ্রুব, একলব্য, শকুন্তলা-দুষ্মন্ত প্রভৃতি বহু উপকাহিনি আছে। এসব কাহিনির অনুবাদের পথিকৃৎ আমাদের বিদ্যাসাগর মশাই। তাঁর 'শকুন্তলা' (১৮৫৪) প্রথম বাংলা রূপান্তর। আবার ছোটোদের জন্য সরস করে এ কাহিনি পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর শকুন্তলা (১৮৯৫) বইয়ে। অবন ঠাকুর লিখেছেন—"সেই বালকের আমলের একদল আমরা বড়ো হয়ে আর এক দফা বাল্য গ্রন্থাবলী লিখতে শুরু করে দিলুম। রবিকা লিখলেন নদী, আমি ক্ষীরের পুতুল, শকুন্তলা, রাজকাহিনী এই সব লেখা চলল। সেজ মা লিখলেন সেই সময় ছেলেদের জন্য সাতভাই চম্পা, টাক ডুমাডুম এই সব বই।" এই শকুন্তলা প্রকাশিত হল কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে। অপরূপ তার ভাষা। তিনি কাহিনিটি শেষ করেছেন এভাবে—"তারপর কি হল? দুঃখের নিশিপ্রভাত হল মাধবীর পাতায় পাতায় ফুল ফুটল, নিকুঞ্জের গাছে গাছে পাখী ডাকল, সখীদের পোষা হরিণ কাছে এল। আর কি হল? বন পথে রাজবর কুঞ্জে এল।.....পৃথিবীর রাজা আর বনের শকুন্তলা—দুজনে মালা বদল হল। দুই সখীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।" এই ভাষার রেশ এতদিন পরেও আমাদের শিহরণ জাগায়।

এর মধ্যে ১৮৮৩ এর জানুয়ারিতে ব্রাহ্মযুবক প্রমদাচরণ সেনের সম্পাদনায় 'সখা' মাসিক পত্রিকার প্রকাশ ঘটল। পত্রিকাটি চলেছিল প্রায় বারো বছর। শেষ সংখ্যা বোরোয় ১৮৯৪ এর মার্চ মাসে। এই পত্রিকায় বিভিন্ন সংখ্যায় মহাভারতের গল্প প্রকাশিত হয়েছে।

যেমন ভুবন মোহন রায় 'মহাভারতের গল্প' লিখেছেন ১৮৮৭ র মার্চ এবং ১৮৮৯র এপ্রিল সংখ্যায়, গগনচন্দ্র হোম লিখেছেন 'মহাভারতের গল্প' (শ্রীবৎস উপাখ্যান, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর ১৮৯০ সংখ্যায়, অম্বিকাচরণ সেন লিখলেন 'রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প' নভেম্বর ১৮৯১ সংখ্যায়। এছাড়া 'সাথী' পত্রিকায় প্রথম সংখ্যায় অর্থাৎ ১৩০০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় পণ্ডিত তারা কুমার কবিরত্ন লিখেছেন

'মহাভারতের গল্প' (উঞ্ছবৃত্তি-তাপস পরিবারের কথা)। এরপর 'সখা ও সাথী' পত্রিকার সম্পাদক ভুবনমোহন রায় লেখেন মহাভারতের কথা (ভাদ্র ১৩০১ অর্থাৎ ১৮৯৪ সালে)।

এরপর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'মুকুল' আষাঢ় ১৩০২তে অর্থাৎ জুলাই ১৮৯৫ তে। এই পত্রিকায় নিয়মিতভাবে মহাভারতের নানা কাহিনি লিখেছেন লাবণ্যপ্রভা বসু। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কর্ণ, কচ ও দেবযানী (১৮৯৬তে)। আবার প্রিয়ম্বদা দেবী লিখেছেন 'বিনতার শাপমোচন', উতঙ্কের এর (১৯০০), ১৯০১-এ আবার লাবণ্য প্রভা লিখলেন 'একলব্যের তমস্যা' 'রুরু ও প্রমদ্বরা', (১৯০১), 'ভীষ্ম ও অম্বা', 'ভীষ্ম ও শিখণ্ডী,' নল ও দময়ন্তী' প্রভৃতি আখ্যান (১৯০২)।

ঢাকা ফরিদপুর অঞ্চল থেকে বেশ কটি মহাভারতের কাহিনি প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন কালীপ্রসন্ন সরকারের শিশু অথবা সংক্ষিপ্ত মহাভারত' ফরিদপুর থেকে সঞ্জয় যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। এছাড়া ঢাকা থেকে গুরুবন্ধু ভট্টাচার্যের 'মহাভারতের কথা' (সিটি লাইব্রেরি ঢাকা ১৯১৫), পরেশ নাথ মহলানবিশের মহাভারতের কথা (সন্তোষ লাইব্রেরি, ঢাকা, ৪র্থ সংস্করণ ১৯২৬) এবং নিশিকান্ত চক্রবর্তীর সরল মহাভারত '(ঢাকা ১৯২৫)।

ইতিমধ্যে বাংলা শিশুসাহিত্যে নবযুগের সূচনা হল। এলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫), এবং যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬-১৯৩৭)। উপেন্দ্রকিশোর বরাবরই রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ কাহিনির ভক্ত ও সে সব কাহিনি তিনি পরিবেশন করলেন একেবারে শিশু কিশোরদের মতো করেই। শিশু কিশোরদের জন্য উপেন্দ্রকিশোরের বহু রচনা থাকলেও সহজ সরল ভাষায় প্রকাশিত রামায়ণ ও মহাভারত আমাদের খুব বেশি নাড়া দেয়।

ময়মনসিংহে জেলা স্কুলে পড়বার সময় সহপাঠী গগন চন্দ্র হোমের কাছে ব্রাহ্ম ধর্ম সম্পর্কে অবহিত হন। এরপর ১৮৭৯ তে সময়মন সিংহ জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বৃত্তি সহ পাশ করে কলকাতায় এফ. এ পড়তে আসেন। ভরতি হলেন প্রেসিডেন্স কলেজে। কলকাতায় এসে ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ পায়। এই সময় থেকেই তিনি নিয়মিত ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত শুরু করেন। মাঝে মাঝে উপাসনায়ও যোগ দিতেন। মাঝে মধ্যে ঠাকুরবাড়ীতে যাবার সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ হয়। এসময় রবীন্দ্রনাথের বয়স সতেরো ও উপেন্দ্রকিশোরের পনেরো। এ সময় রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবিকাহিনী' প্রকাশিত হয়েছে, 'ভারতী' পত্রিকাতেও লিখতে শুরু করেছেন। সমবয়সী দুটি তরুণের বন্ধুত্ব গড়ে উঠল।

১৩০১ বঙ্গাব্দের সাধনা পত্রিকার আশ্বিন-কার্ত্তিক সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'মেয়েলি ছড়া' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের একস্থলে তিনি শিশুপাঠ্য

গ্রন্থলেখকদের পরামর্শ দিয়েছেন,—"শিশুদের কল্যাণ যাঁহারা কামনা করেন তাঁহারা যেন কেবলমাত্র প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ভাগক্রমে বিশুদ্ধ সাধুভাষায় জ্ঞানশিক্ষা ও নীতি শিক্ষা প্রচার না করিয়া চিত্র বিচিত্র কাল্পনিক কথা ও রূপকথা সংগ্রহ ও সৃজন পূর্ব্বক শিশুদের হৃদয় সরস এবং তাহাদের শিক্ষার পর সুন্দর এবং তাহাদের জীবনারম্ভকাল নবীন উষারাগে রঞ্জিত ও ছায়ান্বিত করিয়া তোলেন।.....শিশুমতিকে এমন তরল খাদ্য দেন যাহা সে আনন্দে স্বেচ্ছা সহকারে গ্রহণ পূর্ব্বক নিজের মানসপ্রকৃতির সহিত অনায়াসে মিশ্রিত করিয়া পাইয়া তাহাকে প্রফুল্ল পরিপুষ্ট এবং বলশালী করিয়া তুলিতে পারে।"

রবীন্দ্রনাথের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছেন উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ শিশুসাহিত্যিকেরা। উপেন্দ্রকিশোরের রচনায় রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ও প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নেই।

উপেন্দ্রকিশোর যেমন রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সাহিত্যকর্মে প্রণোদিত হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ও তেমনি উৎসাহিত ও বিশেষভাবে প্রাণিত করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোরকে। উপেন্দ্রকিশোরকে নতুন নতুন সাহিত্যকর্মে উৎসাহিত করেছিলেন। 'ছেলেদের রামায়ণ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩১৪) গ্রন্থকারের নিবেদন অংশে লেখক প্রথম সংস্করণের সম্পর্কে জানিয়েছেন,—"শিশুদের উপযোগী করতে গিয়ে 'রামায়ণ-এর মূল গল্পের সৌন্দর্যহানি ঘটেছে, তাই আবার তিনি নতুন করে দ্বিতীয় সংস্করণ লেখনে এবং এ কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ রচনায় তাঁকে উৎসাহিত করেন এবং বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের পাণ্ডুলিপি ও প্রুফ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সংশোধন করে দেন।"

উপেন্দ্রকিশোরের 'ছেলেদের মহাভারত'-এর পাণ্ডুলিপিও আদ্যোপান্ত সংশোধন করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ছেলেদের মহাভারত প্রকাশিত হয় যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রতিষ্ঠিত সিটিবুক সোসাইটি থেকে। উপেন্দ্রকিশোরের আঁকা বিখ্যাত 'বলরামের দেহত্যাগ' ছবিটি এই বইতে স্থান পেয়েছিল। মহাভারতের মূল কাহিনি গ্রন্থনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সহায়তা পেয়েছিলেন।

এবারে উপেন্দ্রকিশোরের 'ছেলেদেরে মহাভারত' নিয়ে একটু আলোচনা করি।

'ছেলেদের মহাভারত' প্রকাশিত হয় ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার সিটি বুক সোসাইটি থেকে। গ্রন্থরূপে প্রকাশের আগে এটি ধারাবাহিক ভাবে 'মুকুল' পত্রিকায় ফাল্গুন ১৩১৪ থেকে আশ্বিন ১৩১৫ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল ৮টি কিস্তিতে। পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় ৮০। যখন এটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলেও পরবর্তী কালে বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নেয় লেখকের নিজের মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান ইউ. রায় অ্যান্ড সন্স। এই বইটির

তিনি শুধু লেখক নন, গ্রন্থ চিত্রী ছিলেন নিজে এবং তাঁর হাফটোন ছবির ব্লক তৈরির অন্যতম সেরা উদাহরণ এই বইটি।

প্রসঙ্গত স্মরণীয় রামানন্দ চট্টাপাধ্যায় প্রবর্তিত 'প্রদীপ' পত্রিকার ১৩০৫-এর আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় উপেন্দ্রকিশার রায়চৌধুরীর 'হাফটোন ছবি' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকার ১৩০৫-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায়' সাময়িক সাহিত্য 'বিভাগে এই 'হাফটোন ছবি' সম্পর্কে একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়। এটির আলোচক ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আলোচনার তিনি লিখেছেন, "অনেকেই হয়তো জানেন না হাফটোন লিপি সম্বন্ধে উপেন্দ্রবাবুর নিজের আবিষ্কৃত বিশেষ সংস্কৃত পদ্ধতি বিলাতের শিল্পী সমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। উপেন্দ্রবাবু স্বাভাবিক বিনয়বশতঃ তাহার প্রবন্ধের মধ্যে কোথাও এ ঘটনার আভাসমাত্র দেন নাই।" (রবিজীবনী-৪র্থ পৃঃ ২১২)

মূল বইতে ছিল রঙিন হাফটোন ছবি 'খাণ্ডবদাহন'-তার ভিতরে ছিল আটটি কে রঙা পাতা জোড়া ছবি। গুরুভাষা ব্যবহার করলেও ছোটদের জন্য তিনি সরস করেছেন একান্ত অনায়াসে। তিনি যেন কিশোর শ্রোতাদের সামনে বসে রূপকথা বলার মত করে মহাভারত পরিবেশন করেছেন। গল্প বলার সময় তিনি যেন জমাটি পরিবেশ তৈরি করে নেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে রাক্ষস খোক্কসকে ভীতিপ্রদ না করে তাদের চরিত্রকে কৌতুকময় করে তোলার জন্য তাদের মুখে অন্য ধরণের ভাষা বসিয়েছেন। যেমন হিড়িম্ব পঞ্চপাণ্ডবদের দেখে তার বোন হিড়িম্বাকে বলে—

"বাঃ। কি এ মিঠ্ঠারে গন্ধো! ও বোহিন্, ঝট করে ধোরে নিয়ে আয়! মোরা খাবো। আর পেট্‌সে ঢাক পিট্টায়কে নাচ্চবো!

.....মুহি তো তোদ্ধেরকে খাবো, ওহার্‌র্ লোকের ঘুম ভেঙ্গিবেক কেনে?" আবার বক্ রাক্ষসের বয়ানে...."মোর ভাতটি খাইছিস্; তোকে খোস ঘর পেযমাইব নি?"

"....ওরে বাপ্পো! মোরা আর কখখ্নু মান্নুস খাবোনি"

দেখা যাচ্ছে ভাষা ব্যবহারে রাক্ষসদের সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ হিসেবেই ধরে নেওয়া হয়েছে।

আদিপর্বে দুর্যোধন কর্তৃক ভীমকে গঙ্গায় নিক্ষেপ প্রসঙ্গটি উপেন্দ্রকিশোর অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রসঙ্গটি আছে মূল মহাভারতে আদি পর্বের ১২৩তম অধ্যায়ে। মূলকে বিশ্বস্ত ভাবে অনুসরণ করে, প্রসঙ্গটিকে একেবারেই অতিরঞ্জিত না করেই ব্যাপারটি একে বারে শিশু কিশোরদের উপযোগী করে উপস্থাপন করেছেন কুশলী লেখক। মূল মহাভারতে ভীমসেনের বাল্যক্রীড়া **প্রসঙ্গভাবে** বর্ণিত—

জবে লক্ষ্যাভিহরণে ভোজ্যে পাংশু বিকর্ষণে।
ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ভীমসেন ঃ সর্ব্বান স পরিমর্দ্দতি।।৩
হর্ষাৎ এক্রীড় মানাংস্তান গৃহ রাজন! বিলীয়তে।
শিরঃসু বিনিসৃহৈ তান যোধয়ামাস পাণ্ডবঃ।।৪
শতমেকোত্তরং তেষাং কুমারানাং মহৌজসাম্।
এক এক নিসৃহ্নাতি নাতিকৃচ্ছ্রাদ্ বৃকোদরঃ।।৫
কচেষু চ নিগৃহ্যৈতান্ বিনিহত্য বলাদ্বলী।
চকর্ষ ক্রোশতো ভূমৌ ঘৃষ্ট জানু শিরোং সকান্।।৬
দশ বালান্ জলে ক্রীড়ন্ ভুজাভ্যাং পরিগৃহা সঃ।
আস্তে স্ম সলিলে মগ্নো মৃত কল্পান্ বিমুঞ্চতি।।৭
ফলনি বৃক্ষমারুহ প্রচিন্বন্তি চতে যদা।
তদা পাদ প্রহারেণ ভীমঃ কম্পয়তে দ্রুমান্।।৮
.....
স্পর্দ্ধতে চাপি সহিতান স্মানেকো বৃকোদরঃ।১৫
তন্ত সুপ্তং পুরোদ্যানে গঙ্গারাং এক্ষিপমহে।
অথ তস্মাদদবরজং জ্যেষ্ঠঞ্চৈব যুধিষ্ঠিরম্।
প্রসহ বন্ধনে বদ্ধা এশসিষ্যে বসুন্ধরাম।১৬
এবং স নিশ্চয়ং পাপং কৃত্বা দুর্য্যোধনস্তদা
নিব্যমেবান্তর প্রেক্ষী ভীমস্যাসীন্মহাত্মনঃ।১৭

দৌড়ে, লক্ষ্য আহরণে, ভোজনে, এবং ধূলি ও লোষ্ট্রাদিনিক্ষেপে ভীমসেনই দুর্যোধন প্রভৃতি সকলকে পরাভূত করিতেন।৩

দুর্যোধন প্রভৃতি সুখে খেলা করিতেছেন, এমন সময় ভীম আসিয়া তাঁহাদের কয়েকজনকে লইয়া কোথাও যাইয়া লুকাইয়া থাকিতেন এবং তাহাদিগকে ধরিয়া পরস্পর মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করাইতেন।৪

ধৃতরাষ্ট্রের একশত একটি সবল পুত্রকে একমাত্র ভীমসেনই অতি কষ্টে পরাভূত করিতেন।৫

বলবান ভীম বলপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগকে ভূতলে নিপাতিত করিয়া আকর্ষণ করিতে থাকিতেন; আর তাঁহারা বিলাপ করিতেন এবং তাঁহাদের জানুমস্তক ও স্কন্ধদেশ মৃত্তিকায় ঘর্ষণ পাইতে থাকিত।৬

ভীম জল ক্রীড়া করিবার সময়ে বাদুযুগল দ্বারা দশটী বালককে ঠকিয়া লইয়া জলের ভিতরে ডুব দিতেন এবং তাহারা মৃত প্রায় হইলে ছাড়িয়া দিতেন। সেই বালকগণ

যখন বৃক্ষে আরোহন করিয়া ফল চয়ন করিত, ভীম তখন পদাঘাত করিয়া সেই বৃক্ষগুলিকে সঞ্চালিত করিতেন।৮

সেই পদাঘাতে বৃক্ষগুলি সঞ্চালিত হইলে, তাহা হইতে বালকগণ ভীত হইয়া ফলের সহিত তৎক্ষণাৎ ভূতলে পড়িয়া যাইত।

অতএব সে যখন নগরের উদ্যান মধ্যে নিদ্রিত হইবে, তখন তাহাকে আমরা **গঙ্গার** জলের ভিতরে নিক্ষিপ্ত করিব; তাহার পর কনিষ্ঠ অর্জুনকে এবং জ্যৈষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে বলপূর্বক কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া রাজ্যশাসন করিয়া। ১৬

পাপমতি দুর্যোধন তখন মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সর্বদাই মহাত্মা ভীমসেনের ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন।১৭

(মহাভারতম্ জন্মশত বার্ষিকী সংক্ষণয় ঃ আদিপর্ব ৩; শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ ভট্টাচার্যেণ প্রণীতয়া, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা-৯। মাঘ ১৩৮৩ পৃঃ ১৩৫৫-১৩৫৮)

এবারে দেখা যাক উপেন্দ্রকিশোর কিভাবে এ ঘটনাটিকে বিবৃত করেছেন—

"খেলার সময় ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা ভীমের হাতে বড়ই নাকাল হয়। ভীমের জ্বালায় উহারা ভাল করিয়া খেলিতেই পায় না। খেলা আরম্ভ করিলেই ভীম কোথা হইতে আসিয়া তাহাদের মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করিয়া দেন। ইহারা একশো ভাই, ভীম একেলা। তবুও ইহারা কিছুতেই তাঁহাকে আঁটিতে পারে না। তিনি তাহা দিগকে আছড়াইয়া ফেলিয়া চুল ধরিয়া এমনি টান দেন যে, বেচারারা তাহাতে চেঁচাইয়া অস্থির হয়। জলে নামিয়ো খেলা করিতে গেলে, তিনি তাহাদের দশজনকে একসঙ্গে জড়াইয়া ধরিয়া ডুব দেন, আর তাহারা আধমরা না হইলে ছাড়েন না। বেচারারা হয়তো ফল পড়িবার জন্য পাছে উঠিয়াছে, এমন সময় ভীম আসিয়া সেই গাছে লাথি মারিতে থাকেন। লাথির চোটে গাছ এমনি নড়িয়া উঠে যে, ফলের সঙ্গে উহারাও মাটিতে পড়িয়া যায়। কাজেই উহারা ভীমকে বড়ই হিংসা করে, আর তাঁহার কাছে বড় একটা ঘেঁসে না।"

ভীমকে যতই দেখে, দুর্যোধনের মনে ততই ভয় হয়, আর ততই তাহার দুষ্টবুদ্ধি বাড়িয়া ওঠে। সে কেবলই ভাবে, এই ভীমটাকে বড় হইতে দিলেই তো আমাদের সর্বনাশ। সুতরাং এইবেলা এই টাকে মারিয়া ফেলিতে না পারিলে চলিতেছে না। ভীম মরিলে আর চারিটা ভাইকে বাঁধিয়া রাখিলেই চলিবে।"

(উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র সংকলন ও সন্ধিক্ষণ সুনীন জলনা, দে'জ পাবলিশিং, ৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৪১৭)

একটা কথা বলা যায়, মহাভারতের প্রারম্ভিক অংশকে বেশ কিছুটা বর্জন করিলেও

বা অনেকটা সংক্ষিপ্ত করলোও ভীমের দুরন্তপনা আর প্রবল শক্তির প্রসঙ্গকে তিনি বিস্তৃত পরিসরে তুলে ধরেছেন। এর পেছনে কিছু একটা কারণ ছিল। দুরন্ত বাঙালি কিশোরদের ভালো লাগাবার জন্য তিনি এটা করেছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা মিষ্টির সঙ্গে বিষ খাইয়ে দেয় ভীমকে। বিষের প্রভাবে ভীম হতচৈতন্য হয়ে পড়লে তাকে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়। এরপর ভীম সাপেদের রাজ্যে চলে যায়। এই অবস্থার বর্ণনা করেছেন উপেন্দ্রকিশোর এভাবে—"তখন সে ভারি একটা গোলমাল হইল তাহা বুঝিতেই পার। সাপের দল মহারাগে আসিয়া ভীমকে যে কি ভয়ানক কামড়াইতে লাগিল, তাহা আর বলিবার নয়।" গল্প বলার এই শৈলি বা স্টাইল উপেন্দ্রকিশোরের নিজস্ব। কাহিনীর পরবর্তী অংশ কুন্তীর উদ্বেগ, বিন্দুরের সান্ত্বনা সবই মূল সংস্কৃত মহাভারতের অনুসারী।

এরপরই আছে অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী দ্রোণাচার্যের সঙ্গে কৌরবও পাণ্ডব বালকদের প্রথম সাক্ষাতের নাটকীয় ঘটনাপ্রসঙ্গ। মাঠে তারা একটি গোলা বা বন্দুক নিয়ে খেলতে খেলতে সেটি কূপের মধ্যে পড়ে যায়। এর ফলে তারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে। এটি মূল মহাভারতে এরূপ আছে

ততোদুন্যোন্যমবৈক্ষন্ত ব্রীড়য়াদু বন্মতামনাঃ।
তস্যা যোগ বিন্দন্তো ভৃশঞ্চোৎ কণ্ঠিতাভবন্।।

অর্থাৎ তাঁহারা সহায় অবনত মুখ হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাইতে লাগিলেন এবং তাহা তুলিবার উপায় না পাইয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন।

এই সময়ে তাঁহারা দেখিলেন—শ্যামবর্ণ, শুক্লকেশ, এবং কৃশ শরীর এক ব্রাহ্মণ অদূরে বসিয়া, অগ্নিহোত্রের অগ্নি সম্মুখে রাখিয়া হোম করিতেছেন।

তেদুপশ্যন ব্রাহ্মণং শ্যামমাপনপলিতং কৃশম্।
কৃত্যবন্তদূরস্থ মগ্নিহোত্র পুরস্থতম্।।

উপেন্দ্রকিশোর এখানে দ্রোনাচার্যের হোমের প্রসঙ্গে বাদ দিয়ে ঘটনাটিতে নাটকীয় করে তোলার জন্য অন্যভাবে বর্ণনা করলেন—

"এমন সময়, সেইখান দিয়া একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যাইতেছিলেন। ছিপছিপে কালো হেন লোকটি, পাকাচুল হাতে তীর ধনুক।" এভাবে সংস্কৃতের কঠিন আবরণ ছিন্ন করে উপেন্দ্রকিশোর কি সাবলীল ভাষায় স্বচ্ছন্দ গতিতে ব্যাপারটি বর্ণনা করলেন।

মূল মদ্রহাভারতের আদি পর্বের কিছু অংশ নিয়ে আমরা উপেন্দ্রকিশোরের ছেলেদের মহাভারত -এর বৈশিষ্ট্য ও তাঁর নিজস্বতার পরিচয় দেবার একটু চেষ্টা করলাম। সমগ্র মহাভারত ধরেই এইভাবে মূলের সঙ্গে মিলিয়ে নিলে উপেন্দ্রকিশেরের মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যাবে। মহাভারতের একেবারে অন্তিমে স্বর্গারোহন পর্বে

একটি ঘটনাকে তিনি মূল মহাকাব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। যুধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়ে দ্রৌপদী সহ অন্যান্য ভ্রাতাদের দেখতে পেলেন না, কিন্তু দুর্যোধনকে দেখে বিস্মিত হলেন। তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর নারদ মুনি বললেন,"দুর্যোধন ধর্মযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন আর তিনি ঘোর বিপদেও ভীত হন নাই। এই পুণ্যেই তাঁর স্বর্গলাভ হইয়াছে।' দেখা যাচ্ছে একেবারে সরলরৈখিক মাত্রায় পাপপুণ্যের বিচার মহাভারতে করা হয়নি, লেখক উপেন্দ্রকিশোর করেনি। শিশু কিশোরদের কাছে তিনি নির্ভীকতার মর্যাদা বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। তাই বলা যায় উপেন্দ্রকিশোরের মহাভারত সৃজন শুধু বিনোদনের জন্য নয়, শিশু কিশোরদের চারিত্রিক বিকাশের জন্যও বটে। দেখা যাচ্ছে ইউ রায় অ্যান্ড সন্স হাতবদলের পরেও ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত এখান থেকে বইটির ২৮টি মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে, যদিও ব্লকগুলি অত্যন্ত জীর্ণ হয়ে যাওয়ায় ছাপা ছবির মান ও কমেছে।। কপি রাইট উঠে যাবার পর অন্তত বারোজন প্রকাশক এই বইটি প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ আবার বইয়ের নামটাও বদলে ফেলেছেন। লিখেছেন 'ছোটদের মহাভারত'। তবে মূল গ্রন্থ চিত্রণগুলি হারিয়েই গেছে। সম্প্রতি দে'জ পাবলিসিং থেকে সুনীল জানা সংকলিত ও সম্পাদিত যে বৃহদায়তন বইটি প্রকাশিত হয়েছে যার পাঁচটি মুদ্রণ ও হয়েছে তাতেও নেই গ্রন্থকারের ভূমিকা, আর সেইসব উজ্জ্বল ছবিও।

পরের বই 'মহাভারতের গল্প।' 'ছেলেদের মহাভারত' প্রকাশের ঠিক এক বছর পরেই অর্থাৎ ১৯০৯এ সিটি বুক সোসাইটি থেকে এটি প্রকাশিত হয়। মহাভারতের মূল কাহিনি ছাড়াও যে সব উপকাহিনি 'ছেলেদের মহাভারত' এ বর্জিত হয়ে ছিল, সেরকম প্রায় ৬৪টি কাহিনি এতে সন্নিবিষ্ট হয়। এই বইটিতে একটি রঙিন মুখপত্র ছাড়াও ছিল আটটি পাতাজোড়া একরঙা ছবি। গ্রন্থকারের নিবেদন অংশে তিনি লিখেছিলেন, 'মহাভারতের অবান্তর গল্পগুলি লইয়া এই পুস্তক লিখিত হইল। এই সকল গল্পের প্রত্যেকটির আগাগোড়া অবিকল রাখিয়া বালক বালিকাদের নিকট বলা একেবারেই অসম্ভব আর তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ ও হয় না। কারণ মহাভারতের ভিতরেই এক গল্পের নানারূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই পুস্তকের নানা স্থানে মূলের সহিত যে অনৈক্য আছে, তজ্জন্য সহৃদয় পাঠক আমাকে মার্জনা করিবেন, এই আমার কথা'। এই বইটিতে সহজ ভাষায় শর্মিষ্ঠা দেবযানী, দুষ্মন্ত -শকুন্তলা, নল-দময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবান হইতে পৌরাণিক কাহিনির পাশাপাশি দিতির সন্তান হিরণ্য কশিপু, মধু-কৈটভ, সুন্দ-উপসুন্দ, রাজ-কেতু, বৃত্রাসুরপ্রভৃতি দৈত্য বা অসুরের কথা যেমন আছে তেমনি সপ্তঋষি পুলস্ত, পুলাহ, ক্রতু, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, মরীচি, বিশ্বামিত্র, পরাশর, দধীচি, অগস্ত, ভৃগু, চ্যবন, উদ্দালক, স্বেতকেতু, অষ্টাবক্র, কশ্যপ, নচিকেতা প্রভৃতি মুনি ঋষিদের নানা কাহিনি আছে। আর আছে স্পল্প জ্ঞাত চ্যবন ও কুকন্যার

কথা, কুরু ও প্রমদ্বরার কথা, পরীক্ষিৎ ও শুশোভনার কথা, উশীনগরের গরীমা প্রভৃতির প্রসঙ্গ। এসব ছাড়াও তিনি সনেশ পত্রিকায় লিখেছেন বহু পৌরাণিক কথা। তার মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর পিতা, ত্রিপুর, অগস্ত্য, গঙ্গা আনিবার কথা, (১৩২০), 'সাগরের রাজা', 'সূর্য্যের গৃহিনী,' রেবতীর বিবাহ', 'সাপ রাজপুত্র, কুবলয়াশ্ব (১৩২১) প্রভৃতি মহাভারতাশ্রয়ী কাহিনি।

জাতীয় জীবনে এই মহাকাব্যটির প্রভাব অনস্বীকার্য। যুগ যুগান্তরে ভারতীয় জনমানসে রামায়ণ ও মহাভারত এই দুটি **জাত মহাকাব্য** (authentic Epic) গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। বুঝতে পারা যায়—এই মহাভারত মহাকাব্যটি একাধারে **'আখ্যান, ইতিহাসও পুরাণ'**। আর রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় 'এটি বাস্তব ইতিহাস না হয়েও তার মধ্যে ইতিহাসের উপকরণ যথেষ্ট। '

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ছেলেদের রামায়ণ

মনোরঞ্জন সরদার

সন্দেশ পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা শুরু হয়েছিল একটি বারো লাইনের কবিতা দিয়ে। লিখেছেন শ্রী জ্যোতির্ময়ী দেবী, বি. এ. সম্ভবত সম্পাদককে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন 'সরল হৃদয় তার মধুর বচন।/ শুনিব তাহার মুখে সন্দেশ নূতন।'[১] নতুন সন্দেশই বটে! একই সঙ্গে সংবাদ ও আস্বাদময় আনন্দ। সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ইচ্ছে ছিল, 'আমাদের এই যে পত্রিকাখানি সন্দেশ নাম লইয়া সকলের নিকটে উপস্থিত হইতেছে, ইহাতেও যদি এই দুটি গুন থাকে—অর্থাৎ সন্দেশ পড়িয়া যদি সকলের ভাল লাগে আর কিছু উপকার হয়, তবেই ইহার সন্দেশ নাম সার্থক।'[২] সার্থক করার প্রায় একক দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি। পরের লেখাটি—'প্রথম কবি ও প্রথম কাব্য।' লেখক ও শিল্পী উপেন্দ্রকিশোর। লেখাটির সঙ্গে একটি অসাধারণ ছবি। তমসা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ঋষি। সাধুলোকের মনের মত স্ফটিকস্বচ্ছ জল। সুন্দর দু'টি পাখি খেলা করছে। এমন সময় দুষ্ট ব্যাধ এসে নিষ্ঠুর হয়ে পুরুষ পাখিটিকে মারলেন। পরের ঘটনা আমাদের জানা। প্রথম কাব্য লেখা হল। ব্রহ্মা বললেন—'বাল্মীকি তোমার এ কবিতার নাম শ্লোকই হউক। এইরূপ শ্লোক লিখিয়া তুমি রামের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর। সে বড় সুন্দর কাহিনি। তাহা যে পড়িবে তাহারই মঙ্গল হইবে। তুমি যাহা লিখিবে তাহার একটি কথা মিথ্যা হইবে না। যতদিন পৃথিবীতে পর্বত আর নদী সকল থাকিবে, ততদিন লোকে তোমার রামায়ণের আদর করিবে; আর যতদিন রামায়ণের আদর থাকিবে তুমি স্বর্গে গিয়া ততদিন আমার লোকে থাকিতে পাইবে।'[৩] পৃথিবীর কাব্যরসিক মানুষ যতদিন থাকবেন, নিশ্চয় মনে রাখবেন মহাকবি বাল্মীকির রামায়ণ, তবে এও সত্য বঙ্গদেশের বাঙালি 'শিশুমন' চিরকাল রামায়ণের আস্বাদ নেবেন উপেন্দ্রকিশোরের ছেলেদের রামায়ণ থেকে। তাঁর রামায়ণ ও মহাভারত নতুন আঙ্গিকে নিজস্ব চিন্তায় স্বতন্ত্র।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ছেলেদের রামায়ণে মহাকাব্যের সৌরভ নেই, রয়েছে রূপকথার সুগন্ধ ও পারিবারিক জীবনানুভূতির মাধুর্য। শিশুমনের উপযোগী করে সহজে সুন্দর বর্ণনাভঙ্গিতে দাদামশায়ের থলে[৪] বা 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'[৫]-র মত রূপকথা, রসকথা ও গীতিকথার সমাবেশ লক্ষ করা যায় ছেলেদের রামায়ণ ও মহাভারতে। আসলে রূপকথার রঙে ও ভঙ্গিতে বলার বা লেখার ক্ষমতা ছিল তাঁর সহজাত। মেয়ে পুণ্যলতা চক্রবর্তী তাঁর। ছেলেবেলার দিনগুলিতে লিখেছিলেন—স্কুলে লেখাপড়া করতাম, বাড়িতে

মাষ্টারমশাই-এর কাছে পড়তাম, কিন্তু বাবার কাছে গল্পের মত করে মুখে মুখে কত কি শিখতাম, সেটাই সবচেয়ে ভাল লাগত। এমন সহজ আর সুন্দর করে বাবা বলতেন যে কত সময়ে একজিবিশন কিংবা মেলায় গিয়ে দেখছি, আমরা যেখানে যাচ্ছি, আমাদের ঘিরে একটা ছোটখাট ভীড় জমা হয়ে যাচ্ছে। বাবা আমাদের সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন, চারিদিকে থেকে লোকে ঝুকে পড়ে হা করে তাই শুনছে।[৬] ছেলেদের রামায়ণ রচনাটিতে লেখক গল্প বলার ছলে রংতুলি নিয়ে শব্দের রেখায় রামায়ণ কথা উপহার দিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্রষ্টাদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন—মানুষ জন্মাবার সময় খালি হাতেই আসে, তবে মাঝে মাঝে সঙ্গে নিয়ে আসে একটুখানি পিপাসা। সেই পিপাসাটাই হল সব। তাকে সাধারণ জল দিয়ে মেটানো যায় না। তার জন্য চাই অন্যরকম রস, সুর, শব্দ, রেখা, রূপ, কথা। যাঁরা এই পিপাসাটুকু নিয়ে জন্মায় শুধু তারাই হয় শিল্পী, সাংগীতিক, সাহিত্যিক।[৭] এই রস পিপাসায় নিরন্তর মগ্ন ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। বস্তুত রসের, সুরের, রঙের ও রেখার নীরব সাধনা করতেন তিনি। তাঁর অবকাশের সঙ্গীতচর্চা মুগ্ধ করেছে অনেককেই। এমনকি রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ে তিনি শিশুমনের বিকাশের জন্য গান শেখাতেন। কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র) এ বিষয় লিখেছিলেন—'রবিবাসীয় নীতি বিদ্যালয়ের ঐ গানের ক্লাস এমনি আনন্দের ব্যাপার ছিল যে, যদিও আমি তখন পিতার কর্মস্থল এলাবাহাদ হইতে ছুটিছাটায় শুধু কলকাতায় আসিতে পাইতাম কিন্তু সেই ছুটির মধ্যে অতি আগ্রহের সহিত সেই ক্লাসে যাইতাম—সামান্য কয়দিন আগ্রহলাভের জন্য। বল্যজীবনে সঙ্গীতের কী প্রভাব উপেন্দ্রকিশোর তাহা জানিতেন বলিয়াই তাঁহার শত কাজের মধ্যে ও এই গানের ক্লাস চালানোর ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৮] ছেলেদের রামায়ণ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এতকথা বলার কারণ। এই রচনাটির মধ্যে আশ্চর্য দক্ষতায় লেখক মহাকাব্যের আখ্যানকে রূপকথার কথনরীতিতে সরস পারিবারিক সংলাপে অপূর্ব সব ছবির সম্ভারে ভরিয়ে তুলেছেন।

আদিকবি বাল্মীকির মহাকাব্য কালের গন্ডীতে বাঁধা পড়েনি। তবে কৃতিবাসের কাব্যে বাঙালার বিশেষ একটি কালের ধর্মাদর্শ ও জীবনাদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। সেখানে অবতার শ্রী রামচন্দ্রের নামে নামের গুণে পাথর ভাসে, সেই পাথরে বাঁধ বাঁধা হয়। এমনকি তরণী সেনের কাটামুণ্ড রামনাম করে। উপেন্দ্রকিশোর সেইসব দিকে যাননি। তাঁর রচনায় যুক্তিহীন ভক্তির প্রাবল্য নেই। তিনি লিখলেন—'বানরেরা গাছ আর পাথর আনিয়া সমুদ্রের ধারে ফেলিতে লাগিল। নল কী আশ্চর্য কারিগর। সেই গাছ পাথর দিয়ে একশত যোজন লম্বা সুন্দর সেতু প্রস্তুত করিতে ছয়দিনের বেশি সময় লাগিল না। সেই সেতুর উপর দিয়া সকলে পার হইয়া লঙ্কায় আসিল।[৯] অতএব নামের গুণে নয়,

কারিগরের গুণে সেতু তৈরি হয়। আবার এই রামচন্দ্র ফলমূল খেয়ে বনের মধ্যে বসোবাস করেননি। এদের জীবনাচরণ স্বাভাবিক। অযোধ্যা ছেড়ে গঙ্গা নদী পার হয়ে বৎসদেশে এসে 'সেখানে হরিণ মারিয়া খাইয়া তাহারা বর্ম পরিয়া ধনুর্বান হাতে বনের ভিতর প্রবেশ করিলেন।[১০] অসম্ভব, অবাস্তব কোনো যাপনচিত্র গুরুত্ব দেননি লেখক। সাধারণ, স্বাভাবিক, পরিচিত, ভালো মন্দ, সুখ-দুঃখের অনুভূতিগুলো প্রকাশ করেছেন। যে কারণে বালী বধের সময় সুগ্রীবকে চেনার জন্য তার গলায় ফুলশুদ্ধ নাগপুষ্পীলতা বেঁধে দিয়েছিলেন। তারপর বালীকে (অন্যায়ভাবে) মারার পর রামচন্দ্র বললেন—'তুমি দুষ্ট লোক, তোমাকে মারাতে আমার কোনো অন্যায় হয় নাই। আমার বন্ধুর নিকট আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তোমাকে মারিব, কাজেই তোমাকে মারিয়াছি।[১১] শিশু কিশোর মনে এইভাবে 'ভাল' ও 'মন্দ' এর ধারণা তৈরি করে দিয়েছেন বারবার।

ছেলেদের রামায়ণ কথা রূপকথার গল্প বলার এক সচেতন আখ্যান রীতিতে উপস্থাপিত হয়েছে। কাহিনিটিকে নিজস্ব স্টাইলে সাজিয়ে নিয়েছেন তিনি। তাই কোথাও হয়তো অতুক্তি রয়েছে। তবে একথাও তো ঠিক 'এক হিসেবে শিল্পের মধ্যে অত্যুক্তি থাকবেই, অনেকদিন পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি কবিতায় যেমন লিখেছিলেন যে হৃদয় যখন ইঙ্গিতের ভাষায় ভরপুর হয়ে ওঠে তখন সাজিয়ে বলা আসে অগত্যাই। কিন্তু সেই সাজিয়ে বলার মাত্রা ঠিক রাখার মধ্যে একজন শিল্পীর যথার্থ বাহাদুরি।'[১২] উপেন্দ্র কিশোরের সেই 'মাত্রাজ্ঞান' ভরপুর ছিল। পুরাণকথাকে রূপকথার আমেজে একটা স্বতন্ত্র ধারা তৈরি করেছিলেন। বিশ্বমিত্র রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে চলেএছন যজ্ঞ রক্ষা করার জন্য। গঙ্গার ওপারে ভয়ানক বন। 'সেই বনে তাড়কা নামে একটি রাক্ষসী থাকে। তাহার গায়ে হাজার হাতির জোর। আগে এখানে সুন্দর দেশ ছিল, তাহাতে কতই লোকজন বাস করিতে। এই তাড়কা আর তাহার পুত্র মারীচ সেই সকল লোকজনকে খাইয়া দেশটি একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। এখন সেখানে ভয়ানক বন, সে বনে মানুষ গেলেই তাড়কা তাহাকে ধরিয়া খায়।[১৩] এই যে বিবরণ, এর সঙ্গে রূপকথার কাহিনির মূল কাঠামোর কোনো পার্থক্য নেই। সাত সাগর আর তের নদীর পারে যে রূপকথার রূপনগর সেখানকার সমৃদ্ধ নগরে থাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী রাজকন্যে। কিন্তু একদা এক মায়াবী রাক্ষসী সেই সোনার রাজ্যকে মায়াবলে পাথরে পরিণত করে দিল। জনহীন অরণ্যময় হল রাজ্যটি। কেবলমাত্র রাজকন্যাকে সোনার কাঠি রূপারকাঠি দিয়ে জাগানো যায়। রাজপুত্রের সাধ্যসাধনায় সব আগের মত হয়। এখানেও রাজপুত্র রামচন্দ্রই মায়াবী তাড়কা রাক্ষসীকে মেরে স্বাভাবিক করে সবকিছু। আবার সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাওয়ার পর রামচন্দ্র ও সুগ্রীব সীতাকে খুঁজতে তার দূরন্ত সেনাদের পাঠিয়েছিলেন। তারা স্বর্গ মর্ত্য পাতাল খুঁজে ফেরেন। সেই বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক

লেখেন—বাঘমুখো মানুষেরদেশে, জবদ্বীপে, স্বর্ণদ্বীপে, রৌপ্যদ্বীপে তাহারা সীতাকে খুঁজিয়াছিল। ভয়ঙ্কর ইক্ষু সমুদ্রের ধারে বিকটাকার রাক্ষসেরা থাকে, তাহারা জন্তুর ছায়া ধরিয়া টানিয়া টানিয়া তাহাকে খায়।.....তারপর জলদ সমুদ্র। সেখানে অতি বিশাল একটা ঘোড়ার মুখ হইতে ক্রমাগত আগুন বাহির হইতেছে, আর তাহা দেখিয়া সমুদ্রের জন্তু সকল ভয়ে চিৎকার করিতেছে।[১৪] রূপকথার যে কল্পনা, যে নতুন রূপনির্মাণের মুন্সীয়ানা এবং আশ্চর্য কথনভঙ্গি—এসবের সুচারু সমাবেশ ছেলেদের রামায়ণ। এই রামায়ণ কথায় দেশীয় রূপকথার সঙ্গে বিদেশী রূপকথার মিশেল লক্ষণীয়। লঙ্কায় সীতাদেবীকে ঘিরে রয়েছে যে রাক্ষসীরা, তাদের 'কোনোটার কান হাতির কানের মত চ্যাটালো, কাহারও কান আবার ঘোড়ার কানের মত সুচালো। কোনোটার গলা হাড়গিলের গলার মত লম্বা। কোনোটার মুখ শুয়োরের মুখের মতন, কোনোটারমুখ বাঘের মুখের মতন, কোনোটারমুখ শেয়ালের মুখের মতন।[১৫] অথবা 'গোধার মুখ সিংহের আর বাঘের মতন হইলে সে জানোয়ার দেখিতে কেমন বিকট হয়? সেইরূপ গাধায় ধূম্রাক্ষের রথ টানিত।[১৬] এই বর্ণনায় রয়েছে দেশের রূপকথার সঙ্গে বিদেশী রূপকথার আশ্চর্য সমন্বয়। C. S. Lewis এর THE LION, THE WITCH AND THE WARD-ROBE র মত বিখ্যাত ক্লাসিক ফ্যান্টাসি গল্পগুলির পশুপাখিদের বর্ণনা একই ঘরানার। যে ধারায় বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন জে. কে. রাউলিং তাঁর হ্যারিপটারের গল্পগুলি নিয়ে।

তবে ছেলেদের রামায়ণে রূপকথার রহস্যময়তাকে যেন ছাড়িয়ে গেছে পারিবারিক জীবন গন্ধ বা সাধারণ বাঙালির পরিচিত প্রাত্যহিকতায়। সরযূ নদীর তীরে ৪৮ ক্রোশ লম্বা ১২ ক্রোশ চওড়া বিশাল রাজত্ব। সাদা পাথরের তৈরি রাজপুরী। প্রাচীরে সাজানো শতঘ্নী অস্ত্র যা ছুড়ে মারলে এক সঙ্গে একশ লোক মারা পড়ে। সেই রাজা দশরথকে বিশ্বমিত্র এসে যখন বললেন দুষ্ট রাক্ষসদের মারার জন্য রামচন্দ্রকে দিতে হবে তখন মুনির কথা শুনিয়াই তো দশরথ কাপিতে কাঁপিতে অজ্ঞান হইয়া গেলেন।[১৭] জ্ঞান ফিরে এলে বলেন—'মুনি ঠাকুর আপনার পায়ে পড়ি, আমি রামকে দিতে পারবো না। আমার রাম কি এসকল ভয়ানক রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিবে? না হয় নিজেই অনেক লোকজন লইয়া আপনার যজ্ঞে পাহারা দিব। রামকে ছাড়িয়া দিন।[১৮] দশরথ যে কতখানি বাঙালি পারিবারিক আদলে নির্মিত তা আরও স্পষ্ট ছোট স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত প্রীতিতে। মূল মহাকাব্যে বা কৃত্তিবাসের শ্রীরামপাঁচালীতে কৌশল্যা কৈকেয়ীর দয়ায় যজ্ঞের পায়েস পেয়েছিলেন সুমিত্রা। কিন্তু এখানে 'রাজা দশরথ নিজেই পায়েসের অর্ধেকটা লইয়া খানিক সুমিত্রার জন্য আর বাকি কৌশল্যার জন্য রাখিলেন। তারপর অন্য অর্ধেকের খানিকটা সুমিত্রার জন্য আর বাকিটা কৈকেয়ীর জন্য রাখা হইল। বেশ সহজ হিসেব।[১৯] এই সহজ হিসেব বাঙালির নিতান্তই পরিচিত, সামাজিক পরিকাঠামোর

চৌহদ্দিরমধ্যেই এর চলাচল। সেই কারণে হরধনু ভঙ্গের পর মিথিলা রাজ্যের উৎসবের ছবি আমাদের চেনা লাগে। যেদিকে তাকাও কেবলই আলো, আর ধূপ ধূনা, আর মুনিঠাকুর আর শঙ্খ ঘন্টা, আর ঢাকঢোল; আর হাতি ঘোড়া, আর মিঠাই সন্দেশ, আর ভিখারী বৈষ্ণব, আর হাসি তামাসা, ছুটা ছুটি, ভোজন, ভোজন, কোলাহল, কোলাহল, কোলাহল।[২০] এই বিয়ের উৎসব বর্ণনায় ধনী পরিবারের ঘরোয়া পরিবেশ চোখের উপর ভেসে ঢঠে। আবার চিরাচরিত কুট্টিনি মন্থরা কুঁজী চরিত্রটি জীবন্ত করে নির্মাণ করেছেন লেখক। কুঁজীই যেন 'কৈকেয়ীর মন একেবারে খারাপ করিয়া দিল।[২১] ফলে রামচন্দ্রকে বনবাসে যেতে হয়। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় দশরথের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়। লেখক লিখেছেন—'আহা বুড়া বেচারার কী কষ্ট! এমন দুঃখ কি আর কখনো পাইয়াছে? রাজা কখনও কাঁদেন, কখনও কৈকেয়ীকে গালি দেন।..... কখনও আবার অজ্ঞান হইয়া যান। জ্ঞান হইলে আবার কৈকেয়ীকে বকেন। একবার কৈকেয়ীর পা ধরিতে গেলেন, কিন্তু ততক্ষণে তাঁহার জ্ঞান রহিল না।[২২] যৌথ পরিবার ভাঙনের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই বর্ণনায়। বিশেষ করে লক্ষণ যখন 'কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন মা, দাদা কিসের জন্য বনে যাইবেন? মহারাজা এখন বুড়া হইয়াছেন। তাহার কি মাথার ঠিক আছে? তাহা না হইলে কেন স্ত্রীর কথায় ভুলিয়া এমন লোককে বনে পাঠাইতেছেন?[২৩] এই প্রশ্ন একটু অন্যভাবে করা যায়। মা, দাদা কিসের জন্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে? বৃদ্ধ বয়সে বিয়ে করে ছোট বউয়ের সন্তানদের সর্বস্ব দেওয়ার প্রবণতা বাঙালির কাছে খুব পরিচিত। সেই চেনা স্বরভঙ্গির ঘরোয়া আবেদন রয়েছে এই রচনায়।

ছেলেদের রামায়ণকে অনুবাদ বা ভাবানুবাদ—এসব কিছুই বলা সঙ্গত নয় মনে হয়। এখানে গল্পকে নিয়ে নতুন করে গল্প নির্মাণ হয়েছে। কেবল পাত্র-পাত্রী একই রয়েছেন। সমগ্র রচনায় এই বাঙালি সমাজ মানসের উপযোগী সংলাপে ভরে রয়েছে। ফলে আলংকারিক রসতত্ত্ববিচরে এই রচনায় করুণ রসের রসমাধুর্য বা বীররসের যে ঐশ্বর্য তার কোনোটিই নেই এখানে বরং আমাদের পরিচিত পরিবেশটি উদ্ভাসিত হয়েছে। আর এর অন্তরালে রয়েছে হাস্য রসের চোরাস্রোত। তাই রাবণের সন্ন্যাসী বেশ খুব চেনা লাগে—হাতে ছাতা লাঠি আর কমণ্ডুল, মাথায় টিকি, পায়ে জুতা, কপালে লম্বা ফোঁটা, মুখে ঘন ঘন হরিনাম। এই রাবণ ত্রিদেশ, 'ত্রিজগৎ' বিজয়ী বীর নন, তিনি যুদ্ধ করতে করতে অসুস্থ বোধ করলে সারথি তাঁকে লঙ্কার মধ্যে নিয়ে যান। কিন্তু 'একটু সুস্থ হওয়া মাত্রই রাবণ সারথিকে গালি দিতে আরম্ভ করিল, ওরে নির্বোধ তুই কি ভাবিয়াছিল আমার গায়ে জোর নাই, নাকি আমার গায়ে সাহস কম? দেখ তো হতভাগা, কি করিলি? রথ লইয়া পলাইয়া আসিলি, এখন লোকে আমাকে বলিবে কি? সারথি বলিল, মহারাজা আপনার পরিশ্রম হইয়াছে, আর ঘোড়াগুলিও বড় কাহিল।[২৫] এই

পারিবারিক বিবাদে রামচন্দ্রের পক্ষের লোকজনদের একই অবস্থা হয়েছিল। ইন্দ্রজিত সবাইকে পরিজিত করে অজ্ঞান করে দিলে জাম্বুবান কোনোভাবে বিভীষণকে বলেন হনুমান যদি বাঁচিয়া থাকে তবে কোনো ভয় নাই, আর যদি সে মরিয়া গিয়া থাকে তবে আর উপায় নাই।[২৬] এমনই জীবন রস রসিকতার অপূর্ব বিবরণ এই রচনার স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। অথচ গল্পের ছলে চরিত্রগুলির স্বরূপ চিনিয়ে দেওয়ার প্রজ্ঞা ছিল উপেন্দ্রকিশোরের। অবার শিশুকিশোর মনের প্রশ্নগুলোর সহজ নিরসন রয়েছে গল্প কথনের মধ্যে। হনুমান রাম-সেনাদের বাচানোর জন্য ঔষধের গাছ সমেত পাহাড় তুলে আনলে ওষধের গন্ধে রাম লক্ষ্মণ ও বাননেরা বেঁচে উঠলেন, কিন্তু রাক্ষসেরা বেঁচে উঠলো না কারণ পাছে অনেক রাক্ষস মরিয়াছে দেখিলে বানরদের সাহস বাড়িয়া যায়, এজন্য রাক্ষস মরিলেই অন্য রাক্ষসেরা সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিত। কাজেই ওষধের গন্ধ তাহাদের নাকে পৌছিতে পারিল না আর তাহারাও বাঁচিল না।[২৭] এই যুক্তি কিশোর মনকে অনেক বেশি আগ্রহী করে তুলেছে।

ছেলেদের রামায়ণ রচনা করতে গিয়ে উপেন্দ্রকিশোর মূল রামায়ণ বা কৃত্তিবাসী রামায়নের দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। তবে দুয়েরই কম বেশি প্রভাব রয়েছে। অবশ্য সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে তাঁর আশ্চর্য শিল্প কৌশল, একেবারে নিজস্ব স্বরভঙ্গি এবং ঐকান্তিক জ্ঞান পিপাসা। এসবের সমন্বয় তাঁর রামায়ণ। প্রকৃতপক্ষে 'উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে তেলরঙে, জলরঙে আর কালিকলমে প্রকৃতিক দৃশ্য আঁকতেন আর পৌরাণিক কাহিনি ও অন্যান্য গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ বিচিত্রিত করতেন; চমৎকার বেহালা আর পাখোয়াজ বাজাতেন; ভাবগম্ভীর ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করতেন আর ছোটদের জন্য মজার গান লিখে সুর দিতেন, রঙিন ও হাফটোন ছবি ছাপার কাজে মৌলিক গবেষণা করে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। আমাদের দেশে তিনিই প্রথম উচ্চমানের ছবি ছাপা প্রবর্তন করেছিনেল।[২৮] রামায়ণ মহাভারত, পুরাণ কথা, গ্রাম্য উপকথা, রূপকথা, বিদেশী গল্প রচনা করতে গিয়ে এই বহুমুখী প্রতিভার আলো দিয়ে সাজিয়ে সাজিয়ে তুলেছিলেন। তাই তাঁর সৃষ্টির আলেখ্যতে এসেছে যাপনচিত্রের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের আনন্দানুভূতি।

তথ্যপঞ্জি

১) সন্দেশ, প্রথমবর্ষ, প্রথম সংখ্যা বৈশাখ ১৩২০।
২) সন্দেশের কথা, সন্দেশ, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২০।
৩) তদেব, কৃতজ্ঞতা সন্দীপ রায় ও সৌমেন পাল।
৪) দাদামশায়ের থলে, বাঙ্গালার রসকথা, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১৪১৭।

৫) বাংলার উপন্যাস ঠাকুরদাদার ঝুলি, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১৪১৮।
৬) ছেলেবেলার দিনগুলি/পুণ্যলতা চক্রবর্তী, ১৩৮১। রোববার প্রতিদিন/এসো বসো আহারে—সৌমেন পাল ১০নভেম্বর ২০১৩ পৃঃ ১০।
৭) প্রাক্কথন সন্দেশ, তৃতীয় বর্ষ ১৩২২ বঙ্গাব্দ, সম্পাদনা উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, পারুল প্রকাশনী ২০১৫, পৃঃ ৭।
৮) উপেন্দ্রকিশোর/বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৭০, পৃঃ ১১২।
৯) ছেলেদের রামায়ণ, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। দে'জ পাবলিশিং অক্টোবর ২০১৫, পৃ-৭২
১০) তদেব, পৃঃ ২৬
১১) তদেব, পৃঃ ৫০
১২) অত্যুক্তি আর আত্মনিষ্ঠাম শঙ্খ ঘোষ/সুকুমার পরিক্রমা শতবার্ষিক শ্রদ্ধার্ঘ্য, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি/সম্পাদক পবিত্র সরকার প্রকাশ ২০ মে, ১৯৮৯, পৃঃ ১২
১৩) ছেলেদের রামায়ণ, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং অক্টোবর ২০১৫ পৃঃ ৮
১৪) তদেব, পৃ ঃ ৫২
১৫) তদেব, পৃ ঃ ৬১
১৬) তদেব, পৃ ঃ ৭৬
১৭) তদেব, পৃ ঃ ৮
১৮) তদেব, পৃ ঃ ৮
১৯) তদেব, পৃ ঃ ৯
২০) তদেব, পৃ ঃ ১৩
২১) তদেব, পৃ ঃ ১৭
২২) তদেব, পৃ ঃ ১৮
২৩) তদেব, পৃ ঃ ২১
২৪) তদেব, পৃ ঃ ৪১
২৫) তদেব, পৃ ঃ ৯০
২৬) তদেব, পৃ ঃ ৮৫
২৭) তদেব, পৃ ঃ ৮৫-৮৬
২৮। সুকুমার রায় ও সন্দেশ—নলিনী দাশ/সুকুমার পরিক্রমা শতবার্ষিক শ্রদ্ধার্ঘ্য, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি/সম্পাদক-পবিত্র সরকার, প্রকাশ ২০ মে ১৯৮৯ পৃঃ ২৪

উপেন্দ্রকিশোরের রচনায় লৌকিক উপাদান

বরুণকুমার চক্রবর্তী

বাংলা লোক কথা চর্চার ইতিহাসে যে দুজনের নাম এক নিংশ্বাসে উচ্চারিত হবার দাবি রাখে, তাঁদের একজন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, অপরজন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। দুজনেই বহু গ্রন্থের রচয়িতা। কিন্তু এ দু জনের যে দুটি গ্রন্থের নাম লোক সংস্কৃতি প্রেমী মাত্রেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন, উচ্চারণ করেন, সে দুটি হল 'ঠাকুরমার ঝুলি' এবং 'টুনটুনির বই'। জন্ম সূত্রে উপেন্দ্রকিশোর দক্ষিণারঞ্জনের তুলনায় তের বছরের বড়ো, কিন্তু 'টুনটুনির বই' রচনার সুবাদে উপেন্দ্রকিশোর দক্ষিণারঞ্জনের তুলনায় পিছিয়ে। 'ঠাকুরমার ঝুলি'র রচনাকাল ১৯০৭, আর 'টুনটুনির বই'য়ের প্রকাশকাল ১৯১০। চারিত্র ধর্মেও দুটি বই দুই মেরুর, 'ঠাকুরমার ঝুলি' হল রূপকথার অনবদ্য সঙ্কলন, অন্যদিকে 'টুনটুনির বই' পশুকথার সংকলন। উপেন্দ্রকিশোরের পূর্বে পশুকথার সংকলন আর কেউ প্রকাশ করেননি। এদিক দিয়ে তিনি পথ প্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

উপেন্দ্রকিশোর তাই বলে শুধু 'টুনটুনির বই'ই রচনা করেছিলেন এমন নয়, আপাদমস্তক শিশু প্রেমী এই মানুষটি সারাজীবন শিশুদের জন্যই রচনা করে গিয়েছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হল ঃ

ছেলেদের রামায়ণ ১৮৯৪-৯৫
সেকালের কথা ১৯০৩
ছেলেদের মহাভারত ১৯০৯
মহাভারতের গল্প ১৯০৯
টুনটুনির বই ১৯১০
ছোট্ট রামায়ণ ১৯১১
পুরাণের গল্প

এছাড়াও উপেন্দ্রকিশোর লিখেছিলেন গল্পমালা, সেকালের কথা, জন্তু জানোয়ার এবং অন্যান্য রচনাদি, কবিতা ও গানও তিনি রচনা করেছিলেন। আমরা নির্বাচিত কিছু রচনায় উপেন্দ্রকিশোর ব্যবহৃত লোকজ উপাদানের পরিচয় গ্রহণ করব। কিন্তু তার আগে কিছু প্রাথমিক আলোচনা সেরে নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। লোকজ উপাদান কাকে বলে? লোকজ উপাদানের বিভাজন, শ্রেণিকরণ ইত্যাদি সম্পর্কে একটা ধারণা করার প্রয়োজন রয়েছে। Folk বলতে আমরা 'লোক' বুঝি, এই লোক হল সংহত

সমাজের সদস্য, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নয়, সমষ্টির মধ্যেই এরা বিলীন। এহেন লোকসমাজ আদৃত, ব্যবহৃত, পরিচিত যা কিছু তাই হল লোকজ উপাদান। লোকজ উপাদানের সাধারণভাবে দুটি বিভাগ Formalised Folklore এবং Material Folklore—উপাদান বিমুক্ত লোকসংস্কৃতি এবং উপাদান নির্ভর লোক সংস্কৃতি। Formalised Folklore এর অন্তর্গত মূলতঃ লোক সাহিত্যের অন্তর্গত ছড়া, ধাঁধা, লোকসঙ্গীত লোককথা ইত্যাদি। অন্যদিকে Material Folklore এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে লোকখাদ্য, লোকযান, লোক ঔষধ, লোকশিল্প, লোক পানীয়, লোক পরিচ্ছদ, লোকঅস্ত্র ইত্যাদি। আমরা উপেন্দ্রকিশোরের বিভিন্ন গল্প থেকে এইসব উপকরণের পরিচয় গ্রহণ করব। 'গল্পমালা'র 'সহজে কি বড়লোক হওয়া যায়' রচনায় দেখি তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠরত লেখক গৃহত্যাগী হয়েছিলেন, উদ্দেশ্য বড়লোক হওয়া। সঙ্গী সতীশ। গৃহত্যাগী হওয়া লেখক যে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা এই রচনার প্রধান উপজীব্য। এই রচনায় বেশ কিছু লোক জীবন সম্পৃক্ত উপাদান উল্লিখিত।

'নৌকা' এই লোক যানটির প্রসঙ্গ এসেছে কয়েকবারই। যেমন 'ঘাটে একখানি নৌকা বাঁধা ছিল'—নৌকার ছই নাই। একজন লোককে অনায়াসে ওরূপ নৌকা অনেকবার চালাইতে দেখিয়াছি। আমার বোধ হইতে লাগিল আমিও পারি। নৌকায় উঠিতে বিলম্ব হইলনা। যে লগিটিতে নৌকা বাঁধা ছিল, তাহা তুলিয়া লইলাম। ডাঙ্গায় ভর করিয়া ঠেলিয়া নৌকা জলে ভাসাইয়া দিলাম।..... শোঁ শোঁ করিয়া নৌকার গায় জল বাঁধিতে লাগিল। নৌকাখানা ঘুরিয়া গেল। ছই, লগি এসব নৌকার অপরিহার্য অঙ্গ।

স্টিমারের হিন্দুযাত্রীদের তিনদিনের চিঁড়ে পুঁটলি বেঁধে জাহাজে ষ্টিমারে ওঠার কথা বলা হয়েছে। চিঁড়ে হল লোকখাদ্য। লেখকও মুদির দোকান থেকে চিঁড়ে কিনে বিছানার চাদরের এক কোণে বেঁধে ছিলেন। রামলোচন বাবুর মাটির দোয়াতে কলম ঠেকিয়ে লেখার কথা বলা হয়েছে। মাটির দোয়াত লোক শিল্পের নিদর্শন। একটি লোক বিশ্বাস বা folk belief এর নিদর্শন মিলছে। লেখকের আশ্রয়দাতার বড় ছেলে লেখককে বলেছে, 'মা বলে দিয়েছেন আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি শাপ দিলে আমার অনিষ্ট হইবে।' ব্রাহ্মণের অভিশাপে অনিষ্ট হয় এই হল লোক বিশ্বাস। লোক তৈজসের মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে থালা ও বাসন। লেখককে এই দুটি বাসন মাজতে হয়েছিল। একটি লোক পুরাণের উল্লেখ মিলছে। লেখক এক বিচিত্র দর্শন পাখীর সাক্ষাৎ পেলেন। চড়াইয়ের তুলনায় কিঞ্চিৎ বড়, গায়ের রঙ সবুজ, ঠোঁট বড় এবং লম্বা, স্বভাব অত্যন্ত চঞ্চল। ক্রমাগত সে টিরিরিন টিরিরিন করে ডাকছিল। এটির লেজে একটু নতুনত্ব ছিল। লেজের মধ্য দেশ থেকে প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা একটি সূচীর মত বাহির হইয়াছে। তার সঙ্গী বলল, 'শ্বশুর বাড়ি গিয়ে ছুঁচ চুরি করেছিলেন। তাতেই ঐ শাস্তি।'

'বানর রাজপুত্র' গল্পটি নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। রাজা অপুত্রক মুনির পরামর্শে বনের ধারে থাকা আম গাছ থেকে সাতটি আম পেড়ে রানীদের খাওয়ালেই তারা গর্ভবতী হবে। সেইমত রানীদের আম খাওয়ালে তারা গর্ভবতী হল এবং সন্তান প্রসব করে, বাদ গেল ছোট রানী। সে আম খেতে পায়নি তাই আমের ছালগুলি ধুয়ে বেটে খেয়েছে। তার হল এক বানর সন্তান। ছোটরানী বিতাড়িত হয়েছে। ছোটরানী তার বানর সন্তানকে মানুষ করেছে। ছয় রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়েছে পাত্রীর সন্ধানে, অনাহূত বানর রাজপুত্রও গেছে। শেষ পর্যন্ত সেই পরম সুন্দরী রাজকন্যার পানি গ্রহণ করেছে। বানর রাজপুত্রের খোলস পুড়িয়ে দেওয়া হল। ষড়যন্ত্রকারী ছয় রাজপুত্র বিতাড়িত হয়েছে।

এই গল্পে অনেকগুলি মটিফের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। টাইপ পশু স্বামী ৫৫২; বিজয়ী কনিষ্ঠপুত্র এল ১০, প্রিয় কনিষ্ঠ পুত্র এল ১২, তাকানো বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা সি ৩০০, বিশ্বাস ঘাতিনী সতীন কে ২২২২, আম খেয়ে গর্ভবতী হওয়া টি ৫১১.১.৩, কোনো কিছু খেয়ে গর্ভবতী হওয়া টি ৫১১, পাপের শাস্তি কিউ ২০০, কথা বলা বানর বি ২১১.২.১০, দিনে পশু রাতে মানুষ ডি ৬২১.১। জাদুমুক্ত করতে খোলস পুড়িয়ে ফেলা ডি ৭২১.৩, কথা বলা পশু বি ২১০।

'দুঃখীরাম' গল্পে একটি প্রবাদ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে, 'আকাশ ভেঙে পড়া'। লোক শিল্প মাদুরের উল্লেখ পাচ্ছি। লোকখাদ্য পায়েস, লোকতৈজস হাঁড়ি, লোক অস্ত্র লাঠি, লোকক্রীড়ার উপাদান তাসের উল্লেখ মিলছে। লোকযন্ত্র বা **folk tool** কুড়াল উল্লিখিত। দুঃখীরামকে বনে নির্বাসিত করার সময়ে রাজকর্মচারীরা তার সঙ্গে কুড়াল দিয়েছিল। দুঃখীরাম এই কুড়ালের সাহায্যেই সাপ কেটে টুকরোগুলি জলে ফেলে দিয়েছে। পক্ষীরাজ ঘোড়া এই গল্পের অন্যতম চরিত্র মটিফ বি ৪১.২ এবং কথাবলা ঘোড়া বি২ ১১.১.৩ সন্ধান লভ্য। লোকনেশা তামাক উল্লিখিত হয়েছে। ইচ্ছাপূরণ টাইপ ৭৫০ গল্পটিতে লভ্য। দুঃখীরাম সাহায্যপ্রাপ্ত বুড়ির বরে যা ইচ্ছা করেছে তাই লাভ করেছে। অর্থাৎ টাইপ ইচ্ছাপূরণ ৭৫০। দুঃখীরাম ইচ্ছা করায় রাজ আহার্য, উল্লিখিত হয়েছে। দুঃখীরামের ইচ্ছামত রাজা ও মন্ত্রী জহ্লাদ হয়ে গেছে। দুঃখীরাম শেষ পর্যন্ত রাজা হয়েছে এবং রাজকন্যাকে বিবাহ করেছে।

'ঠার্কুদা' গল্পে পাচ্ছি লোক তৈজসের মধ্যে জালা। ঠাকুরমার তিন জালা টাকা পোঁতা ছিল। লোক প্রযুক্তি ও নেশার মধ্যে হুঁকার উল্লেখ করা যায়।

'ঠানদিদির বিক্রম' গল্পে লোক প্রযুক্তি বাটনা বাটার শিল উল্লিখিত। লোক যন্ত্রের

মধ্যে ছিপের উল্লেখ দেখি। তাছাড়া চোরদের ব্যবহার্য সিদকাটিও উল্লিখিত হয়েছে। একটি প্রবাদ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে, চোরে কামারে কখনও দেখা হয় না। কলসী এই লোকতৈজসটিও উল্লিখিত হয়েছে।

'ঘ্যাঁঘাসুর' একটি বিখ্যাত গল্প। অসুস্থ রাজকন্যা। সন্ন্যাসীর নিদান কমলালেবু খেলেই সে নিরাময় হবে। যদু, গোষ্ঠ, মানিক সব ঝুড়ি করে কমলালেবু নিয়ে রাজবাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করেছে। পথিমধ্যে তাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে এক হাত লম্বা এক ব্যক্তির সঙ্গে। লোকটি জানতে চেয়েছে ঝুড়িতে কী আছে। যদু, গোষ্ঠ সব মিথ্যা বলেছে। কেউ বলেছে ঝুড়িতে ব্যাঙ আছে। কেউ বলেছে, ঝুড়িতে আছে ঝিঙের বীচি। খর্বাকৃতির লোকটি বলেছে 'তাই হোক'। সত্যি সত্যিই ঝুড়ির সব লেবু ব্যাঙ অথবা ঝিঙের বীচিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সত্যকথা বলেছে মানিক। তাই তার ঝুড়ির লেবু পরিবর্তিত হয়নি। বোকা মানিকের আনা লেবু খেয়ে নিরাময় লাভ করেছে, রাজকন্যা। রাজা ঘোষণা করেছিলেন যে রাজকন্যাকে সারিয়ে তুলবে, তারই সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দেবেন। রাজা কিন্তু তাঁর কথা রাখলেন না। নতুন শর্ত দিলেন। বললেন এমন কে নৌকা গড়ে দিতে হবে যা নাকি সমানভাবে জলেও চলবে, ডাঙ্গাতেও চলবে। কাজে লেগে গেল সব। যদুর কাছে একহাতী মানুষটি যখন জানতে চাইল সে কী করছে, যদু মিথ্যা করে বলল গামলা তৈরি করছে। সত্যি সত্যিই তার নৌকা গড়া হল না গামলা তৈরি হল। একই ভাবে গোষ্ঠ জানাল সে লাঙল তৈরি করছে। তারও নৌকা গড়া হলনা, লাঙল তৈরি হল। মানিক বোকা হলেও সত্যি বলেছিল তাই সে নৌকা গড়ে রাজার শর্ত পূরণ করল। কিন্তু এতেও রাজা, রাজকন্যার সঙ্গে তার বিবাহ দিলেন না। নতুন শর্ত দিলেন ঘ্যাঁঘাসুরের লেজের পালখ এনে দিলে তবেই বিবাহ হবে। অগত্যা মানিক চলল তার সন্ধানে। লেখক ঘ্যাঁঘাসুরের বর্ণনা দিয়েছেন—বিদঘুটে চেহারা, খিটখিটে মেজাজ। তবে খুব জ্ঞান, বেজায় ধনী, সোনার পুরীতে বাস। মানুষ খায়। পথে যেতে যেতে মানিক বিভিন্ন জনের সংস্পর্শে এল। কারো কন্যা অসুস্থ তার অসুখ কেমন করে নিরাময় হবে, কারো সিন্দুকের চাবি হারিয়েছে তার সন্ধানচাই, এক বৃদ্ধ নদী পারাপার করে মানুষকে কাঁধে নিয়ে, কবে তার কাজ থেকে রেহাই পাবে কেমন করে এসব সমস্যার সমাধান জানতে এবং ঘ্যাঁঘাসুরের লেজের পালখ সংগ্রহ করতে। চলল মানিক ঘেঁঘীর সহায়তায় সব কাজই সুসম্পন্ন করে ফিরে এল মানিক। যার যার সমস্যা ছিল তাদের সমাধান বাতলাল। রাজা শেষ পর্যন্ত মানিকের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দিলেন। নদী পারাপারকারী বৃদ্ধের স্থানাভিষিক্ত হলেন তিনি।

এই গল্পে অনেকগুলি টাইপ মটিফের সন্ধান মিলছে। যেমন বামনাকৃতি এল ৪৫১, অতি সাধারণ নায়ক রাজকন্যাকে বিবাহ করল এল ১৬১, অসাধ্য সাধন পরীক্ষা এইচ ৯০০, অসম্ভব কাজ এইচ ১০১০, শুধুমাত্র ছোটভাই অনুসন্ধানে সফল হয় এইচ ১২৪২, পুরস্কার হিসাবে রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ কিউ ১১২.৩

'বুদ্ধিমান চাকর', গল্পটিতে পাচ্ছি লোকতৈজস বাটির উল্লেখ লোকযান নৌকার প্রসঙ্গ, লোক নেশার দ্রব্য পানের প্রসঙ্গ।

'ঝানু চোর শানু' গল্পে দেখি শানু তার প্রখর বুদ্ধিমত্তায় সকলকে ঠকিয়েছে, চোরেদের এমন কী জমিদারকেও। শেষে বিবাহ করেছে জমিদার দুহিতাকে।

ছোট ভাই গল্পে বড় ছ'ভাই ছোটভাই রুরুকে পছন্দ করেনা। দেখা গেল সুন্দরী মেয়ে রবঙ্গাকে বিয়ে করতে গিয়ে অন্য মেয়েদের বিবাহ করে এসেছে। রুরুই বরঙ্গাকে বিবাহ করেছে। এখানে মিলছে বিজয়ী কনিষ্ঠপুত্রের মটিফটি এল ১০।

'কাজির বিচার' গল্পে ঢাক এই লোকবাদ্যটি উল্লিখিত। গল্পের দুটি চরিত্র রামকানাই ও ঝুটারাম। ঝুটারাম কেবল নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করে গেছে। ভালোমানুষ রামকানাই ঠকেছে।

'সাতমার পালোয়ান' গল্পটি খুবই উপভোগ্য। কেন্দ্রীয় চরিত্র কানাই। সে মাছি মারতে গিয়ে কাঁচা হাড়িগুলি ভেঙেছে। এক ঘায়ে সাত সাতটা মাছি মেরে সে শুরু করেছে। হম্বিতম্বি। নিজেকে পরিচয় দিয়েছে 'সাতমার পালোয়ান' বলে। পঞ্চাশ টাকা মাসিক বেতনে সে পালোয়ান নিযুক্ত হয়েছে রাজার কাছে। এই গল্পে বেশ কয়েকটি লোকজ উপাদানের সাক্ষাৎ পাই। যেমন কানাই গায়ে দিয়েছে পিরান, এটি লোক পরিচ্ছদ। কানাইয়ের হাতে লাঠি আর ঢাল এগুলি লোক অস্ত্র। লোকখাদ্য চিঁড়ে আর ঝোলা গুড়ও উল্লিখিত হয়েছে। লোক তৈজসের মধ্যে মাটির 'হাঁড়ি' পাচ্ছি। ঝাঁটাও উল্লিখিত হয়েছে, এটিকে লোক শিল্পের নিদর্শন বলে অভিহিত করা যায়। এই গল্পের বুড়ী ভয় দেখিয়েছে তার নাতনীকে ট্যাঁপায় নেবে। বুড়ীর বাড়ির পিছনে লুকিয়ে থাকা বাঘ ট্যাঁপার নামে ভীত হয়। কানাই ঘোড়া ভেবে বাঘের পিঠে চড়ে বসে। কোমরের কাপড় দিয়ে বাঘের গলায় বাঁধল। বাঘ ভাবল ট্যাঁপা তাকে ধরেছে। বাঘকে কানাই ঘরে বন্দী করে ঘুমাতে গেল। রাজাকে কানাই জানাল বাঘকে সে মারেনি কারণ সে সংখ্যায় যে একটি। যে এক ঘায়ে সাতটাকে মারতে অভ্যস্ত। রাজা কানাইয়ের বেতন করে দিলেন পাঁচশ টাকা। বিদেশী রাজা রাজ্য আক্রমণ করলে কানাই পালোয়ানের উপর ভার পড়ল দেশ রক্ষার। যুদ্ধের ঘোড়া তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে টেনে নিয়ে গেল কানাইয়ের

চরম অনীহা সত্ত্বেও। কানাই যাবার সময় পথিমধ্যে গাছপালা যা পেয়েছিল আঁকড়ে ধরেছিল। ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে সে হাজির হল গাছপালা সহ। খড়ের গাদাও বাদ যায়নি। প্রতিপক্ষের সৈন্যরা কানাইয়ের এই চেহারা দেখেই ভয়ে পালাল। রাজাকে বন্দী করে কানাই তার রাজাকে উপহার দিল। অর্ধেক রাজত্ব পেয়ে কানাই সুখে রাজ করতে থাকল। এই গল্পে দুটি মটিফের সন্ধান মিলেছে—বাঘ মানুষকে বহন করে বি ৫৫৭, পুরস্কার রূপে অর্ধেক রাজত্ব কিউ ১১২।

'কুঁজো আর ভূত' গল্পে ভূতেরা কানাইয়ের গান শুনে এত খুশি হয়েছে যে তারা তার পিঠের কুঁজ সারিয়ে দিয়েছে। তার দেখাদেখি মানিক গিয়েছে ভূতেদের কাছে কিন্তু তার বেসুরো বেতালা গান শুনে ভূতেরা কানাইয়ের কুঁজ তার পিঠে জুড়ে দিয়েছে। গল্পটিতে যে মটিফটির সন্ধান মিলছে তা হল লোভের শাস্তি কিউ ২৭৬, বিশ্ববিশ্রুত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের সুবাদে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' আমাদের সকলের পরিচিত। এই গল্পটি কিন্তু উপেন্দ্রকিশোরের। সত্যজিৎ তাঁর পিতামহের গল্পকে উপজীব্য করেছিলেন। ভূতেরা গুপী ও বাঘার গান বাজনা শুনে খুব খুশি হল। তারা এদের দু' জোড়া জুতো দিল যা পায়ে দিয়ে যেখানে খুশি যাওয়া যায়। একটি থলেদিল যার থেকে ইচ্ছামত খাবার মিলবে। আর তাদের গান সকলকে প্রীত করবে। কেউ গান শোনা ছেড়ে অন্যত্র নড়তে পর্যন্ত পারবেনা। গুপী ও বাঘা ভাল মন্দ খেতে পেল, উত্তম পোশাক পেল। আক্রমণকারী শুণ্ডী রাজকে আকাশ পথে নিয়ে আসে তারা। হল্লা রাজার জামাই বনে গেল দুজনে। এই গল্পে পাচ্ছি ঢোলকের মত লোক বাদ্যের উল্লেখ, খেয়ার মত লোকযান, শূলের মত লোক মারণাস্ত্র, মুকুটের মত লোক আভরণ তাছাড়া হার, কুন্ডল, বালা ত আছেই।

এবারের এই গল্পের মটিফগুলির সন্ধান করা যাক। প্রথমেই টাইপগুলির উল্লেখ করি ইচ্ছার সফল পরিণতি ৪০৩ক, ইচ্ছাপূরণ ৭৫০, ভাগ্যের অন্বেষণে যাত্রা টাইপ ৪৬০, লোভনীয় প্রাপ্তি টাইপ ১৬৪২ এবারে মটিফের প্রসঙ্গ ঃ

হাঁড়ির মধ্যে অফুরন্ত খাদ্য ডি ১৪৭২. ১.১২.১, পুরস্কার স্বরূপ রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে কিউ ১১২.৩ আকাশপথে যাত্রা এফ ১১, অতি সাধারণ নায়ক রাজকন্যাকে বিবাহ করে এল ১৬১। 'লাল সুতো আর নীল সুতো' জোলার গল্প। জোলার পেট থেকে লাল সুতো আর নীল সুতো বের হলে তার মৃত্যু হবে বলে বলা হয়েছিল। একদিন সেই লাল সুতো নীল সুতো বের হল দেখে জোলা ভাবল তার মৃত্যু ঘটেছে। পোড়ালে তার হবে কষ্ট তাই পোড়ানোয় জোলা রাজি হল না। শেষে তাকে গোর

দেওয়া হল, মুখটা মাটির ওপরে রেখে। চোরেদের পাল্লায় পড়ে জোলাও বের হল চুরি করতে। রাজার মুকুট চুরি করতে গিয়ে রাজাকে মৃত ভেবে সে তার কিভাবে মৃত্যু হয়েছে জানতে চাইলে জোলা সমেত সব চোর ধরা পড়ে গেল।

এই গল্পে লোক খাদ্য পায়েসের উল্লেখ মিলছে। লোক আভরণ মুকুটও উল্লিখিত। বোকা জোলা জে ১৭০৫.৩ মটিফ যুক্ত।

'দুষ্ট দানব' গল্পে পাচ্ছি লোক যন্ত্র কাস্তে, লোক প্রযুক্তি হুঁকোর উল্লেখ। 'জোলা আর সাতভূত' গল্পটি খুবই উপভোগ্য। এই গল্পে জোলা তার মাকে বলেছে সে পিঠে খাবে। সে পিঠে খেতে খুব ভালবাসত। জোলা বলেছে, একটা খাব দুটো খাব সাত বেটাকে চিবিয়ে খাব। ভূতেরা তার কথায় ভীত হয়েছে। ভূতেরা জোলাকে একটা হাঁড়ি দিয়েছে। জোলার যখন যা ইচ্ছা হবে খেতে হাঁড়ি থেকেই তা মিলবে। ভূতেরা তাকে একটা ছাগ ও দিয়েছে। সেটাকে সুড়সুড়ি দিলে হাসে আর মুখ দিয়ে মোহর বের হয়। জোলার বন্ধু জোলার হাঁড়ি ও ছাগল চুরি করে নিয়েছে। ভূতেরা এরপর জোলাকে একটা লাঠি দিয়েছে, তাকে বলতে হবে লাগ লাঠি লাগ তো। লাঠির ঘা খেয়ে জোলার বন্ধু চুরি করা হাঁড়ি ও ছাগল ফেরৎ দিতে বাধ্য হয়েছে। লাঠির জোরে জোলা অক্রমণ কারী রাজার সৈন্যদের পর্যুদস্ত করেছে। বিনিময়ে সে পেয়েছে অর্ধেক রাজত্ব। রাজকন্যার সঙ্গে তার বিবাহও হয়েছে।

এই গল্পে লোকখাদ্য পিঠের প্রসঙ্গ পাচ্ছি। হাঁড়ি লোক তৈজসের নিদর্শন। লোকখাদ্যের মধ্যে আরও পাচ্ছি মালপুয়া, সরভাজা, গজা, মতিচুর-অমৃতি, জিলাপি, বরফি প্রভৃতির উল্লেখ। এই গল্পে অনেকগুলি মটিফ মিলছে। মিলছে টাইপের সন্ধানও। টাইপের মধ্যে পাচ্ছি লোভের শাস্তি কিউ ৫৫১.২.৮.১ এবং গরীব জোলা নায়ক এল ১১৩.৩। মটিফগুলি হল চাতুর্য ও প্রতারণা টাইপ ১৫৩৯। অতি সাধারণ নায়ক রাজকন্যাকে বিবাহ করে এল ১৬১ মটিফটিও উল্লেখ্য। অপহৃত হাঁড়ি টাইপ ৫৯১। হাঁড়ির মধ্য থেকে অফুরন্ত খাবার আসে ডি ১৪৭২.১.১২.১ মটিফও উল্লেখ্য। ভূত বোকা বনে যায় কে ১৭১০।

'ফিঙে আর কুঁকড়ো' গল্পে দেখি ঊনা লোকের বাড়ি থেকে ভাঙা দা, কুড়ুল, কাস্তে, কোদাল, হাতুড়ি এইসব জোগাড় করেছে। এগুলি সব Material Folklore এর অন্তর্গত। লোক যন্ত্রাদির নিদর্শন। ফিঙে কাঁথা চাপা দিয়ে শুয়েছিল। কাঁথা লোক শিল্পের নিদর্শন। কুঁকড়োকে পিঠে খেতে দেওয়া হয়েছিল। পিঠে লোকখাদ্য।

এবারে উপেন্দ্রকিশোরের অমর কীর্তি 'টুনটুনির বই'য়ের গল্পগুলির প্রসঙ্গ। 'টুনটুনি

আর বিড়ালের কথা' গল্পটিতে বলা হয়েছে ছোট্ট টুনটুনির বাসা বেগুন গাছে। তার তিনি তিনটি ছানা। গৃহস্থের দুষ্ট বিড়ালের লোভ ছানাগুলিতে। তাই টুনটুনি বিড়ালের সঙ্গে সংঘাতে যায় না। বিড়ালকে দেখা মাত্র তাকে প্রণাম জানায় 'মহারাণী' বলে সম্বোধন করে। ছানারা ক্রমে বড় হল। উড়তে শিখল। উড়ে গিয়ে বসল তালগাছে। টুনটুনি নিশ্চিন্ত হল আর বিড়াল তার ছানাদের ক্ষতি করতে পারবেনা। তাই বিড়ালকে দেখে গালি দিল, দূরহ লক্ষ্মীছাড়া বিড়ালনি। এটির টাইপ ২৪৮ক। কয়েকটি মটিফও মিলছে। কথাবলা টুনটুনি talking bird বি ২১১.৩.৭, কথাবলা বেড়াল talking cat বি ২১১.৪, ঠিক সময়ে প্রতারণা কে ১৮৬০.২, প্রথমে প্রণাম জানানো কে ১৭৬।

'টুনটুনি আর নাপিতের কথা' গল্পে দেখি টুনটুনি ফোঁড়া কাটাতে নাপিতের কাছে গেলে নাপিত রাজি হয় না। তখন সে একে একে রাজা, বেড়াল, লাঠি, আগুন, সাগর, হাতি, মশার শরণাপন্ন হল। মশা হাতিকে কামড়াতেই যে যার কর্তব্য সমাধা করল। নাপিতও শেষমেশ টুনটুনির ফোঁড়া কেটে দিল। এই গল্পটির টাইপ হল ৭৫। যে মটিফগুল গল্পটিতে লভ্য সেগুলি হল কথাবলা ইঁদুর talking mouse বি ২১১.২.৮, কথাবলা হাতি talking elephant বি ২১১.৪, অন্যকে শাস্তি দানের ভার এইচ ১১৯৪.৫, অনিচ্ছুক নাপিত কে ২২৫৩.১।

'চড়াই আর কাকের কথা' গল্পে বলা হয়েছে কাক ও চড়াই লঙ্কা ও ধান খাবার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ঠিক হয়েছে যে আগে খাওয়া শেষ করবে সে বিজিতের বুক খুঁড়ে খাবে। কাক আগে খাওয়া শেষ করল। চড়াইয়ের বুক খুঁড়ে খাবে সে। চড়াই বলল কাক আগে তার ঠোঁট ধুয়ে নিক। গঙ্গা জল দিল না। ঘটি আনতে বলল। কুমোর ঘটি বানাবার জন্য মাটি আনতে বলল। মাটি তোলার জন্য শিং চাই কিন্তু মোষ শিং দিল না। মোষের তাড়ায় কাক কুকুরের কাছে হাজির হল। কুকুর দুধ আনতে বলল। গরু ঘাস চাইল। মাঠ বলল ঘাস নিয়ে যাও কিন্তু কাটার জন্য যে কাস্তের প্রয়োজন। কামার কাস্তে গড়ে দেবে কিন্তু আগুন কই? গৃহস্থ কাকের পাখার উপর আগুন ঢেলে দিলে তাতেই কাক মারা গেল। গল্পটির টাইপ ২০৩০খ। গল্পের মটিফগুলি হল কাকের মৃত্যু জেড ৩১.২.৩, অপরিণাম দর্শিতা জে ২১৬০, বোকা ব্যক্তিগত ক্ষতির পরোয়া করেনা জে ২১৩০, আগে কে খাবে তার পরীক্ষা কে ৮১.৩।

'নরহরি দাস' গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র একটি ছাগল ছানা। ষাঁড়ের সঙ্গে সে গিয়েছিল বহুদূরের মাঠে ঘাস খেতে। প্রচুর ঘাস খেয়ে আর তার নড়াচড়ার ক্ষমতা রইল না। একটি গর্তে সে আশ্রয় নিল। গর্তটি ছিল একটি শৃগালের। গভীর রাতে

শিয়াল তার গর্তে ঢুকতে গিয়ে, কালো মতন কিছু একটা দেখতে পেল। সে ভয় পেল। ছাগল ছানা বলে ওঠে, 'পঞ্চাশ বাঘে মোর এক এক গ্রাস। শৃগাল শরণ নিল বাঘের। ছাগল ছানা চেঁচিয়ে ওঠে এই একটা বাঘে তার কি হবে? ভীত বাঘ পালিয়ে বাঁচল।

বন্য পশু অপরিচিত পশু দেখে ভয়ে পালিয়েছে, এটির টাইপ ১০৩। মটিফগুলির মধ্যে পাচ্ছি কথা বলা গরু talking Cow বি ২১১.১.৫, বাঘের লেজে অন্য পশু নিজের লেজ বেঁধে আহত হয়েছে জে ২১৩২.৫.২, অনুসন্ধানে সাহায্যকারী এইচ ১২৩৩।

'বাঘের উপর টাগ' গল্পে দেখি এক জোলার ছেলে ঘোড়ার জন্য বায়না ধরেছে। পাঁচটি টাকা নিয়ে জোলা হাটে গেল ঘোড়ার সন্ধানে। এক চতুর ব্যক্তি জোলাকে পাঁচ টাকার বিনিময়ে একটি ঘোড়ার ডিম বেচল। আসলে এটি ছিল একটি ফুটি। নদীর ধারে ফুটিটি রেখে জোলা গেল জল খেতে। একটা শেয়াল সেই সুযোগে ফুটিটা খেয়ে পালাল। জোলা ভাবল ডিম থেকে ঘোড়ার বাচ্চা বেরিয়ে পালাচ্ছে। জোলা অনেক চেষ্টা করেও ঘোড়ার বাচ্চার সন্ধান পেল না। এক বুড়ির গৃহে সে রাতের আশ্রয় নিয়েছে। একটি বাঘ এসেছিল, অন্ধকারে জোলা ভাবল সেটিই ঘোড়ার বাচ্চা। যেমন ভাবা সাথে সাথে তার পিঠে চড়ে বসা/বাঘের গলায় যে কাপড় জড়িয়ে ধরল। পরে অবশ্য বুঝতে পারল যার ওপর সে বসেছে সেটা একটি বাঘ। একটি গাছের ডাল ধরে গাছে উঠে জোলা তার প্রাণ বাঁচাল। এ গল্পের টাইপ হল ১৩১৯, ঘোড়া বা গাধার ডিমের বদলে ফুটি বিক্রি করা। মোটিফ গুলির মধ্যে রয়েছে।

বাঘ বি ২৪০.৫, ফুটিকে ঘোড়ার ডিম ভাবা কে ১৭৭২.১, ভুল বুঝে বেঠিক কাজ করে বসা জে ১৮২০, বাঘ মানুষকে বহন করে বি ৫৫৭.৩। 'দুষ্ট বাঘ' গল্পটিতে বর্ণিত হয়েছে খাঁচার বন্দী একটি বাঘকে তার কাতর অনুরোধে এক বামুন ঠাকুর খুলে দিয়েছে। বাঘ বাইরে এসই বামুনকে খেতে চাইল। চাষী, বটগাছ সকলেই তাদের সাক্ষ্যে বললে বাঘের ভূমিকা ঠিক, ভাল করলে মন্দ করাই কর্তব্য। শেষে একটি শৃগাল এসে কিছু না বোঝার ভান করে বাঘটিকে খাঁচায় ঢোকালো তারপর তার দরজাটি বন্ধ করে বামুনকে বাঁচিয়ে দিল। এ গল্পের টাইপ হল ১৫৫ক, অকৃতজ্ঞ বাঘ ফের বন্দী হল। মটিফগুলি হল ফাঁদে ফেলে বন্দী করা কে ৭৩৫, বোকা ব্রাহ্মণ জে ১৭০৫.২, মানুষের জন্য পশু কাজ করে বি ৫৭১। বোকা জোলা আর শিয়ালের কথায় এক জোলা গরম কাস্তে হাতে নিয়ে তার জ্বর হয়েছে ভেবে জলে ডুবিয়ে ঠাণ্ডা করেছে। তার মার খুব জ্বর হলে সে একইভাবে তাকে পুকুরে ডুবিয়ে জ্বর নিরাময় করতে গিয়ে মেরে ফেলেছে।

এক শিয়াল জোলাকে ভোলাতে বলেছে তার সাথে রাজকন্যার বিয়ে দেবে। জোলার সম্পর্কে মিথ্যা বলে সত্য সত্যই রাজকন্যার সাথে জোলার বিয়ে দিয়েছে। জোলার বোকামির শেষ নেই। নানা বোকামি তার লেগেই থাকল। বুদ্ধিমতী রাজকন্যা বোকা বরের কথা কিন্তু কাউকে জানাল না। এ গল্পটির টাইপ হল বোকা জামাই ১৬৮৫।

অনেকগুলি মটিফের সমৃদ্ধ গল্পটি। মটিফগুলি হল—

অতি সাধারণ নায়ক বিবাহ করেছে, রাজকন্যাকে এল ১৬১, গরীব জোলা নায়ক এল ১১৩.৩, বোকা জোলা কে ১৭০৫.৩, বুদ্ধিমতী বউ জে ১১১২, মানুষের জন্য পশু কাজ করে বি, ৫৭১, বরের মিথ্যা পরিচয় কে ১৯১১.১। 'বুদ্ধুর বাপ' গল্পে লোক প্রযুক্তি ঠকঠকির উল্লেখ পাচ্ছি, ঠকঠকি বাবুই তাড়াবার যন্ত্র। বুদ্ধুর বাপ মুগুর চেয়েছে, মুগুর একটি লোক যন্ত্রের নিদর্শন। খই ওয়ালারা খই নিয়ে পথ চল ছিল। খই লোক খাদ্য। বাঘ মার খেয়ে বুদ্ধুর বাপকে বলেছে, পাজি হতভাগা, লক্ষ্মী ছাড়া—এগুলি সব লোক গালাগালি। গল্পে বলা হয়েছে তেঁতুল গাছে হাঁড়ি বেঁধে রাখার কথা। হাঁড়ি অন্যতম লোক তৈজস।

'বাঘ মামা আর শিয়াল ভাগ্নে' গল্পে লোকযান নৌকার উল্লেখ পাচ্ছি। মাদুর এই লোকশিল্পটিও উল্লিখিত হয়েছে। এই গল্পে বুদ্ধিমান শেয়াল এই মোটিফটির সাক্ষাৎ মিলছে বি ১২০.২, বুদ্ধিমান পশু বি ১২০ এটিও লভ্য। 'বোকা জোলা আর শিয়ালের' গল্পে লোকখাদ্য মুড়ি মুড়কি, লোকযন্ত্র কাস্তে, লোক তৈজস থালা, বাটি ইত্যাদি উল্লিখিত। বুদ্ধিমান শেয়াল বি ১২০.২, কা জোলা জে ১৭০৫.৩ মোটিফগুলি গল্পটিতে লভ্য।

'উকুনে বুড়ির কথা'য় বুড়ি ভাতের হাঁড়ি ভেঙ্গেছে বলা হয়েছে। হাঁড়ি অন্যতম লোকতৈজস তাছাড়া থানা এই লোকতৈজসেরও উল্লেখ মিলছে। লোকশিল্পের মধ্যে পিঁড়ি, কুলো, তক্তাপোশ উল্লিখিত হয়েছে। লাঠি লোক অস্ত্রের নিদর্শন।

'বাঘের পালকি চড়া' গল্পে লোকযান পালকি উল্লিখিত। এই গল্পে শিয়াল বুদ্ধিমান জীব আর বাঘ বোকা প্রাণী রূপে উপস্থাপিত। বুদ্ধিমান পশু মোটিফটি হল বি ১২০, আর বুদ্ধিমান শেয়ালের মোটিফটি হল বি ১২০.২। শিয়াল ও বাঘ দুজনেই কথা বলেছে অর্থাৎ talking tiger এবং talking fox, মোটিফটি হল বি ২১০। বাঘ বি ২৪০.৫। 'পান্তাবুড়ির কথা' গল্পটিও খুব উপভোগ্য। এক পান্তাবুড়ীর পান্তাভাত রোজ চোরে চুরি করে খেয়ে যায়। রাজার কাছে বুড়ি গেল নালিশ জানাতে। পথিমধ্যে সে পেল একটা শিঙিমাছ, বেল, গোবর এবং একটা খুর। চোর পান্তা চুরি করার জন্য হাঁড়ির মধ্যে হাত ঢোকালে শিঙি মাছের কাঁটা খেল। উনানের কাছে যেতে বেল ফাটল। চোরের চোখে

মুখে লাগল। দরজা দিয়ে বের হবার সময়ে গোবরে পা পিছলে পড়ল। ঘাসে পা মুছতে গেলে ক্ষুরে তার পা কাটল। অর্থাৎ চোরের উপযুক্ত শাস্তি লাভ ঘটল। পান্তাভাত লোক খাদ্য। ক্ষুর একটি লোক যন্ত্র। গল্পটির টাইপ ২১০ক, শিঙি, বেল, গোবর ও ক্ষুর। এই গল্পের মোটিফগুলি হল উপকারী মাছ বি ৪৭০, চোর কে ৩০১.১, ফাঁদে ফেলে বন্দীকরা কে ৭৩৫, কথাবলা ফল এফ ৮১৪.৩, পশু মানুষের জন্য কাজ করে বি ৫৭১। লোককথায় শিয়াল সর্বদাই চালাক, চতুর, ধূর্ত রূপে উপস্থিত অন্যদিকে বাঘ ও কুমির বোকা, নির্বোধ রূপে চিত্রিত হয়েছে। আসলে মানুষ বাঘ ও কুমিরের দ্বারা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বহু মানুষের জীবন হানি ঘটে এ দুই জীবের কারণে। তাই লোককথায় মানুষ তাদের সর্বদাই পর্যুদস্ত করে প্রতিশোধ নিয়েছে। পশুকথায় অবিমিশ্র পশু চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে, আবার মনুষ্যেতর প্রাণী সাথে মানুষও উপস্থাপিত হয়েছে। মজার কথা হল মনুষ্যেতর প্রাণী দিব্যি মানুষের কথা বোঝে, মানুষও মনুষ্যেতর প্রাণীর সঙ্গে communicate করতে অসুবিধা বোধ করেনা। মনুষ্যেতর প্রাণীরা মানুষের মত অনেক সময় আচরণ করে। তাদের পিঠে খাওয়ার সাধ হয়, পাল্কী চড়ে বিবাহ করতে যেতে মনস্থ করে। সন্তানাদিকে পাঠশালায় পাঠায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য। এমনকী মানুষের কন্যাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণেও প্রবুদ্ধ হয়। মানুষের মত মনুষ্যেতর প্রাণী অর্থ সঞ্চয়ে এগিয়ে আসে। রাজত্ব করতে অভিলাষী হয়। 'শিয়াল পণ্ডিত' গল্পে মূর্খ কুমির তার সাত সাতটি শাবককে শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালায় পাঠিয়ে শিক্ষিত করে তুলতে চাইল। শিয়ালও কুমির শাববদের পাঠদানে সম্মত হল। কিন্তু একে একে সে শাবকগুলিকে খেয়ে ফেলল। কুমির যখন সমস্ত ব্যাপারটি জানতে পারল তখন বিশ্বাসঘাতক শিয়ালকে উচিতমত শিক্ষা দিতে চাইল। কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও বেচারা কুমির সফল হল না। এই গল্পটির টাইপ ৫, পা কামড়ে ধরা। মোটিফের সংখ্যা বেশি নয় তাই বলে মোটিফশূন্য নয়। মিথ্যা ওজুহাত দেখিয়ে পালানো কে ৫৫০, কুমির শাবকদের পাঠদানের দায়িত্ব নিয়ে তাদের শেয়ালের খেয়ে ফেলা কে ৯৩১.১, কিংবা মড়ার ভান করে ধরার চেষ্টা কে ৭৫১ এগুলি গল্পটিতে লভ্য। সর্বোপরি বুদ্ধিমান শেয়াল বি ১২০.২ মোটিফটিও লভ্য। কুমিরের নদীর চড়ায় মড়ার ভান করে পড়ে থাকা, উদ্দেশ্য শিয়ালকে জব্দ করা কে ৭৫১.৬ মোটিফটিও লভ্য।

'টুনটুনির বই'য়ে সংকলিত গল্পের সংখ্যা ২৬। অবিমিশ্র মনুষ্যেতর প্রাণী স্থান পেয়েছে ১৭টি গল্পে। মানুষের মধ্যে স্থান পেয়েছে রাজা, ব্রাহ্মণ, নাপিত, চাষা, বুড়ী গৃহস্থ প্রভৃতি। মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে পাই শিয়াল, বাঘ, হাতী, বিড়াল, ভাল্লুক, ষাঁড়,

ছাগল ছানা, কুমির। তাছাড়া কাক, চড়ুই, টুনটুনি, পিঁপড়ে এরাও চরিত্ররূপে এসেছে। শিয়াল স্থান পেয়েছে ১৪টি গল্পে, বাঘ স্থান পেয়েছে ১১টি গল্পে, হাতী স্থান পেয়েছে ৩টি গল্পে। বিড়াল ও কুমীর যথাক্রমে ২টি করে গল্পে। শিশুদের জন্য এমন নিবেদিত চিত্ত লেখক সচরাচর দেখা যায় না। গল্প, নাটক, বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ, ভৌগোলিক বৃত্তান্ত, মহৎ জীবন কথা, বিদেশী কাহিনীর অনুবাদ সর্বত্রই তাঁর অবাধ পদচারণা ঘটেছে। 'টুনটুনির বই'য়ের গল্পগুলিতে প্রাধান্য পেয়েছে 'প্রমোদ রস'। মৈমনসিংহ থেকে উপেন্দ্রকিশোর তাঁর পশুকথাগুলি সংগ্রহ করেছিলেন কিন্তু মৈমনসিংহের প্রাদেশিক রূপটি ভাষার ক্ষেত্রে রক্ষা করেননি সর্বজন বোধ্য করার অভিপ্রায়ে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন ঃ 'উপকথা বলিবার যে ভাষাটি আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, ইহার মধ্যে সেই ভাষাই তিনি ব্যবহার করিয়াছে'।

উপেন্দ্রকিশোরের পুরী ভ্রমণকথা

জয়গোপাল মণ্ডল

আলোচনার ফাঁকে কিংবা পাঠকের চোখে অনেক সৃষ্টি উপেক্ষিত থাকে। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ভ্রমণকথা তাই 'বিবিধ প্রবন্ধে'র অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এখানেই শেষ নয়। যাঁরা ভ্রমণকথাকে ভ্রমণ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করে বিস্তৃত পাঠ বিশ্লেষণ রচনা করেন, তাঁদের তালিকায়ও উপেন্দ্রকিশোরের সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ উপলব্ধির অসাধারণ অবলোকন ও আত্মানুভূতির ঠাঁই হয়নি। 'সাহিত্যসন্দর্শন'-এ শ্রীশচন্দ্র দাশ লিখেছেন, "বাংলায় যে কয়েকটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত আছে, তন্মধ্যে দুর্গাচরণ রায়ের 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' নামক বইখানা গল্পে-মাধুর্য্যে, হাস্যরসে ও তথ্য পরিবেশনে অপূর্ব্ব। এতদ্ব্যতীত সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ', রবীন্দ্রনাথের 'জাপান পারস্যে', 'যাত্রী', 'রাশিয়ার চিঠি', জলধর সেনের 'হিমালয়', প্রবোধকুমার সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে', 'দেবাত্মা হিমালয়', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে প্রবাসে', বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের 'দুয়ার হতে অদূরে', 'কুশী প্রাঙ্গনের চিঠি', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তৃণাঙ্কুর', ইন্দু মল্লিকের 'চীন ভ্রমণ', সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাপান' উল্লেখযোগ্য।" একালের লেখক শুভঙ্কর ঘোষও 'সাহিত্যের রূপভেদ' গ্রন্থে বিশ্ব পথিক রবীন্দ্রনাথকে উল্লেখ করে বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন সেখানেও উপেন্দ্রনাথের পুরী ভ্রমণ কিংবা 'মেঘের মুলুক' দার্জিলিং ভ্রমণের কথা জায়গা পায়নি—শ্রীশচন্দ্র দাশ কথিত বক্তব্যের সঙ্গে কেবল কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চীনযাত্রী', অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'নদীপথে' সংযোজিত হয়েছে। শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোরের 'পুরী', 'আবার পুরীতে', 'মেঘের মুলুক' প্রবন্ধ তিনটিতে ভ্রমণ সাহিত্যের অপূর্ব স্বাদ পাওয়া যেতে পারে। তাঁর দেখা যেন অন্য দেখা।

"সাহিত্যের যে ধারায় একস্থান থেকে অন্যস্থানে ভ্রমণের ক্রমান্বয়ী বিবরণ, যানবাহনের যোগাযোগ, ভৌগোলিক পরিবেশ পরিস্থিতির বিশেষত্ব সমূহের বিবরণ, পরিবেশ ভেদে লোকজনের জীবনযাত্রা, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা বিশেষ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনা, লোকাচার, সভ্যতা সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক বিশেষত্ব বা সৌন্দর্যের বর্ণনা বা লেখকের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার অকপট উৎসার লক্ষ্য করা যায়—তাকেই ভ্রমণ সাহিত্য বলে।" (সাহিত্যের রূপভেদ/শুভঙ্কর ঘোষ)। প্রচলিত এই সংস্কার আলোকে দেখলে উপেন্দ্র কিশোরের উল্লেখিত প্রবন্ধগুলিতেও ভ্রমণ সাহিত্যের সার্থকতাও পাওয়া যায়। বরং কখনও চমকও লক্ষিত হয়। অবশ্য 'পুরী' প্রবন্ধের সূচনা যেন প্রাবন্ধিকের। পুরী যাত্রার যে সুবিধা ক্রমান্বয়ে তৈরি হয়েছে—তা দিয়েই শুরু।

শব্দচয়নে ও বর্ণনার ভঙ্গিতে লেখনের মুন্সীয়ানা পাঠকের অন্তরে জায়গা করে নেয়—"আজকাল রেল হইয়া পুরী যাইবার বেশ সুবিধা হইয়াছে, তাই এখন অনেকেই শখ করিয়া সেখানে গিয়া থাকেন। যাইবার পথটি বেশ। অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর নদী পার হইতে হয়। আর বালেশ্বর ছাড়াইলে পথের দুধারে অনেক পাহাড়ও দেখা যায়। নদীগুলির এক একটা খুব চওড়া, তাহার উপর বড়বড় পোল আছে। পার হইবার সময় দু-একটা কুমীরও যে না দেখা যায়, এমন নহে।" এমন আটপৌরে ভাষায় আত্মোপলব্ধির বর্ণনা সেসময় বাংলা সাহিত্যের ধারায় অন্য মাত্রা দান করেছিল। লেখকের বর্ণনা থেকে পুরী যাত্রায় রেল যোগাযোগের সময়টা ধরা পড়ে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে খড়গপুর পুরী রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়। লেখকের অভিজ্ঞতায় বর্ণিত হয়েছে এই যাত্রাপথের সৌন্দর্য, প্রকৃতির বৈচিত্র্য ঃ "রাত্রিতে হাবড়া স্টেশন হইতে রওয়ানা হইয়া সকালে বালেশ্বরে গিয়া যখন ঘুম ভাঙ্গে তখন বেশ বুঝা যায় যে, একটা নূতন স্থানে আসা গিয়াছে। স্টেশনের নামে আর বাঙ্গালা অক্ষর নাই, তাহার স্থানে ওড়িয়া ভাষা হইয়াছে। আমরা যেমন করিয়া বাঙ্গালা আর দেবনাগর অক্ষরে মাত্রা দিই, ওড়িয়া অক্ষরের মাত্রা তেমন করিয়া দেওয়া হয় না। সোজা কসিটির বদলে তাহাতে পুটলি পাকাইয়া আনিতে হয়; আসল অক্ষরটি তলায় পড়িয়া থাকে। অনেক অক্ষরেরই আসল অংশটুকু সংস্কৃত অথবা বাঙ্গালা অক্ষরের ন্যায়।" —এমন পর্যবেক্ষণ উপেন্দ্রকিশোর বলেই সম্ভব। শিশু-কিশোরের কৌতুহলই তাঁর চেতনা। অজানাকে এভাবেই দেখা তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য।

"প্রতিবছর কোথাও না কোথাও বেড়াতে যেতেন। সদলবলে। খুড়তুতো-পিসতুতো ভাইবোন এবং স্বজন-পরিজন মিলিয়ে সে বিরাট দল। যাওয়ার জায়গাগুলি ছিল মসুরায় দেশের বাড়ি কিংবা পুরী, দার্জিলিং, চুনার, মধুপুর। যেখানে যেতেন বাড়ি ভাড়া করে সেখানে উঠতেন।" (উপেন্দ্রকিশোর/শুভাশিষ চক্রবর্ত্তী/৭ ডিসেম্বর ২০১৬, আনন্দবাজার পত্রিকা/রাবিবাসরীয়)

উপেন্দ্রকিশোর পুরী গিয়েছিলেন আরোগ্যলাভের জন্য। লেখক স্বয়ং লিখেছেন, "আমি তীর্থ করিতে পুরী যাই নাই, বেয়ারাম সারাইবার জন্য গিয়েছিলাম। কিন্তু বারবার সবিনয়ে বলাতেও পাণ্ডা মহাশয়েরা আমার কথাটা বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না।" তাই প্রসঙ্গক্রমে তিনি পুরী মন্দির সংলগ্ন পাণ্ডাদের অত্যাচারের প্রচলিত ছড়া স্মরণ করালেন—"দক্ষিণে, বামে, পিছনে সম্মুখে যত/লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত।"

'পুরী' প্রবন্ধে লেখকর এভাবে যাত্রাপথের বর্ণনা, সঙ্গে ছেলেবেলায় শোনা পুরী ভ্রমণের অভিজ্ঞতার টুকরো ছবি, পুরী মন্দিরের বর্ণনা, সমুদ্র মানুষজনের প্রকৃতি ও আত্মচেতনায় ধরা 'পুরীর' অন্তরঙ্গ ছবি সুসংবদ্ধ বিন্যাসে এবং তাঁর চিত্রাভাস মনের

রঙে রঙীন পটের ডালায় সিদ্ধ হয়েছে; যেখানে ভ্রমণ সাহিত্যের স্বাদ পাওয়া যায়। তাঁর চোখে যেন সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে চিত্রিত হয়েছে ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ছবি; (১) "পুরী পৌঁছাবার চারি-পাঁচ মাইল থাকিতেই জগন্নাথ মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। যেন একটা প্রকাণ্ডভুট্টা। ভুট্টার দানা যেরূপ সাজানো থাকে, মন্দিরের আকৃতিও কতকটা ভুট্টারই মতন। মন্দিরের এই দৃশ্যটি দেখিতে বেশ সুন্দর, কিন্তু কাছে গিয়া আমার তাহা এত সুন্দর বোধ হয় নাই।.....সামনের রাস্তাটি খুব চওড়া, আমি আর কোথাও এমন প্রশস্ত পথ দেখি নাই। এই পথে জগন্নাথের রথ চলে।"

(২) 'সমুদ্রের ধারের স্থানগুলিতে গাছপালা বাড়িতে পায় না। বটগাছগুলি আম গাছের মতন। নিমগাছ কুলগাছের মতন। অনেকগুলি গাছই আমার একপেশে। একদিকে কারো ডালপালা বেশ বাড়িয়াছে, কিন্তু আর একদিকে বেশি ডাল নাই, আবার যাহা আছে তাহাতেও পাতা খুব কম। সমুদ্রের ধারে বালি হাওয়ায় উড়াইয়া আনিয়া এই সকল গাছের এইরূপ দুর্দশা করে।

—এভাবে লেখক কখনো ভাড়াবাড়ির বর্ণনা, তার সঙ্গে কুকুর, ব্যাঙ প্রভৃতি ইতর শ্রেণীর প্রাণীদের নিয়েও মজার মজার অভিজ্ঞতার গল্প যেন রচনা করেছেন। ব্যাঙ তাড়ানোর পর উইয়ের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এল চাকরের প্রসঙ্গ "চাকর আসিল, তাহার দুই পায়ে দুই গোদ, সেই গোদ ভরাট করিতে যেন শরীরের অন্যান্য স্থানের মাংস খরচ হইয়া গিয়াছে।" একস্থান থেকে অন্যস্থানে ভাষাগত সমস্যা কেমন বিভ্রাট সৃষ্টি করে তাও তাঁর চোখ এড়ায়নি। ওড়িয়ারা 'পরিবা' বলতে তরকারি বুঝায়। অথচ বাঙালীর 'পরিবার' শব্দ এর অন্য অর্থ 'পরিবা' অর্থে ব্যবহার করেছে ওড়িয়া চাকর। তিনি লক্ষ্য করেছেন এখনকার সাধারণ মানুষের স্বভাব চরিত্র —"তাহারা গায়ে হলুদ মাখিতে খুব ভালোবাসে। আর তাহাদের কেমন একটা বেখাপ্পা কৌতুহল আছে। পথ চলিতে চলিতে তোমাকে ডাকিয়া তোমার আবশ্যক অনাবশ্যক দশটা খবর লইয়া যাইবে। কবে এসেছ? কত দিয়ে ঘর ভাড়া করিলে?"

এমনকি পুরীর খাদ্য তালিকায় যা সহজলভ্য তাও তাঁর পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে—"তরকারি বেশি পাওয়া যায় না। কচু, কুমড়া আর কাঁচকলার নাম লইলেই প্রধান জিনিসগুলির কথা একপ্রকার শেষ হয়। আলু তো জগন্নাথ খানই না, সুতরাং সেখানে জন্মীয়ত্ত না।.....কলা বেশ, আর আম, পেঁপে, আতা, নোনা, কুল ইত্যাদির গাছ দেখিয়াছি।.....দুধের বড় কষ্ট। দুধের দোষে নয়, গোয়ালার গুণে। দুদিন সেখানকার দুধ খাইয়াই বুঝিতে পারিলাম যে, সে কলিকাতার গোয়ালার চাইতে বেশি বুদ্ধিমান। ডাক্তার বলিলেন, 'গাই না কিনিলে তোমার অসুখ সারিবে না।" তাঁর সমুদ্র দর্শনের রূপ বেশ চমকপ্রদ। প্রাবন্ধিকের মতো যুক্তিনিষ্ঠ তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে

বর্ণিত—"পদ্মা প্রভৃতি বড় বড় নদীর এক এক স্থান সোজাসুজি দেখিতে প্রায় এইরূপ বোধ হয়। হিমালয়ে উঠিবার সময় মাঠের দৃশ্য যে দেখিয়াছে, যে ঐরূপ সমুদ্রের চাইতে বড় জিনিস দেখিয়াছে। যত উঁচুতে উঠা যায় ততই বেশি দূর অবধি দেখিতে পাওয়া যায়। পুরীর কাছে সমুদ্র আসলে সাত হাজার মাইল লম্বা হইলে কি হইবে; তাহার কূলে দাঁড়াইয়া পনের-কুড়ি মাইলের অধিক দেখা যায় না। কিন্তু দার্জিলিং-এর পথে এক এক জায়গায় নীচের দিকে তাকাইলে মাঠের উপর দিয়া ষাট সত্তর মাইল পর্যন্ত দৃষ্টি চলে।"—বোঝা যায় ইতিপূর্বে দার্জিলিং ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লেখকের হয়েছে। এই ধরণের লেখা সাধারণত প্রাবন্ধিকের কলমে দেখা যায়।

তাঁর এই অভিজ্ঞতার আকরে তীর্থযাত্রীদের আসা-যাওয়া, সমুদ্র-স্নান করা, উপহার কেনা এসবই আলোচিত হয়েছে। হয়েছে সমুদ্রের ঢেউ এর প্রসঙ্গ। পুরীর সমুদ্রের ঢেউ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। উপেন্দ্রকিশোরের ব্যাখ্যায় তা অন্য মাত্রা পেয়েছে—"মানুষের দেহে যেমন মুখখানি সকলের আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করে; সমুদ্রের ঢেউগুলি সেইরূপ। সমুদ্রকে দেখিতে পাওয়ার অনেক আগেই ঢেউয়ের কোলাহল শুলিতে পাওয়া যায়। এ কোলাহলের আর নিবৃত্তি নাই। যেন দেশের সব রেলগাড়ি আর ঝড়েদের মধ্যে বচসা।.....তীরে ঠেকিয়া সকল ঢেউকেই আবার ফিরিতে হয়। ইহা হইতে ঐ উলটোমুখো জলের উৎপত্তি।.....এই কারণেই সমুদ্রের একটা কিছু জিনিস ফেলিয়া দিলে খানিক বাদে সেটা আবার তীরে আসিয়া উপস্থিত হয়। লোকে বলে, 'সমুদ্র কাহারো কিছু গ্রহণ করে না; যাহা দেওয়া যায়। তাহা সে আবার ফিরাইয়া দেয়।"—এখানেই শেষ নেয়, সমুদ্রস্নানের অভিজ্ঞাতা লেখক বিস্তৃত আকারে বর্ণনা দিয়েছেন, কিভাবে ঢেউ থেকে বাঁচতে হবে সে পন্থাও তাঁর অভিজ্ঞতায় সুস্পষ্ট। তাঁর চেতনায় বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যাও মেলে—"সমুদ্রের জল আর হাওয়া উভয়ই স্বাস্থ্যকর। জলে লবণ প্রভৃতি জিনিস থাকে, আর ক্রমাগত নড়াচড়া পাইয়া তাহার সঙ্গে বায়ু অধিক পরিমাণে মিশিতে পায়। সেখানকার বায়ুও খুব পরিষ্কার, আর তাহাতে ওজোনের (Ozone) ভাগ বেশি। অক্সিজেন ঘন হইয়া ওজোন উৎপন্ন হয়, উহা খুব স্বাস্থ্যকর। তারপর সমুদ্রের ধারে রৌদ্রের গুণও একটু বিশেষ রকম দেখা যায়। তাহা খুব উজ্জ্বল, কিন্তু তত গরম নয়। ইহাতেও শরীরের উপকার আছে।"—ভ্রমণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এমন বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা পাঠকের কাছে মহত্ত্বপূর্ণ। যেন গবেষণামূলক রচনা। তাই তিনি বিস্তৃত ক্যানভাসে আঁকেন পুরীর সমুদ্রের নানা প্রকৃতি—"পুরীর কাছে সমুদ্র একটুও গভীর নহে, তাই জাহাজ সেখানে কুলের কাছে ভিড়িতে পায় না, প্রায় আধ মাইল দূরে থাকে। জিনিসপত্র নৌকায় করিয়া তুলয়া দিতে হয়, সে সকল নৌকায় দড়ির গাঁথুনি। লোনা জলে লোহা দুদিনেই মরিচা ধরিয়া ভাঙ্গিয়া যায়; সুতরাং নৌকার তক্তা জুড়িতে লোহা ব্যবহার হয় না। এই সকল

নৌকায় করিয়া সমস্ত দিন ধরিয়া জাহাজে চাউল বোঝাই হইয়াছিল; আর কোন জিনিস উঠিতে দেখি নাই।".....সমুদ্রের রঙ অতি সুন্দর। তাহা যে জমকালো তাহা নহে, কিন্তু যারপরনাই কোমল ও সুন্দর। দেখিলে নীল রঙের কোনো দামী পাথরের কথা মনে হয়। বড় বড় ঢেউগুলির পিঠে আসমানী রঙ, কোলে সবুজ রঙ, তাহাতে সাদা ফেনাগুলি যে কি সুন্দর দেখায় তাহা কি বলিব। লম্বা লম্বা ঢেউগুলি যখন গড়াইয়া তীরের দিকে আসিতে থাকে, তখন তাহাদের নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সেই ফেনাগুলি ফুলের মালার মতন দুলিতে থাকে।"—এই দেখা যে বিজ্ঞানমনস্ক চিত্রকরের তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অপূর্ব বর্ণনা সূর্যোদয় সূর্যাস্তের—প্রকৃত চিত্রকর না হলে এমন রঙ বেরঙের রূপ শব্দের খেলায় আঁকা সহজ নয়—"শেষে একবার চট্ করিয়া একটুখানি আগুনের কণার মতো দেখা দিল। তখন তাহার চেহারা আমওয়ালা চাখিতে দিবার জন্য ছুরির আগায় করিয়া যে টুকরা বাহিরে করে সেইরূপ। ঢেউগুলি যেন তাহাকে লইয়া লুফালুফি করিতে থাকে। ক্রমে কণার মতন, পুলির মতন, গম্বুজের মতন হইয়া শেষে হাঁড়ির মতন হইয়া যায়। উপরের দিকটা গোল, তারপর খানিকটা একটু সরু হইয়া তলার দিকটা আবার চওড়া। শেষটা একবার ঝাঁ করিয়া জল হইতে আলগা হইয়া যায়।"—যেন একটা পর্বের সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য।

পুরী সমুদ্রের প্রসঙ্গ মানে শামুক আর কাঁকড়ার কথা অনিবার্যভাবে আসে। ভ্রমণ-পিপাসু উপেন্দ্রকিশোর তখন প্রৌঢ়, অসুস্থ। অথচ শিশু-সুলভ কৌতুহলী মন নিয়ে তাঁর পথ চলা। তাই এই রচনায় কাঁকড়ার প্রসঙ্গে অনেকটা জায়গা দিয়েছেন। তিনি বিস্মিত পুরীর এই কাঁকড়া দেখে—"আমি প্রথমে মনে করেছিলাম বুঝি মাকড়সা। আকারে একটা মাঝারি মাকড়সার চাইতে বেশি বড় হইবে না, আর রঙটাও কতকটা সেইরকমের। সে যে কাঁকড়া, তাহা আমার আদপেই মনে হয় নাই, কারণ কাঁকড়া এমন ছুটিতে পারে তাহা আমি জানিতাম না।.....কাঁকড়ার চেহারা দেখিলে আমার ভারি হাসি পায়। প্রথমত উহার চক্ষু দুটি। এক একটি চোখ এক একটি বোঁটার আগায় বসান। ঐরূপ চক্ষু দিয়া যখন সে তোমার দিকে তাকাইবে, তখন তোমার মনে হইবে যেন তোমায় ভালো করিয়া দেখিবার জন্য সে দূরবীন লাগাইছে।.....তাহার পর উহার দুটি গোদা হাত অর্থাৎ দাঁড়া।"—এভাবে আগে বিশদ বিবরণ আরো আছে, গবেষকদের প্রয়োজনে যথেষ্ট। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর কেবল বাহ্যদৃষ্টিতে কাঁকড়ার বিস্তৃত বিবরণ রচনা করেননি। বিস্মিত হতে হয় তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষাও শিশু মন দেখে। তিনি অত্যন্ত কৌতুহলের সঙ্গে ছোটরা যেমন কাঁকড়াকে নিয়ে খেলা করে, তেমনি তিনি এই দুরন্ত অপরাজেয় পুরীর কাঁকড়াকে ধরার জন্য বিস্ময় খেলায় মগ্ন হয়েছিলেন। বোঝা যায় কেন তিনি শিশুশিল্পী, শিশুমনের রূপকার। তিনি লিখছেন, "একদিন আমি লম্বা সূতায়

রুটির টুকরা বাঁধিয়া দিয়াছিলাম। একটা কাঁকড়া আসিয়া সেটাকে পরীক্ষা করিল, তারপর তাহাকে টানিয়া গর্তের ভিতর লইয়া গেল। গর্তটা বেশ গভীর ছিল, প্রায় সওয়াফুট সূতা ট্যারছাভাবে ভিতরে ঢুকিয়া গেল, তারপর আমি সূতা ধরিয়া টানিলাম। সহজ টানে কি তাহা বাহির হয়। কাঁকড়াটা বোধ হয় কিছুতেই রুটিটিকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিল না, তাই সে যতক্ষণ পারিল প্রাণপণে তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিল। শেষে অগত্যা রুটির সঙ্গে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত। তখনো সে তাহা ছাড়ে নাই। এটুকু খাদ্যের মায়ায় সে এতটা ভুলিয়া গিয়াছিল যে, এদিকে আমি যে তাহাকে একেবারে আমার কাছে টানিয়া আনিয়াছি তাহা সে যেন বুঝিতে পারে নাই। অবশেষে হঠাৎ একবার যখন রুটির সঙ্গে সঙ্গে সে শূন্যে ঝুলিতে লাগিল, তখন তাহার চৈতন্য হইল। এবারে রুটি ছাড়িয়া দিয়া সে গর্তের ভিতর ঢুকিল। শত প্রলোভনেও আর সে বাহিরে আসিল না।"—এ তো কেবল ভ্রমণের স্বাদ একেবারে চেটেপুটে খাওয়া। মানুষ জন-প্রাণী সকলের সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান অর্জন করার এ এক অন্য লোলুপতা। লেখক এখানে কাঁকড়া সম্পর্কের আরো অনেক কথা একজন বিজ্ঞানমনস্ক চিত্রকরের তুলিতে চিত্রিত করেছেন।

এরপর উপেন্দ্রকিশোর সমুদ্র মাছের প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলেখ্য রচনা করেন। 'সমুদ্রের সাপ (sea serpent)', জেলী মাছ, চিংড়িমাছ, কটল মাছ, সমুদ্র বেলে 'মেইলা', ইরেজিতে যাকে 'সোল (sole) বলে, হাঙ্গর—যার উড়িয়া নাম 'ম-গ-র' 'শাক্স' মাছ, 'তারা' (starfish)' মাছ, 'সাগর বিছুটি (sea nettle)', 'শয়তান মাছ'—এ প্রসঙ্গেও ইলিশ মাছের উল্লেখে আলোচনাটা তথ্য সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় হয়েছে। প্রতিটি মাছের দৈহিক গঠন, তাদের স্বাদ—নানা কোণে তার ব্যাখ্যা। —"চ্যালার নাম 'খণ্ডবানিয়া', তাহার এক একটা প্রায় একফুট লম্বা হয়। খাইতে নেহাত মন্দ নহে, কিন্তু বাপরে। তাহাতে কাঁটা, কি কাঁটা। 'কো-কি-র' খয়রা মাছের মতন। পিঠের রঙ কালচে। খাইতে বেশ। চাঁদি হচ্ছে চাঁদা। ইহা সমুদ্রের উৎকৃষ্ট মাছ। চাঁদির অনেক প্রকার ভেদ আছে. ছোট, বড়, সাদা, পাঁশুটে সকল রকম চাঁদিই খাইতে ভালো তবে বড়গুলির প্রশংসা বেশি। একরকম ছোট ছোট চাঁদি আছে, সে যে দেখিতে কি সুন্দর তাহা কি বলিব! রঙটি যেন ঠিক মুক্তোর মতন, আর দেখিতে এত কোমল এবং পরিষ্কার যে মনে হয়, যেন তাহাকে অমনি খাওয়া যাইবে। উহার ঝোল চমৎকার লাগিত।"—মেনি সবিস্তার পর্যবেক্ষণে আশ্চর্য নিবন্ধ রচিত হয়েছে ভ্রমণ কথায়।

স্বাভাবিকভাবে এরপরে আসে জেলেদের কথা। মননঋদ্ধ দক্ষতায় অনন্য এইপর্ব। সুপরিকল্পিত ভাবে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মিশেলে জেলেদের কথা ও তাদের মাছ ধরার পদ্ধতি প্রবন্ধের বিন্যাসে প্রকাশিত। সুনিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অসীম কৌতুহল না

থাকলে এমন ভ্রমণ অভিজ্ঞতা রচনা সম্ভব নয়। অসুস্থ অবস্থাতেও উপেন্দ্রকিশোর এমন অসাধ্য সাধন করেছেন। তাঁর কথায়—"এই সকল জেলে মাদরাজি; ইহাদিগকে নোরিয়া বলে। চেহারায় কথাবার্তায়, চালচলনে সকল বিষয়েই ইহারা উড়িয়াদের চাইতে অনেক বিভিন্ন। সেখানকার দেশীয় জেলেও আছে, কিন্তু তাহারা সমুদ্রের মাছ ধরে না, তেমন সাহস আর উদ্যোগ তাহাদের নাই। ভারতবর্ষের গরিব লোকেরা কি পর্যন্ত পরিশ্রম করিয়া আর ক্লেশ পাইয়া দুবেলা দুই মুঠো ভাতের জোগাড় করে তাহা এই নোরিয়াদিগকে দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়।"—এই প্রসঙ্গে লেখক পুরীতে যে কয়প্রকার উপায়ে মাছ ধরা হয় তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন—"সচরাচর তিন রকম উপায়ে ইহারা মাছ ধরিয়া তাকে। এক উপায় ছোট ছোট জাল লইয়া সমুদ্রের কূলে কূলে ছোট ছোট মাছ ধরা। হাত পনেরো লম্বা আর হাত দেড়েক চওড়া একখানি জাল, তাহার মাঝে মাঝে এড়োবাগে সরু সরু কাঠি পরানো। দুজন লোক জালের দুই মাথা ধরিয়া জলের ধারে ধারে চলিতে থাকে।.....দ্বিতীয় উপায়, ক্যাটমারানে করিয়া সমুদ্রের ভিতরে গিয়া জাল দিয়া মাছ ধরা। ঐ জাল কিরকম দেখি নাই। কারণ যাইবার সময় উহা গুটানো থাকে, আর মাছ ধরিবার কাজটা সমুদ্রের ভিতরে এত দূরে হয় যে ভালো করিয়া দেখাই যায় না।.....ছোটছোট ক্যাটমারানে দুজন লোক ধরে। দুজনে মিলিয়া মাছও ধরে, ক্যাটামারানও সামলায়। আর তাহা করিতেই তাহাদের সময় চলিয়া যায়। শরীরের যত্ন করিবার অবসরও হয় না।.....নভেম্বর মাস হইতে উহারা বড় বড় জাল দিয়া মাছ ধরিতে আরম্ভ করে। আর সেই সময় হইতেই মাছ ধরা দেখিবার আমোদ আরম্ভ হয়। তখন আর ক্যাটমারানে কাজ চলে না, নৌকার দরকার হয়। নৌকায় অনেক দূর অবধি জাল ফেলিয়া অসে। তারপর ডাঙ্গায় আসিয়া তাহাকে টানিয়া তোলে। এক একটা জালের পিছনে কুড়ি-পঁচিশজন করিয়া লোক খাটিতে হয়। স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো সকলে মিলিয়া ইহাতে যোগ দেয়।"

—এমন ভ্রমণ কথা বিরল বলা চলে, কেবল সে স্থানের ভৌগোলিক বিবরণ নয়, জীবন যাত্রার পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি সূক্ষ্ম অনুভূতির রঙে রঙীন হয়ে পাঠকের কাছে উপস্থিত। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে জীবনালেখ্য রচনা করেছেন, তার টুকরো চালচিত্র যেন উপেন্দ্রকিশোর 'পুরী' ভ্রমণ কথায় আত্মোপলব্ধির কোমল চেতনায় অসাধারণ কথারূপ দিয়েছেন। যা আজও অনালোচিত অনালোকিত।

ভ্রমণকথার উপসংহারে লেখক 'চক্রতীর্থ' এর প্রসঙ্গে মহাপ্রভু চৈতন্যের কথা এবং পুরী যে একটি জাহাজ স্টেশন সে প্রসঙ্গে তাঁর ধারণার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর কথায় "পুরীর রেল স্টেশনের কাছে সমুদ্রের ধারে চক্রতীর্থ নামক একটি স্থান আছে। দু-একটি মন্দির ভিন্ন সেখানে আর কিছু নাই. যে নিমকাঠ দিয়া জগন্নাথের মূর্তি

গড়া হইয়াছে। সেই নিমকাঠ সমুদ্রের জলে ভাসিতে ভাসিতে ঐ চক্রতীর্থে আসিয়া লাগিয়াছিল, তাই উহা তীর্থস্থান হইয়াছে।.....চক্রতীর্থের কাছেই একটি বালির ঢিপির ওপরে আর একটা ছোট মন্দির আছে। চৈতন্যদেব পুরীতে সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহার দেহ যেস্থানে আসিয়া তীরে লাগিয়াছিল, ঐ ছোট মন্দিরটি সেখানে তয়ের করা হইয়াছে।"—তীর্থস্থান দেখা আর তার ইতিহাস অনুসন্ধান করে তার সম্পর্কে যেভাবে লেখক তথ্য উপস্থাপন করেছেন, তাতে এর ঐতিহাসিক গুরুত্বও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এরপর লেখক স্বয়ং লিখেছেন, 'পুরী যে একটি জাহাজের স্টেশন একথা আর বিশেষ করিয়া না বলিলেও চলে। এখানে হইতে বিলাত প্রভৃতি স্থানে যেসকল জাহাজ যায়, তাহারা পুরীর কাছ দিয়া যায় না। তাহাদের পথ পুরী হইতে প্রায় ষাট মালি দূরে সমুদ্রের ভিতর দিয়া। কিন্তু এমন অনেক জাহাজ আছে, যাহারা রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করে। পুরী এই সকল জহাজের স্টেশন।" প্রসঙ্গত লেখক জাহাজের জন্য স্টেশনে বন্দ্যোবস্ত নানা নিশান ও আলোর সংকেতের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। এই অংশ পড়লে বোঝা যায় তিনি এই বিষয়ে যথেষ্ট প্রাজ্ঞ। অবশেষে লিখলেন পুরীর প্রসঙ্গে—"পুরীর লন্টনটি অতি সামান্যরকমের। কিন্তু এই জাতীয় লণ্ঠন এক একটা খুব বড় হয়, আর তাহার আলো সাধারণ আলোর চাইতে অনেক বেশি।.....আলোটি ক্রমাগত না জ্বলিয়া একবার নিভিবে অথবা লণ্ঠনটি ঘুরিবে, যাহাতে একবার তাহার সামনের দিক, একবারপিছনের দিক দেখা যায়, আর দূর হতে মনে হয় যেন আলো জ্বলিতেছে আর নিভিতেছে। এই উপায়ে বিশেষ বিশেষ স্থানের আলো দেখিয়া জাহাজের লোকেরা বুঝিতে পারে যে, উহা অমুক স্থানের আলো।" —এই জ্ঞানগর্ভ আলোচনার মাধ্যমে লেখক 'পুরী' প্রবন্ধের সমাপ্তি রচনা করেন। তথ্যে ভরা এই ভ্রমণ কথায় আমরা কেবল ভৌগোলিক পরিবেশের, সেইস্থানের জীবনযাত্রার পরিচয় পাই না, পাই লেখকের মননে সঞ্চিত বোধের আলোর উৎসার।

'দু'বৎসর' পর উপেন্দ্রকিশোর আবার গেলেন পুরী। এবার লিখলেন 'আবার পুরীতে'। দেখলেন নতুন পুরী—"যে সকল জায়গায় আগে বালি ভিন্ন কিছুই ছিল না, এখন সেখানে অনেকগুলি নূতন বাড়ি হইয়াছে।' এবারও তাঁর চোখে ইতর শ্রেণীর প্রাণী হিসাবে কাঁকড়া আর কুকুরের ভূমিকা অন্য মাত্রাপায়। যে বাড়িতে উঠেছেন—একেবারে সেই বাড়ির উঠোনেই তাদের বাস। ফলে আলোচনার আলো এসে পড়ে এদের ওপর। সঙ্গে যুক্ত হয় টিকটিকি আর গিরগিটি আর বিড়াল। আর জীবজন্তুর প্রতি মায়া মমতার প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে পারলোকগত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রমের কথা। তিনি আশ্রমের তত্ত্বাবধায়কের কাছ থেকে গোস্বামী মহাশয়ের

জীবনের অশচর্যজনক মাহাত্মের কথা শুনেছেন—যে সাপকে আমরা দেখিবামাত্র তাহার মাথা গুঁড়া করিয়া দিই, গোস্বামী মহাশয় সেই সাপকে পর্যন্ত যত্ন করিয়া রোজ দুধ ভাত খাওয়াইয়াছেন। একটা সাপ ধ্যানের সময় আসিয়া তাঁহার শরীরে বাহিয়া উঠিত, কিন্তু কখনো কোনো অনিষ্ট করিত না।"—এমন আনুসন্ধান উপেন্দ্রকিশোর তাঁর প্রৌঢ়ত্বে এসেও অসুস্থ শরীরের করছেন, এওতো অবাক করার মতো।

এরপর লেখক নরেন্দ্র সরোবরের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেন—যাকে 'জগন্নাথের গ্রীষ্মাবাস বলা হয়।—"পুরীতে এই পুকুরটি অতিশয় প্রসিদ্ধ। আর ছবি দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে উহা যেমন তেমন পুকুর নহে। কলিকাতার লালদীঘি হইতে উহা অনেক বড়, আর চারিধার পাথর দিয়া বাঁধানো, জল বেশ পরিষ্কার, কিন্তু তাহাতে কুমীর থাকায় নামিয়া স্নান করাটা তেমন নিরাপদ নহে।" কিন্তু তাঁর এই দেখায় এই সরোবরে বেশি সময় ব্যয় করেনি, তিনি গভীর আন্তরিকতায় যে নরিয়াদের কথা 'পুরী' প্রবন্ধে বলেছেন মাছ ধরার প্রসঙ্গে, এবার তাদের অন্দরমহলে প্রবেশ করলেন। আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এল নোরিয়াদের গ্রাম, এবং তাদের পরিচয়—"ইহারা হিন্দু। ইহাদের দেবদেবী আছে, পুরুত আছে, মন্দির আছে।.....সকলের চাইতে বড় মন্দিরটি ছাড়া আর কোনোটির ভিতর মানুষ ঢুকিবার জায়গা নাই। অধিকাংশ মন্দিরই বাক্স প্যাটরার মতন ছোট ছোট চালাঘর মাত্র, উহার ভিতরে লাল, কালো হলদে রঙের ছোট ছোট দেবতারা বড় বড় চোখ মেলিয়া আশ্চর্য হইয়া বসিয়া থাকে। একটি দেবতার আবার ঘর পছন্দ হয় না, সে হাঁড়ির ভিতর থাকিতে ভালোবাসে।"——এভাবে নরিয়াদের ধর্ম ও জীবনযাত্রার কথা লেখক গভীর আন্তরিকতায় কথা সাহিত্যের স্বাদে মাঝে মাঝে সংলাপের ছোঁয়ায় রূপ দিয়েছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন—"নরিয়ারা বড়ই গরীব আর পরিশ্রম। উহাদের কেহ সহজে ভিক্ষা করিতে চাহে না। সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে গেলে নরিয়া ছেলেরা আসিয়া পয়সার জন্য বিরক্ত করে বটে, কিন্তু আমি কখনো তাহাদিগকে এমন কথা বলিতে শুনি নাই, যে ভিক্ষা দাও। কেহ কতকগুলি কড়ি আনিয়া বেচিতে চাহিবে, না হয়, বলিবে "পানিমে জায়েগা?"

অবশেষে লেখক সমুদ্র-স্নানের প্রসঙ্গ ও আনন্দ-অনুভবের কথা ব্যক্ত করেছেন, সময়টা সূর্যগ্রহণ হয়েছিল বলেই সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে তাঁরই উপলব্ধির প্রকাশে পুরী ভ্রমণকথার সমাপ্তি ঘটে। লক্ষ্যনীয়, উপেন্দ্রকিশোরের ভ্রমণ পর্ব স্বল্প দিনের জন্য নয়, যখনই গিয়েছেন রীতিমত ঘর ভাড়া করে দীর্ঘদিন থেকেছেন এবং শরীর মন জুড়ে শিশুর কৌতুহল আর প্রাজ্ঞ চেতনায় উপভোগ করেছেন পুরীর নানা রূপ-জীবনধারার স্পর্শ, ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের স্বাদ-অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। সমগ্র পুরীর ভ্রমণকথার উপেন্দ্রকিশোর যেভাবে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে এবং আত্মোপলব্ধির চেতনার আধারে পুরীর

মন্দির, যাত্রাপথের বর্ণনা, সমুদ্র দর্শন, সেখানকার গাছ-পালা-ইতর শ্রেণীর প্রাণী থেকে জীবন যাত্রার খুঁটিনাটি তথ্য বহুল রূপে প্রাণ দিয়েছেন তা সত্যিই অনন্য। আমরা যাঁরা পুরী ভ্রমণে যাই তারা সাময়িক বাহ্যিক আনন্দ উপভোগের স্বাদ নিয়ে ফিরি, কিন্তু বাংলা শিশু সাহিত্যের ভগীরথ যে শিশু মন নিয়ে লিখেছেন 'পুরী' এবং 'আবার পুরীতে' তা বাঙালীর হৃদয় ছুঁয়ে যাবে। হয়তো সাধু ভাষায় তাঁর এই প্রকাশ পাঠকের পাঠে সাময়িক বাধা সৃষ্টি করলেও পুরী ভ্রমণকথা হিসাবে এর গুরুত্ব যেমন ঐতিহাসিক, তেমনি ভ্রমণ সাহিত্যের আঙিনায়ও।

অত্যুক্তি আর আত্মনিষ্ঠা

শঙ্খ ঘোষ

(সুকুমার পরিক্রমা বাংলা একাডেমী ১৯৮৯ থেকে পুনর্মুদ্রণ)

ছবির শিল্প নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে সুকুমার রায় একবার লিখেছিলেন যে, 'অতিরিক্ত কথা বলাটাও এক প্রকারের অত্যুক্তি এবং কাব্যের ন্যায় শিল্পেও তাহা নিন্দনীয়।' একথা অবশ্য তিনি ভোলেননি যে এক হিসেবে শিল্পের মধ্যে অত্যুক্তি থাকবেই, অনেকদিন পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি কবিতায় যেমন লিখেছিলেন যে হৃদয় যখন ইঙ্গিতের ভাষায় ভরপুর হয়ে ওঠে 'তখন সাজিয়ে বলা আসে অগত্যাই'। কিন্তু সেই সাজিয়ে বলার মাত্রা ঠিক রাখবার মধ্যে একজন শিল্পীর যথার্থ বাহাদুরি, এবং সুকুমার রায় অন্তত মনে করতেন যে সে-অত্যুক্তিকে মাথায় চড়তে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়। প্রতিটি শব্দকেই অণুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করবার পরামর্শ অবশ্য দিতে চাননি তিনি, কিন্তু অত্যুক্তি যাতে অত্যাচার না হয়ে ওঠে সেদিকে লক্ষ্য রেখে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, 'ভাবের সঙ্গে বস্তুজ্ঞানের একটা পরিচয় ঘটানো আবশ্যক। আর সর্বোপরি আবশ্যক আত্মনিষ্ঠা।'

ছবির শিল্প থেকে দূরে সরে এসে, সুকুমার রায়ের নিজের ছড়াগুলির মধ্যে এ-রকম আত্মনিষ্ঠার পরিচয় কীভাবে বোঝা যায়, তার একটা ছোটো হিসেব নিতে পারি আমরা। একথা ঠিক, হাসির আবহাওয়া তৈরি করবার মধ্যেই তো এধরনের অত্যুক্তি আছে যিনি হাসান এবং যিনি হাসেন তাঁরা দুজনেই তো জানেন যে বস্তু-সত্যকে এখানে একটু বাঁকিয়ে ধরা হল একটু বাড়িয়ে বলা হল ব্যাপারটা। কিন্তু সেই বাড়ানোরও যে একটা মাত্রা বন্ধন আছে সেটা আমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রায়ই টের পাই, যখন দেখি যে হাসানোর চেষ্টাটা কখনো কখনো পৌঁছে যায় ভাঁড়ামোয়। এই ভাঁড়ামোকে হয়তো বলা যায় হাসির সেন্টিমেন্টালিটি। ভালো হাসির লেখা সেই সেন্টিমেন্টালিটি থেকে আমাদের দূরে রাখতে চায়। ভাঁড়ামো যাঁরা করেন, তাঁদেরও অসংগতিটা যে কতদূর হাস্যজনক, এ নিয়েও হাসির লেখা হতে পারে, যেমন আছে সুকুমার রায়ের কাতুকুতুবুড়োর মধ্যে।

কীভাবে বাড়িয়ে বলা হয়, সেটা বোঝানো যায় সুকুমার রায়েরই দুটো কবিতার তুলনা করে। 'খাই খাই' বইতে একটি কবিতা আছে 'হারিয়ে পাওয়া'। ঠাকুরদা তাঁর চশমা হারিয়ে ফেলেছেন, টেবিলে ডেস্কে জুতোর-ফাঁকে খাটের নিচে সম্ভব-অসম্ভব নানা জায়গায় খুঁজবার পর পাওয়া গেল সেটা ঠাকুর্দার কপালেই। 'গল্প'সল্প'ও রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছিলেন অনেকটা এইভাবে, নীলুবাবুর হারানো কলম খোঁজা হচ্ছে মশারি চাল পর্যন্ত, এমনকী ধোপা-নাপিতের কাছে, শেষে দেখা গেল সেটা নীলুবাবুর কানেই গোঁজা।

জুতোর ফাঁক বা মশারি চাল বলে এসবজায়গার কিছুটা উদ্ভটের ছোঁয়া দেবার চেষ্টা আছে ঠিকই, কিন্তু এর মধ্যে আমাদের পরিচিত-প্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার বাইরে যাবার বিশেষ লক্ষণ নেই। ফলে, এর সফলতা-ব্যর্থতা নির্ভর করছে অনেকটা এর বলবার ভঙ্গিতে, ছন্দশব্দ সাজাবার কৌশলে। কিন্তু সেই একই হারিয়ে যাওয়ার ধারণাকে যখন 'গোঁফচুরি'র মতো কবিতায় নিয়ে আসেন কেউ, তখন আমরা বুঝতে পারি বাড়িয়ে বলার সামর্থটা কতদূর যেতে পারে। 'গোঁফ হারানো! আজব কথা! তাও কি হয় সত্যি?' সাহস করে এতটাই বলে দেওয়া আছে কবিতার মধ্যে, কিন্তু তারই সঙ্গে সেই আজবে বিশ্বাস করা নিয়ে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে যা আমাদের হাসিয়ে মারে। কপালে চশমা থাকা সত্ত্বেও চশমা খোঁজা আর নাকের নিচে গোঁফ থাকা সত্ত্বেও গোঁফ খোঁজার মধ্যে যে পার্থক্য, সেইটের মধ্যেই অত্যুক্তির অবস্থান, এই অর্থে 'অত্যুক্তি' জিনিসটা কোনো-না-কোনো আকারে' যথার্থ হাসির লেখায় থাকবেই বলে বোঝা যায়। 'খাই খাই' বইয়ের আরেকটি কবিতা 'বিষম চিন্তা'য় যেসব ভয়ানক প্রশ্নের বক্তা বিচলিত ('ঠেকে গেছি বাপ্‌রে কি ভয়ানক প্রশ্নে'টা অবশ্য অন্য কবিতার), তার বেশির ভাগ জিজ্ঞাসাই আজব হলেও একেবারে ধাণাতীত নয়, বাচ্চাবয়স থেকে ওসব কথা সবাই বলেই থাকে। গাধার কোন শিং থাকে না, হাতির কেন পালক নেই, মাথায় যাদের গণ্ডগোল তাদের কোন পা-গোল বলে, এসব প্রশ্নের সামান্য মজা থাকলেও বিশেষ চমক নেই। কিন্তু হঠাৎ 'কেমন করে রাখবে টিকি মাথায় যাদের টাক পড়ে'-র মতো ভাবনার আবিষ্কারটাই এমন মৌলিক হাস্যকরতা নিয়ে আসে যে তখন আমরা বুঝতে পারি অত্যুক্তির জোর।

কিন্তু এই-যে অত্যুক্তি, একে কোনো লেখার মধ্যে আমরা কি বাড়িয়েই চলতে পারি কেবল? ছন্দশব্দের আয়ত্ত দক্ষতায় যদি উদ্ভটের একটা দীর্ঘ তালিকাই বানিয়ে তুলতে থাকি, তাহলে কবিতার মজাটা কি থাকবে বেশিক্ষণ? রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছড়া'র অনেক লেখায় (এমনকী অনেকসময়ে 'সে'-র অলীক কল্পনাবিস্তারেও) প্রায় যেন একইরকম তালিকার দিকে এগিয়ে গেছেন, সত্য করে তুলেছেন এই কথা যে 'কলম উঠল খেপে/মিথ্যে বকা দৌড় দিয়েছে/মিলের স্কন্ধে চেপে' ('ছড়া' ২)। আর সেই দৌড়ের ভাষাবহুলতা ঘটনাবহুলতায় হাসির অবকাশটা কখনো কখনো যেন ক্ষয়ে এসেছে বলেই মনে হয়। সুকুমার রায়ও কি করেননি কখনো, তেমন? তাঁর 'খাই খাই' কবিতাটির কথাই ধরা যাক। আটান্ন লাইনের এই কবিতার দুচার লাইন এগোতে এগোতেই আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের ভাষায় 'খাওয়া' শব্দের নানা বিচিত্র প্রয়োগ নিয়েই কবিতার আয়োজন। ফলে, এর মধ্যে কৌতুকের দিক অন্য বেশিকিছু নয়, এ কেবল ভাষার খেয়ালকে ধরিয়ে দেবার মজা। কেবল এইটিই নয় অবশ্য 'খাই খাই' বইয়ের অনেক

লেখাই ভর করে আছে বিশেষ এই খেয়ালটির ওপর, 'দাঁড়ের কবিতা'য় দাঁড়ি বা 'পাকাপাকি'র পাকানো কিংবা 'পড়ার হিসেব'-এর পড়া শব্দগুলিকে নিয়ে, এমনকী 'তেজিয়ান'-এর 'চলে খচ্‌খচ্‌ রাগে গজ্‌গজ্‌'-ও তো অনুকারধ্বনি নিয়ে একটা পরীক্ষা, কবিতাবিহীনভাবে যার কঙ্কালটা পাওয়া যায় 'চলে হন্‌হন্‌ ছোটে পন্‌পন্‌। ঘোরে বন্‌বন্‌ কাজে ঠন্‌ঠন্‌' টুকরোটুকুর মধ্যে। ভাষার এই খেয়াল কৌতূহল যত, কৌতুক তত নয়। এটা হয়তো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে 'আবোল তাবোল' এর কবিতাগুলিকে নির্বাচন করবার সময়ে এই লেখাগুলিকে বাইরেই রেখেছিলেন সুকুমার রায়, 'শব্দকল্পদ্রুম্‌' এর ব্যতিক্রমটি ছাড়া। আর, পরে আমরা দেখব, 'শব্দকল্পদ্রুম্‌' কেবলই ভাষার খেলা নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু, 'খাই খাই'-এর উল্লিখিত কবিতাগুলি থেকে এর স্বাতন্ত্র্য অনেকটাই। 'খাই খাই' কবিতাটির বেলায় দেখি একে তো তার নির্ভর ভাষা নিয়ে মজার ওপর, তার পরে যদি সেই তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলে শুধু যত কিছু খাওয়া লেখে বাঙালির ভাষাতে তাকে সংকলিত করবার চেষ্টায় প্রতিটি লাইনে এক বা একাধিক খাবার ধরনই শুনে যেতে হয় কেবল, তাহলে একটা ক্ষীণ অবসাদ আসতেও পারে। এইসব সময়েই হয়তো মনে করা যায় যে অত্যুক্তিকে 'মাথায় চড়িতে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়।'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাববার বিষয় হল, এ-কবিতাটি কি সুকুমার রায়ের শেষ অনুমোদ পেত? 'আবোল তাবোল' সংকলন করবার সময়ে তাঁর নির্বাচনের মধ্যে স্বভাবতই এগুলি আসেনি, কিন্তু 'খাই খাই' এবং অন্যান্য কবিতার লেখাগুলির থেকে স্বতন্ত্র একটা সংকলন হয়তো তিনি করতেও পারতেন পরে। সেই নির্বাচনের সময়ে, ঠিক একই চেহারায় থাকত কি এই কবিতাগুলি?

প্রশ্নটি তুলবার তাৎপর্য এই যে 'আবোল তাবোল'-এ আমাদের অতিপরিচিত কবিতাগুলির যেসব পাঠে আমরা অভ্যস্ত, 'সন্দেশ'-এ তা সবসময়ে ঠিক সেই চেহারাতেই ছপানো হয়নি। আমরা জানি যে বইটির পরিকল্পনা এবং মুদ্রণ চলছিল তাঁর রুগ্‌ণদশার মধ্যে, দীর্ঘকালীন রোগশয্যায় শুয়েই কবিতাগুলির নির্বাচন করছিলেন তিনি। কিন্তু সেই রুগ্‌ণতার মধ্যের এই কবি তাঁর প্রকাশিত কবিতাগুলিকে আরো একবার পরীক্ষা, এবং লেখাগুলিকে পালটে দিচ্ছিলেন প্রায়ই। পরিবর্জন পরিবর্তন পরিগ্রহণ—এই তিন পদ্ধতিরই মধ্য দিয়ে 'সন্দেশ'-এর কবিতাগুলি 'আবোল তাবোল'-এ শোধিত আর উন্নততর রূপ নিয়ে এল, আমাদের বুঝিয়ে দিল এই শিল্পীর আত্মনিষ্ঠার যথার্থ ধরন। সেই শোধনের কারণটা যে সবসবয়ে একইরকম তা হয়তো নয়, কিন্তু সবসময়েই সেটা শিল্পগত।

ধরা যাক, 'বিদঘুটে রাত্তিরে ঘুটঘুটে ফাঁকা'য় সেই 'হুলোর গান' কবিতাটি। এ কবিতায়, মখমলে ঢাকা মিশকালো অন্ধকারের মধ্যে আধখানা চাঁদ উঠছে, আর তাই

দেখে বেড়ালের মনে পড়ে যাচ্ছে মটকার কাছে আধখানা মালপোয়ার কথা ('পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'র আধখানা পূর্বাভাস?) কিন্তু সেটা খেতে গিয়ে দেখা গেল কানকাটা নেকী সেটা খেয়ে নিয়েছে, সেই দুঃখে সবই যেন শূন্য হয়ে গেল আর মনে হল 'গিন্নীর মুখ যেন চিমনির কালি'। এই গোটা বিবরণটার মধ্যেই উতরোল মজা আছে, কিন্তু বেড়ালের জীবনের এই ট্র্যাজেডিটাকে ধরবার জন্য এর ছন্দেও আছে আরেকটা ধ্বনির সংগতি, গোটা কবিতা জুড়ে একটা খুটখুট আওয়াজ। কী করে আসছে সেই আওয়াজ? এর প্রতিটি লাইনের প্রথম আর তৃতীয় পর্বের সূচনায় আছে একটি করে রুদ্ধদল, আর তার মধ্যে আবার আছে মিলেরও বিন্যাস, যেমন—

চট্‌ করে মনে পড়ে মটকার কাছে
মালপোয়া আধখানা কাল থেকে আছে।

কিন্তু এদুটি লাইনের পরেই সন্দেশ'-এ ছাপা হয়েছিল ঃ

দুড়দুড় ছুটে যাই দুর থেকে দেখি
তোফা বসে ঠোঁট চাটে ওপাড়ার নেকী।
ছলছল করে মোর জ্বলজ্বল আঁখি
মন বলে সংসারে সব জেনো ফাঁকি।
বিলকুল পৃথিবীটা ভুল দিয়ে ঠাসা
স্যাঁতসেঁতে ছ্যাপছেপে শ্যাওলার বাসা।

কবিতাটির উদ্দেশ্যের দিক থেকে এ লাইনগুলিতে তেমন কোনো অসুবিধে নেই। তবু সুকুমার রায়ের নিশ্চয় মনে হয়েছিল যে সবটা তত জমছে না এখানে, আগের অংশের সঙ্গে কোথাও একটা প্রভেদ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। তাই আরো একবার নতুন করে ভাবতে হল তাঁকে, 'আবোল তাবোল' মুদ্রণের সময়ে। উদ্ধৃত অংশটির চারের আর ছয়ের লাইনে শব্দসূচনার রুদ্ধদলটা থাকলেও মিলটা গেছে ভেঙে (মন/সব, স্যাঁত/শ্যাও)। পঞ্চম লাইনে বিল/ভুল-এর মিলটাও যথেষ্ট নয়। আর দ্বিতীয় লাইনে 'তোফা'র সঙ্গে 'ওপা' মিলছে বটে, তবে সে কেবল 'ওপাড়ার' শব্দটাকে টুকরো করে নিয়ে, উপরন্তু তাতে প্রাথমিক রুদ্ধদলগত ধাক্কাটাকেও হারাতে হয়। ছলছল আর জ্বলজ্বল অবশ্য ধ্বনিগত পুরো দাবিটাকেই মানছে, কিন্তু সেখানে কি একটু, বেশি মাত্রায় কল্পনার ঝাঁপ এসে যাচ্ছে না? মালপোয়ার কথা ভেবে ছুটে গিয়ে দেখছি 'তোফা বসে ঠোঁট চাটে ওপাড়ার নেকী', কিন্তু ঠিক সেইজন্যেই আমর চোখ ছলছল করবে কেন? একটু ভাবলে যে বোঝা যায় না তা নয়, বোঝা যায় যে নিশ্চয় মালপোয়াটা খেয়ে নিয়ে ওই ঠোঁটচাটা চলছে, কিন্তু এ ধরনের কবিতা অতদূর ব্যঞ্জনার প্রতীক্ষায় বসে থাকতে পারে না। তাছাড়া, পঙ্‌ক্তি প্রান্তিক মিলেনর ব্যাপারেও একই ধ্বনির আবর্তন চলছে চার

লাইন জুড়ে। এই সবকটি অসুবিধে দূর করবার জন্যেই লাইনকটিকে সমূলে পালটে দিয়ে তৈরি হলো আমাদের প্রিয়পরিচিত লাইনগুলি ঃ

দুড়দুড় ছুটে যাই দূর থেকে দেখি
প্রাণপণে ঠোঁট চাটে কানকাটা নেকী!
গালফোলা মুখ তার মালপোয়া ঠাসা
ধুক করে নিভে গেল বুকভরা আশা;
মন বলে আর কেন সংসারে থাকি
বিলকুল সব দেখি ভেলকির ফাঁকি।

এবার সেই আদিরুদ্ধদল আর পর্বসূচনার মিলের দাবিকে পুরোই গণ্য করা গেল। আর তাছাড়া, কেবল ধ্বনিসামঞ্জস্যই নয়, পালটাতে গিয়ে এখনও একটা লাইন তৈরি করতে পারলেন কবি 'ধুক করে নিভে গেল বুকভরা আশা' প্রায় প্রবাদতুল্য হয়ে যে লাইন স্মরণীয় রয়ে গেল আমাদের কাছে।

রুদ্ধদলকে কাজে লাগিয়ে বিষয়ের সঙ্গে তাকে সুসমঞ্জস করে নেবার ধরন তাঁর আরো কোনো কোনো লেখায় আমরা দেখতে পাব। থুরথুরে যে বুড়িটি ঝুরঝুরে পেড়ো ঘরে থাকত, ষোলো লাইনে তার সেই ঘরটিকে যেন আমরা প্রায় দেখতেই পাই বা শুনতে পাই আবর্তিত এতগুলি হসন্তধ্বনির মধ্য দিয়ে ঃ গাল চাল ঝুর থুর ঝুল মিট চোখ পিট ভর ভয় ঘর খক খক ঠক ঠক কাঠ ঘর দোর কাঁট কাঠ ছাদ বাদ মত রাত মত খুর তার ঝুর। খপ করে পাখি মারতে গিয়ে ফট করে মানুষের বুকেই বাণ ছুঁড়েছিলেন যে গোষ্ঠমামা, তার কথা বলতে গিয়েও ওই একই ধ্বনিরূপ তৈরি করতে হয়েছে হসন্তকৌশলে।

ধ্বনিই যে একমাত্র কথা তা অবশ্যই নয়। অনুকারধ্বনিরই খেলা আছে তেজিয়ান বা শব্দকল্পদ্রুম-এর মতো কবিতায়, কিন্তু দ্বিতীয় এই কবিতাটিতে সেই ধ্বনির চেয়ে বেশি আছে কল্পনা। শব্দকল্পদ্রুম-এর সেই কল্পনাটাকে লক্ষ না করলে কারো হঠাৎ মনে হতে পারে যে এখানে যথেচ্ছ শব্দব্যবহার....। নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে', যেমন ভেবেছেন কোনো তরুণ সমালোচক। বস্তুত, এর মধ্যে কিন্তু ব্যঙ্গ তত নেই, যত আছে মন দিয়ে ভাবা আর কাণ দিয়ে শোনার একটা বৈপরীত্যকে সাজানো। ফুলও ফোটে পটকাও ফোটে। একটা শোনা যায় না, অন্যটা যায়।, কিন্তু শোনা যেত যদি? কীরকম শব্দ হত তার? গন্ধ ছোটারও কি শব্দ হয়? হিম পড়ার? ডুবে যাবার? তারই কথা বলতে গিয়ে গোটা বর্ণনাটার মধ্যে একধরনের প্রচ্ছন্ন উপমার কাজ আছে। কবিতাটির প্রথম পাঠে কথাটাকে একরকম স্পষ্ট করেই রাখা হয়েছিল। 'সন্দেশ'-এ লেখাটি শুরু হয়েছিল এইভাবে ঃ

সব যেন ধোঁয়া ধোঁয়া ছায়াঢাকা ধুলোতে,
চোখ কান খিল দেওয়া গিজগিজ তুলোতে।
বহে না তো নিঃশ্বাস, চলেনাকো রক্ত—
স্বপ্ন না জেগে দেখা, বোঝা ভারি শক্ত।
মন বলে, 'ওরে ওরে আক্কেলমন্ত
কানদুটো খুলে নিয়ে এইবেলা শোন্ ত!'

মনের কান খুলতে বলবার পর পরের স্তবকে এল ঃ 'ঠাস ঠাস দ্রুম দ্রাম, শুনে লাগে খটকা'। স্বপ্ন না জাগরণ, এই অস্পষ্ট অবস্থায় মনের যেন কান খুলে গেল, সে শুনতে পেল যা শুনবার নয়।

কিন্তু ওই ছটি লাইন কি সংগত হত এই কবিতায়? প্রায় যেন একটা প্রস্তাবনার ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লাইনকটা, যেন সেই প্রস্তাবের উদাহরণ হিসেবে পরের লাইনগুলি এসে পৌঁছবে এখন। সাধারণভাবে হয়তো কারো মনে হতেও পারত যে তাতে কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু আমাদের পরিচিত 'শব্দকল্পদ্রুম' যে নাটকীয় চমক দিয়ে শুরু হয়, সেই নাটকীয়তাটাই তাহলে যেত হারিয়ে। কবিতাটি পড়তে গিয়েই আমাদের মনে হয় হঠাৎ যেন চমক দিয়ে জেগে উঠলাম। পূর্বতন স্বপ্ন না জেগে দেখা বোঝা ভারি শক্ত জাতীয় কথাগুলি এই চমকটাকে নষ্ট করে দিত নিশ্চয়। বইতে নেবার সময়ে সুকুমার রায় তাই নির্মমভাবে ছেঁটে দিতে পারেন ওই ছটি লাইনই।

অবান্তর সূচনাংশকে সরিয়ে দিয়ে বর্ণনাকে নাটকীয় করে তুলবার এইরকম উদাহরণ আরো পাওয়া যাবে 'হাতগণনা' কবিতায়, আগে যার নাম ছিল 'দুঃখের কথা'। এ কবিতারও গোড়ায় ছিল।

আহাহাহা! শুনবি যদি—সেকথাটা শুনবি যদি
শুনে তোর চক্ষু বেয়ে, ওরে ওরে ঝরবে নদী।

একে তো নাম বলা হল 'দুঃখের কথা', তার ওপর শুরুতেই চোখ বেয়ে এই জল ঝরে পড়বার খবর—ফলে আমরা তৈরিই হয়ে গেলাম কবিতাটির পরিণতির জন্য। সরল সোজা অমায়িক শান্ত নন্দখুড়োর কোনো একটা জটিল অশান্তি যে আসছে, প্রথমেই তা একেবারে চিহ্নিত হয়ে গেল। কবিতাটির ভিতর দিয়ে চলবার এবং অল্পে অল্পে আবিষ্কার করবার উত্তেজনাটা অনেকটাই তাতে কমে যায়। কিন্তু সে দুলাইন সরিয়ে যদি শুরুই করা যায় এইভাবে যে 'ওপাড়ার নন্দ গোঁসাই; আমাদের নন্দখুড়ো', তাহলে ছন্দতালের সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রত্যাশা নিয়ে আমরা এগোতে পারি, কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইতে পারি কী হল সেই খুড়োর।

এ-কবিতায় অবশ্য প্রথম দুলাইন শুধু নয়, বর্জিত হয়েছে পরেও চার লাইন,

আবার দুলাইন, আর পালটাতেও হয়েছে অনেক। সেই পাল্টানোর মধ্যেও আছে নাটকীয়তারই একটা দাবি, বর্ণনার গতি। হু'কো হাতে হাস্য-মুখে'ই ছিল আমাদের নন্দখুড়ো, হঠাৎ কী খেয়ালে সে হাত দেখাতে গেল', এইরকমই আছে আমাদের কবিতায়। কিন্তু প্রথমে সুকুমার এ-দুয়ের মাঝখানে লিখেছিলেন ঃ

ছিল না তার অভাব কিছু ছিল না তার ভাবনা কোন
ছিল নাকো অসুখবিসুখ—তবু হায়। তবুও শোন
একদা—বলব কি আর, ভেবে মোর কান্না আসে
হল তার কি দুর্মতি, আহাহা, ফাগুন মাসে—

আর তারপর ঃ 'খুড়ো গেল হাত দেখাতে—হেসে হেসে হাত দেখাতে।' এর মধ্যে কতগুলি পদ তো একেবারেই মেদাক্ত, 'তবু হায়, তবুও শোন' বা আহাহা'র মতো, যা বাড়তি কিছু বলে না, কেবলই শব্দভার হয়ে থাকে। তাছাড়া, ভাবনা অভাব অসুখবিসুখ কিছুই ছিল না, তবু কোন্ দুর্মতিতে সে হাত দেখাতে গেল, এসব কথা অগ্রিম বলে দেওয়ায় (এমনকী এ পাড়ায় ভাইপোটির যে তাতে কান্নাও আসছে এতটা জেনে ফেলায়) এর ক্রমোন্মোচন বা চমক কোনোটাই আর বজায় থাকবার কথা নয়। শোধিত কবিতায় সমস্তটা সংহত হয়ে পাঠকের কাছে একটা উত্তেজনা আনতে পারে। হুকো হাতে হাসিমুখে যে ছিল, হঠাৎ কী খেয়ালে হাত দেখাতে গেল সে, আর ফিরে এল শুকনো সরু ঠকাঠক কাঁপছে দাঁতে। তারপর আবার দুটো বাড়তি লাইন বর্জন করতে হল শেষ পাঠে : মুখে তার নাইকো হাসি, হুঁকো তার রইল পড়ে/ভয়ে তার কপাল বেয়ে ঝরে ঘাম দারুণ তোড়ে', কেননা এই পুরো বর্ণনাটা সংক্ষেপে তো ব্যঞ্জিতই হয়ে আছে পরের লাইনদুটিতে : 'শুধালে সে কয় না কথা, আকাশেতে রয় সে চেয়ে/মাঝেমাঝে শিউরে ওঠে, পড়ে জল চুক্ষু বেয়ে।' এমনকী, হুঁকো বা ভয় বা দারুণ তোড় কথাগুলি সামনে থেকে সরে যাওয়ায় শেষ এই লাইনদুটি প্রায় যেন চন্ডীদাসের বিরহ-খিন্না রাধার মূর্তি মনে ধরিয়ে দিয়ে বাড়তি একটা কৌতুকময় ছবিও তৈরি করতে পারে।

এইবার স্বাভাবিক যে লোকে দৌড়ে এসে জানতে চাইবে কী হয়েছে। পূর্বতন বাহুল্য-লাইনগুলি সরিয়ে দেবার ফলে এখানে লোকজনের উৎকণ্ঠাটাও তাজা চেহারায় পৌঁছতে পারল। এবং তখন, পুরোনো লেখায় ছিল ঃ

খুড়ো বলে, 'বছর বছর ভুগে মরি ব্যারাম হয়ে
এতদিন কেউ বলেনি, না জেনেই আসছি সয়ে!
হাড়ে হাড়ে সর্দিকাশি, গাঁটে গাঁটে বাতের বাসা
চারিদিকে জ্বরের হাওয়া মগজেতে ব্যারাম ঠাসা!

একথাটা বল্লিনি কেউ, হেসে হেসে আসতি ফিরে,
এদিকে মোর প্রাণটা গেল, সেকথা কেউ ভাবলি নি রে।'

কিন্তু এ তাহলে আরেকটা ভিন্ন সমস্যা। যার অসুখবিসুখ ছিল না বলে জানতাম, এতদিনে সে টের পেয়েছে যে তার অসুখ ছিল বিস্তর, অথচ সে জানত না তা, জানায়ওনি কেউ। এরও মধ্যে একটা রঙ্গ আছে বটে, কিন্তু এই সবটাকে পালটে দিয়ে যখন লেখা হল : এতদিন অসুখ হয় নি, তবু তার আয়ুর রেখা ফাঁড়ায় ভরা, সেই ফাঁড়ার ওপর দিয়েই এতদিন সে জীবন কাটিয়েছে এই আতঙ্কে এখন সে মুহ্যমান, আর তখন তার বিলাপ জেগে ওঠে অবিশ্বাস্য এই মৌলিক প্রশ্নে 'হঠাৎ আমার প্রাণটা গেলে তখন আমায় রাখবে কে রে' ('গুগাবাবা'য় সত্যজিৎ রায়ের সেই 'মুণ্ডু গেলে বাঁচব না কি'র পূর্বসূরি যেন)। নিজের মৃত্যুশোকে নিজেই কেঁদে আকুল হবার শেষ মজাটা পরিবর্তিত পাঠে যেমন ধরা পড়ে, 'সন্দেশ'-এর কবিতায় ঠিক তা ছিল না। চলতি পাঠে পাড়াপ্রতিবেশীরা দ্রষ্টা মাত্র, জিজ্ঞাসুর বেশি নয়, আপনমনে বিলাপরত খুড়োর ছবিটাকে শুধু ফ্রেমে ধরা আছে সেখানে, আগে তাদের আরো একটু জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ফ্রেমের মধ্যে, সাংসারিক ভাবে, সান্ত্বনা দিয়ে তারা বোঝাতে গিয়েছিল যে ভয়ের কিছু নেই, কিন্তু মিথ্যে হল সান্ত্বনা সব মিথ্যে হল বুজিয়ে বলা'। এই সহজ সান্ত্বনাকে সরিয়ে নেবার ফলে নন্দখুড়োকে আমরা তার নিজস্ব ফ্রেমটুকুর মধ্যেই যে দেখতে পাই, সেইটেই অনেক ভালো।

এইরকমই বাদ গিয়েছে 'রামগরুড়ের ছানা' থেকেও, আগে যার নাম ছিল 'হেস না'। এ-কবিতার ছয়ের স্তবকে 'ঝোপের ধারে ধারে রাতের অন্ধকারে' যে হাসির ঠারে ঠারে জোনাক-জ্বলার কথা আছে, আগে তার চেহারা ছিল 'লাখ জোনাকির চক্ষু ঠারা হাসতে শেখায় কারে?' এ-অংশটা পালটে দেবার ফলে 'ঝোপের ধারে ধারে'র সঙ্গে 'হাসির ঠারে ঠারে' মিলে গিয়ে একটা ধ্বনিহিল্লোল তৈরি হয়েছে, অবান্তর আকস্মিক প্রশ্নটাকে সরিয়ে দেওয়াও সম্ভব হয়েছে। 'জোনাক জ্বালে আলোর তালে'র মধ্যে তালটা এমন স্বভাবতই এসে পৌঁছয় যে হাসির আনন্দটাকে যেন আপনা থেকেই ছুঁতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই হাসিতে যে রামগরুড়ের ব্যথা লাগছে, এই কথাটাতে এসে পৌঁছবার আগে আরো একটি স্তবক ছিল পুরোনো লেখায় ঃ

হাসির গন্ধ পেয়ে স্বপ্নে তাদের মেয়ে
হাঁসছ? বলে চমকে ওঠে
চাঁদের পানে চেয়ে।

বনে, গাছে গাছে, দখিন হাওয়ায়, মেঘের কোণে আর ঝোপের ধারে জোনাকির আলোয় হাসির কথা বলবার পর চাঁদের হাসির এই কথাটা বললেন কিছু দোষের ছিল

না। কিন্তু পরে হয়তো সুকুমার রায় এর একাধিক অসংগতি লক্ষ করে থাকবেন। রাতের অন্ধকারের পরের স্তবকেই কি 'চাঁদের পানে' চাইবার কথাটা দাঁড়াত ঠিক? আর তাছাড়া, 'স্বপ্নে তাদের মেয়ে'—কাদের মেয়ে? রামগরুড়ের ছানাটাই তো গোটা একটা জাত, তারপর আবার আলাদা করে একজন মেয়ের প্রসঙ্গ ওঠে কেন হঠাৎ? 'পেয়ে-চেয়ে'-র মধ্যে নিছক মিলের তোড়েই কি চলে এল ওই মেয়ে? কারণ যাই হোক, ফল হিসেবে কবিতাটির প্রবাহের মধ্যে এর কিছুটা বাহুল্য-অবস্থান বুঝতে পেরেই নিশ্চয় সরাতে হল স্তবকটিকে।

তালিকার স্রোত তৈরি হতে থাকে যেসব কবিতায়, সেইখানেই অবশ্য মাত্রাবোধের সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা। আর সুকুমার রায়ের বেশ কয়েকটি কবিতাতেই তো নানারকম বাতিকের বিচিত্র উদাহরণের তালিকা দেখতে পাই। বাতিকের কথা ছেড়ে দিলে, দুনিয়ার ভালোমন্দ সমস্তকিছুর একটা বিকরণ আছে 'ভাল রে ভাল' লেখাটিতে। এই লেখাও আগে ছিল বত্রিশ লাইনের, এখন চব্বিশ। এখানেও মাঝখানে কয়েকটি লাইনকে সরিয়ে দিয়ে সুকুমার রায় আরেকটু স্বচ্ছন্দ করে দিয়েছেন কবিতাটিকে। পোলাও কোর্মা আর মাছপটলের দোলমার পর আরো ছিল আগে ঃ

চালকুমড়োয় চালতা ভাল
ঝিঙের টকে পলতা ভাল

কাঁসি ঢাক টিকি টাকের পরে আবারও ছিল

খেলাও ভাল পড়াও ভাল
মিঠেও ভাল কড়াও ভাল
কালও ভাল আজও ভাল
ফাঁকিও ভাল কাজও ভাল
লাঠিও ভাল ছাতিও ভাল
ঘুঁষিও ভাল লাথিও ভাল

আর তারপরে আসে ঠেলাগাড়ি ঠেলবার কথা। এ-রকম লেখার একটা স্রোতগত নেশা আছে, মিলের ঝোঁকে শব্দযুগ্ম-কে পর পর বসিয়ে যাবার নেশা। মনে হয় পরবর্তী এই অংশটা এসে যাচ্ছে সেই নেশার ঝোঁকে, ইচ্ছে করলে আরো অনেকটা টেনে নেওয়া যায় একে। কিন্তু 'পাঁউরুটি আর ঝোলাগুড়'-এর সর্বোত্তমে পৌঁছবার জন্য আর খুব বেশি সময় দেওয়া উচিত বলে মনে হয় না, কৌতুক তাহলে কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়বারই সম্ভাবনা, তাই ওই অংশের বর্জনেও সুকুমার রায় তাঁর অভ্রান্ত সংযমবোধেরই পরিচয় দেন।

কেবল যে এই কয়েকটি উদাহরণেই, তা নয়। শব্দের বদল পঙ্‌ক্তির বদলের

কিছু বা বর্জন কিছু বা গ্রহণের আরো অনেক এমন নমুনার সংকলন করা সম্ভব। সম্ভব এইটে দেখা যে 'কুমড়োপটাশ' এর 'হুঁকোর জলে আলতা গুলে লাগায় গালে ঠোঁটে'র মতো চমকপ্রদ লাইনও কিন্তু 'সন্দেশ'-এর পাঠে ছিল না আগে, কিংবা গোঁফচুরির গোঁফ কি কারো কেনা'ও এক সংশোধিত উচ্চারণ, 'সন্দেশ'-এ যার চেহারা ছিল ঃ

গোঁফকে বলে তোমার আমার-গোঁফ কি কারো বোঝা?
গোঁফের আমি গোঁফের তুমি এই তো বুঝি সোজা।

'এই তো বুঝি সোজা' আর 'তাই দিয়ে যায় চেনা'র মধ্যে বদলটা একেবারে চরিত্রগত, গোটা লেখাটাই এক নতুন তাৎপর্য পেয়ে যায় শেষদুটি লাইনের নতুন এই রূপে।

সুকুমার রায় লিখেছিলেন যে শিল্পে বা কাব্যে অলংকার-উপমার জায়গা আছে ঠিকই, 'কিন্তু সেই অলংকার ও উপমা ব্যাপারটাই যখন সর্বেসর্বা হইয়া উঠিতে চায় তখনই আশঙ্কার কথা'। এই আশঙ্কার বোধটা তাঁর মনে খুব তীব্রভাবেই ছিল বলে রোগশয্যায় শুয়েও মুদ্রিত আপাতসফল পুরোনো লেখাগুলির নতুন সংস্কারে তাঁর ক্লান্তি ছিল না কোনো, হাসির লেখাও কারো কাছে যেন কোনো 'অত্যাচারে পরিণত' না হয় সেকথা ভাবতে হয়েছে তাঁকে, শিল্পীর 'আত্মনিষ্ঠা' নিয়ে তাঁর 'অত্যুক্তিকে বাঁধতে হয়েছে একটা সুষম মাত্রায়। নিষ্ঠাময় এই মাত্রাবোধেই তাঁর শিল্পীস্বভাবের মস্ত এক পরিচয়।

সুকুমার রায়-এর কবিতা ঃ অসম্ভবের শিল্প

সুমন গুণ

কোনো লেখার ভাষাশিল্প নিয়ে দুভাবে কথা বলা যায়। একটা হলো সেই ভাষার যে-চোখে-দেখা অংশ, যেমন ছন্দ-অলঙ্কার ইত্যাদি, শুধু তার ওপরে আলো ফেলা। আর কখনো সেই ছন্দ-অলঙ্কার ইত্যাদি ছুঁয়েই ভাষার ওপারে যে-ভাষা, তার কথা, আকাশের ওপারে সেই আকাশের কথাও বলা যেতে পারে। আমি আপাতত সেই অতিরিক্ত আকাশের দিকেই হাত বাড়াতে চেষ্টা করব।

পাখা হলে পাখি হয় ব্যাকরণ বিশেষে—
কাঁকড়ার দাঁড়া আছে, দাঁড়ি নয় কিসে সে?

এই কথাটুকুর মধ্যে একটা তাত্ত্বিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা আছে। সুকুমার রায়ের শিল্পের যে দর্শন, তা এই কথায় অভ্যন্তরীণ যুক্তিসহ ধরা পড়েছে। ব্যাকরণের নিয়ম মেনেই, তার মধ্যে যে বিভ্রাট, তাকে সমর্থন জানানো হচ্ছে এখানে। আর এই বিভ্রাট, এই অসঙ্গতি দেখানোর শিল্পের চর্চাই তো করেছেন সুকুমার রায়। কিন্তু বলার কথা হলো, সেই উদ্দেশ্যপূর্ণ বিভ্রান্তিকে যতই অসম্ভব মনে হোক, কখনোই কিন্তু পড়তে অস্বস্তি হয়না আমাদের। এটা সুকুমার রায়-এর বহুতল ভাষাশিল্পের দাপটের জন্যই সম্ভব হয়েছে। হাঁসজারু বা বকচ্ছপ তো আমাদের সংস্কৃতির দুটি স্বাভাবিক কুশীলব হিসেবেই এখন গ্রাহ্য হয়ে গেছে। আর টকটক গন্ধ তো আমরা পড়ি এই সময়ের কবিতা পড়ার মন নিয়েই, বরং এটা ভেবেই ঈষৎ বিস্মিত হই যে, আমাদের ভাষার আধুনিক স্থাপত্যগুলি নির্মিত হবার আগেই সুকুমার রায়ের প্রতিভা নতুন সময়ের নকশা বানিয়ে নিয়েছিল।

হাঁড়ি নিয়ে দাড়িমুখো কে যেন কে বৃদ্ধ
রোদে বসে চেটে খায় ভিজে কাঠ সিদ্ধ।

খাদ্যটি রসনার পক্ষে কতটা উপাদেয় সেটা ভাবার আগেই ধ্বনির রহস্যময় মজা আমাদের টেনে নেয়, এবং তার-ই মোহে তারপর ভিজে কাঠ সেদ্ধ চেটে খাবার ছবিটির পুলক আরো পেয়ে বসে।

এভাবে ধ্বনির আলো দেখিয়ে অসম্ভব গন্তব্যের দিকে আমাদের তাকাতে বাধ্য করেন তিনি।

পূবদিকে মাঝরাতে ছোপ দিয়ে রাঙা
রাতকানা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা

এই ছবিটির মধ্যে যে অতিরিক্ত অর্থময়তা আছে সেটাই সুকুমার রায়কে সাধারণ

ছড়াকারের থেকে সবদিক থেকে আলাদা করে রাখে। প্রত্যেকটি শব্দ যেন একটি গোটা ছবির একেকটি টান। খেয়াল করে দেখুন, প্রতিটি শব্দই কিন্তু কোনো -না-কোনো ভাবে একটি করে দৃশ্যের জন্ম দিচ্ছে। একটি করুণ অথচ জটিল, আচ্ছন্ন কিন্তু প্রত্যক্ষ সম্ভাবনা আমরা টের পাচ্ছি বলেই এই সময়ের কবিতা পড়ার মন নিয়েই পড়তে পারছি আমরা কথাটি।

রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আমি নানা লেখায় ব্যবহার করার লোভ সামলাতে পারিনি ঃ

তব অঙ্গে অত্যুক্তি কি করনা বহন
সন্ধ্যায় যখন
দেখা দিতে আসো
তখন যে হাসি হাসো
সে তো নহে মিতব্যয়ী প্রত্যহের মতো
অতিরিক্ত মধু কিছু তার মধ্যে থাকে তো সংহত

কথা হচ্ছে, এই যে অতিরিক্ত মধু, যা রচনার অনির্বচনীয়তাকে রক্ষা করে, তা কি সব বয়সের পাঠকের কাছেই সমানভাবে গ্রাহ্য হতে পারে? তা হয়তো নয়। চ্যাপলিনের ছবির ভাঁজে ভাঁজে যে বিভিন্ন বুনন, তার সবকিছুই কি শিশু-কিশোরের মন নিয়ে সবসময় ছোঁয়া যায়? একটি কাজ নানারকম স্তর নিয়ে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, এই হয়ে-ওঠাটাই তার লক্ষ্য, এই লক্ষ্যের কতটা কাছে অথবা দূরে রইল লেখাটি, তা-ই তার সামর্থ্য চিহ্নিত করে দেয়।

এইরকম অজস্র স্বয়ম্ভর ছবিতে ভর্তি সুকুমার রায়ের কবিতা। কয়েকটি আমাদের অনেকেরই মুখস্থ ঃ

সোয়াস্তি নেই মনে মেঘের কোণে কোণে
হাসির বাষ্প উঠছে ফেঁপে
কান পেতে তাই শোনে

হাসির বাষ্প মেঘ হয়ে ফেঁপে উঠছে, এই কথাটির মধ্যে একটি অস্পষ্ট স্বাভাবিকতার অংকও কিন্তু মিলে যাচ্ছে, তাই ছবির ডানা মেলে দিয়ে ভেসে যেতে এক মুহূর্তও লাগছে না লেখাটির।

এইভাবে হালকা মেঘের পানসে ছায়ার বলতে পারেন সুকুমার রায়, বলতে পারেন ঃ

চাঁদের আলোয় পেঁপের ছায়া ধরতে যদি পারো
শুঁকলে পরে সর্দিকাশি থাকবে না আর কারো

অধরা বলেই ওই দুরভিসন্ধিমূলক ছায়াটির জন্য আমাদের রোমাঞ্চ হয়।

কিংবা ঃ

....এই মনে কর রোদ পড়েছে ঘাসেতে
এই মনে কর চাঁদের আলো পড়ল তারই পাশেতে

সহজ মনে হলেও দুটি ছবিকে পাশাপাশি এমন অসম্ভবভাবে মিশিয়ে দেওয়ার কাজটি যে মোটেই সহজ নয়, সেটা যাঁরা এই কাজের সঙ্গে বেদনাদায়কভাবে যুক্ত, তাঁরা ভালোই জানেন।

সুকুমার রায়ের সামর্থ এখানেই যে তিনি এই দুস্তর কাজটি এমনভাবে সম্পন্ন করেছেন যে পাঠকের কাছে এর নেপথ্য পরম্পরাটি উহ্য থেকে যায়। এটা তিনি পেরেছেন কবিতার ভাষাশিল্পের ওপর তাঁর স্বাভাবিক দখল ছিল বলেই। মিল-অনুপ্রাস নিয়ে অভাবনীয় সব নিরীক্ষা করেছেন তিনি, শব্দকে দিয়ে সবরকম কাজ করিয়ে নিয়েছেন। কতরকমের মিল আমরা পড়েছি তাঁর লেখায়, একটু মনে করা যাক ঃ

'এ গোঁফ যদি আমার বলিস করব তোদের জবাই'—
এই না ব'লে জরিমানা কল্লেন তিনি সবায়

কিংবা ঃ

হাসছি মোরা হাসছি দেখ, হাসছি মোরা আহ্লাদি
তিনজনেতে জটলা করে ফোকলা হাসির পাল্লা দি

অনুপ্রাসের খেলায় সুকুমার রায় যে-দাপট দেখিয়েছেন, বাংলা কবিতায় তার কোনো জুড়ি নেই। বলার কথা হলো, শুধু অনুপ্রাসের জন্যই অনুপ্রাস দেবার একমাত্রিক কৌশলে বিশ্বাস ছিল না তাঁর। গোপনতম হলেও একটা অর্থময় যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করতেন তিনি। 'শশ্মানঘাটে শষ্পানি খায় শশব্যস্ত শশধর' জাতীয় কালোয়াতি খুব বেশি পাওয়া যাবে না তাঁর লেখায়।

একদিন এনে তারে এইখানে ভুলিয়ে
গেঁটেবাত ঘেঁটে-ঘুটে সব দেব ঘুলিয়ে

কিংবা ঃ

ভর দিতে ভয় হয় ঘর বুঝি পড়ে
খক্ খক কাশি দিলে ঠকঠক নড়ে
————————
মেরামত দিনরাত কেরামত ভারি
থুরথুরে বুড়ি তার ঝুরঝুরে বাড়ি

ভালো করে খেয়াল করলেই বোঝা যাবে যে অনুপ্রাসের ঘনঘটা কিন্তু বলার

সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না, তার একটা ইশারা থেকে যাচ্ছে। খক্ খক কাশির সঙ্গে ঠকঠক করে বাড়ি নড়ার শব্দের কোনো অসঙ্গতি নেই। আবার, বুড়ি যদি থুরথুরে হয়, তবে তার বাড়ি তো ঝুরঝুরে হতেই পারে।

বৈঠকী একটা চাল বজায় রাখতে অনেক সময় তাঁর বিশিষ্ট ধরনকে ব্যবহার করেছেন সুকুমার রায়। যেমন ঃ

ঢের হয়েছে! আয় দেখি তুই বোস তো দেখি এদিকে
ওরে গোপাল গোটাকয়েক পান দিতে বল খেঁদিকে

মজা করে হাসানোর লক্ষ্য তো ছিলোই তাঁর। কিন্তু যে-সংযত বৈচিত্র্যের মাত্রা ছড়িয়ে আছে তাঁর কবিতায়, তা দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। 'কাতুকুতু বুড়ো' আর 'রামগড়ুরের ছানা' লেখা দুটি পাশাপাশি পড়লে হাসি নিয়ে সুকুমার রায়ের ভাবনার স্বাচ্ছন্দ্য বোঝা যায়। কাতুকুতু বুড়োর স্বভাব এইরকম ঃ

তোমায় দিয়ে সুরসুড়ি সে আপনি লুটোপুটি
যতক্ষণ না হাসবে তোমার কিচ্ছুতে নাই ছুটি

আর

রামগরুড়ের বাসা ধমক দিয়ে ঠাসা,
হাসির হাওয়া বন্ধ সেথায়
নিষেধ সেথায় হাসা

কল্পনার এক মেধাবী সচ্ছলতা সুকুমার রায়ের লেখাগুলিকে এমন বহুমাত্রিক করে তুলতে পেরেছে। সুকুমার রায়ের কবিতায় ফুল ফোটে ঠাস ঠাস, দ্রুম দ্রাম করে, এবং সে-ফুলের গন্ধ শাই শাই ছুটে যায়। হিম পড়ে হুড়মুড় ধুপধাপ করে। চাঁদ ডোবে গব গব গবা-স। কখনো

ঢপঢপ ঢাক ঢোল ভপভপ বাঁশি
ঝনঝন করতাল ঠনঠন কাঁসি

কেন ভপভপ? এই প্রশ্ন আর তার উত্তরে অসম্ভব সম্ভাবনার মধ্যেই সুকুমার রায়ের কবিতার সাফল্য ধরা আছে। তিনি তো

তেজপাতে তেল কেন? ঝাল কেন লঙ্কায়?
নাক কেন ডাকে আর পিলে কেন চমকায়?

—এই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য কবিতা লেখেননি। তিনি এক সম্ভাবনাকে উসকে দেবার জন্য লিখেছেন, আর, আমরা সেই প্ররোচনা সরবে গ্রহণ করেছি।

এই গ্রহণ করার রসায়নটি বেশ জটিল আর মজার। বাংলা সাহিত্যে সুকান্ত ভট্টাচার্যের অবস্থানটি একই সঙ্গে স্পষ্ট অথচ রহস্যময়। তাঁর মত জনপ্রিয় কবি আমাদের

ভাষায় দু-তিনজনের বেশি নেই। আবার, তাঁকে কবি হিসেবে তুচ্ছতম মনে করেন এমন পাঠক-সমালোচকের মন্তব্যও হামেশাই এখানে ওখানে নিশ্চিন্তে ছাপা হয়। তাঁরই এক গৃহীত সতীর্থ সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্ভ্রমের সঙ্গে সম্পাদনা করেন তাঁর কবিতা সমগ্র, সুকান্তর জনপ্রিয়তাকে তাঁর কবিপ্রতিভার কালজয়ী স্বীকৃতি হিসেবেই দেখতে চান। আবার, বুদ্ধদেব বসু, সুকান্তর প্রতিভাকে সম্মান জানিয়েও আক্ষেপ করেছিলেন এই বলে যে, সুকান্ত বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের আদর্শের কাছে নতজানু হয়ে নিজেকে নষ্ট করেছেন। এইসব মতবিরোধের পাশ দিয়ে সুকান্ত ভট্টাচার্যের জনপ্রিয়তার স্রোত, নিশ্চিন্তে, মহাকালের দুর্গম ও অন্ধকারময় গিরিপথ ধরে অনন্তের দিকে বয়ে চলেছে।

আরেকটি নজির ঃ মধুসূদন দত্ত। বুদ্ধদেব বসু মধসূদন সম্পর্কে লেখার শিরোনাম দেন 'মাইকেল', এবং বলেন ঃ 'মাইকেলি ছন্দের প্রধান দোষ এই যে সেটা আগাগোড়াই অত্যন্ত বেশি কড়া, তাতে নিচুগলা কখনো শুনি না, নরম সুর কখনো বাজে না, সেটা কোনোখানেই গান নয়, সমস্তটাই বক্তৃতা'। 'কখনো', 'সমস্তটাই', 'আগাগোড়াই' শব্দগুলির মোহে পড়ে বুদ্ধদেব একটানে যা বলে গেলেন, তাতে এক স্বাদু সরলীকরণ হলো, পড়লেই আমরা বুঝতে পারি লেখক এটা বললেন বটে, কিন্তু এটাই তাঁর চূড়ান্ত কথা বললে আমাদের না ভাবলেও চলবে। আমরা, মানে বাঙালি পাঠকেরা তাই সুকান্তর মতোই, মধুসূদন সম্পর্কেও বুদ্ধদেবের কথা নিঃশব্দে অগ্রাহ্য করেছি। বাংলা কবিতার শুরু, উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগে যে মধুসূদন থেকেই, একথা আজ জোর করে কাউকে বুঝিয়ে দিতে হয় না। আর যেটা বুদ্ধদেব 'দোষ' বলছেন মেঘনাদবধ-এর, সেখানেই যে তার শক্তি, একথা আজ জোর করে কাউকে বুঝিয়ে দিতে হয় না। আর যেটা বুদ্ধদেব 'দোষ' বলছেন মেঘনাদবধ-এর, সেখানেই যে তার শক্তি, একথাও বলছেন এখন অনেকেই।

এই লেখার শুরুর উদ্ধৃতিটিতে ব্যাকরণ মেনেই ব্যাকরণবিভ্রাটকে সমর্থন জানিয়েছিলেন সুকুমার রায়। এবার যে দুটি লাইন তুলছি তাঁর, সেখানে তিনি পরিষ্কার বলছেন ঃ

হাঁস ছিল, সজারু, (ব্যাকরণ মানি না),
হয়ে গেল 'হাঁসজারু' কেমনে তা জানি না

ব্যাকরণ শুধু সুকুমার রায় নন, আমরাও মেনে চলার একগুঁয়েটি দেখাইনি বলেই হাঁসজারু, হাতিমি, বকচ্ছপেরা আমাদের সংস্কৃতির অভিধানে অবধারিতভাবে থেকে গেছে আর তাদের স্রষ্টা হিসেবে সুকুমার রায় শিরোধার্য হয়ে আছেন।

দেশ-কালের প্রতিচ্ছবি ঃ সুকুমার রায়ের কবিতা

মহঃ কুতুবুদ্দিন মোল্লা

বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর যোগ্য উত্তরাধিকারী সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩) বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। মাত্র ৩৬ বছরের স্বল্পায়ু জীবনে তিনি ছড়া, কবিতা, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনা করে বাংলা শিশু সাহিত্যে অমরত্ব পেয়েছেন। ১৯৬০ খ্রীঃ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যায় ডবল অনার্স নিয়ে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গুরুপ্রসন্ন ঘোষ স্কলারশিপ পেয়ে বিলেতে গিয়ে ১৯১১ খ্রীঃ ফটোগ্রাফি ও প্রিন্টিং টেকনোলজিতে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয়, যিনি প্রথম বিলেত থেকে এফ. আর. সি. এস ডিগ্রি লাভ করে দেশে ফেরেন। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় ১৯১৩ খ্রীঃ মাসিক পত্রিকা 'সন্দেশ' প্রকাশিত হয় এবং ঐ পত্রিকায় সুকুমার রায়ের প্রথম রচনা 'খিচুড়ি' প্রকাশিত হয় ১৯১৪ খ্রীঃ। পরে তিনি এই 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন।

সুকুমার রায়ের সাহিত্য রচনায় বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়—

(১) তাঁর রচনায় সরস বৈদগ্ধ্যের ছাপ স্পষ্ট।

(২) তাঁর লেখায় কৌতুক আছে, মজা আছে, জ্ঞান আছে, ভাল লাগার বিষয় আছে এবং আছে পরিমিতিবোধ।

(৩) তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে অসম্ভবের ছন্দেতে দুলতে দুলতে শিশু কিশোররা এবং বড়োরাও মাতাল হয়ে রঙ্গে মেতে ওঠে।

(৪) হাল্‌কা শ্লেষযুক্ত ছড়া-কবিতা রচনা করে তিনি সমকালীন পটভূমি—দেশ, কাল, সমাজ প্রভৃতি ফুটিয়ে তুলেছেন।

(৫) তিনি পৈতৃক উত্তরাধিকার সূত্রে একই সঙ্গে তিনটি জিনিস আয়ত্ত করেছিলেন। যথা—(ক) বৈজ্ঞানিক মানসিকতা (খ) সাহিত্য রসবোধ (গ) চিত্রবিদ্যা। আর এই গুণাবলী তাঁর রচনাকে মাধুর্যপূর্ণ ও উন্নতমানের করেছে।

(৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়—"সুকুমারের লেখনী থেকে যে অবিমিশ্র "হাস্যরসের উৎসধারা বাংলা সাহিত্যকে অভিষিক্ত করেছে, তা অতুলনীয়। তাঁর সুনিপুণ ছন্দের বিচিত্র ও স্বচ্ছল গতি, তাঁর ভাবসমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা প্রতি পদে চমৎকৃতি আনে।"

(৭) ড. ক্ষেত্রগুপ্তের ভাষায়—

"তাঁর সব লেখাই হাস্যপ্রধান। সে হাসি বুদ্ধিতে ঝলমল করছে।.....তিনি বাংলার

কিশোর মনকে শুধু পূর্ব পরিচিত আজগুবি রসে ভরিয়ে তুললেন না, ননসেন্স—অ্যাবসার্ডের খেয়ালিপনায় এক নতুন জগতে নিয়ে গেলেন। এই রস আমাদের সাহিত্যে ছিল না। উৎসটা বিদেশি হলেও, এর শিকড় আছে বিশ্ব-মানুষের মধ্যে।"

(৮) তাঁর রচনায় খেয়ালি কল্পনায় এক অদ্ভুত জগৎ তৈরী হয়েছে।

(৯) শব্দচয়ন নৈপুণ্য ও ছড়ার ছন্দের প্রয়োগে তাঁর কবিতার মাধুর্য অপরূপ রূপ লাভ করেছে।

(১০) তাঁর মধ্যে ছিল একটা রসিক মন। তাই বিষয়গুলিকে তিনি wit, humour-এর ছটায় হাস্যরসোচ্ছল করে প্রকাশ করে জীবন্ত করে তুলেছেন; তাঁর রসিকতার স্পর্শে পাঠক-মন সঞ্জীবিত হয়।

সুকুমার সমগ্রে তিনটি সংকলন ('আবোল তাবোল', 'খাই খাই' ও 'অন্যান্য কবিতা')-এর কবিতাগুলি শিশুসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এইসব কবিতাগুলির বাইরের আবরণ কিছুটা লঘু হলেও ব্যঙ্গে ও কৌতুক-কটাক্ষে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে তার গুরুত্ব যথেষ্ট। বিশেষত তাঁর 'আবোল তাবোল' গ্রন্থে এই ব্যঙ্গ-কৌতুক-কটাক্ষ শিশুমন বুঝতে না পারলেও বড়দেরকে ভাবিয়ে তোলে—তারা ব্যঙ্গার্থে নিহিত অর্থ উপলব্ধি করে। ফলে তাঁকে শুধুমাত্র ছোটদের লেখক বললে সবটাই বলা হয় না। আর বড়দের কবি —লেখক বলে চিহ্নিত ও করা যায় না। আসলে তাঁর কবিতা ছোট বড়ো সবার কাছে মনোগ্রাহী ও আকর্ষণীয়। শ্রদ্ধেয় আজহার ইসলাম মন্তব্য করেছেন—"সুকুমার রায় তাঁর লেখায় হাস্যরসের ধারাকে তাঁর উদ্ভট অথচ সৃজনশীল কল্পনার সঙ্গে অবিমিশ্র করে প্রকাশ করেছেন। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণত তাঁর স্বকীয় ভাবনার অনুগামী; তাতে তাঁর নিজস্বতাই প্রাধান্য পায়।" ('বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)', অনন্যা, ঢাকা, ২০০১ (তৃতীয় সংস্করণ), পৃষ্ঠা ৬৬১)।

সুকুমার রায়ের বেশ কিছু কবিতা ছোটদের মনোরঞ্জক হলেও তার আবেদন ও ভূমিকা বড়দের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তার এই শ্রেণী কবিতায় সমকালীন দেশ-কাল ও রাজনৈতিক অবস্থা সুন্দরভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে; সেখানে আপাত হাসির ফোয়ারার অন্তরালে তীব্র তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ শ্লেষ ও বিদ্রূপবাণ কষায়িত হয়েছে। 'আবোল তাবোল', 'গোঁফ চুরি','সৎপাত্র', 'কাতুকুতোবুড়ো','বাবুরাম সাপুড়ে', 'একুশে আইন', 'হুকোমুখো হ্যাংলা', 'রামগরুড়ের ছানা', 'খাই খাই', 'খুড়োর কল','গানের গুঁতো', 'লড়াই-খ্যাপা', 'ভুতুড়ে খেলা', 'নারদ নারদ', 'হাতুড়ে', 'চোর ধরা', 'ভালোরে ভালো', 'বুঝিয়ে বলা','হাত গণনা', 'গন্ধ বিচার', 'ভয় পেয়ো না', 'সঙ্গীহারা','বিচার','সাহস', 'দিনের হিসাব', 'হিতে বিপরীত', 'কেন সব কুকুরগুলো', 'ছিটেফোঁটা', 'অসম্ভব নয়',

'তেজিয়ান', 'জীবনের হিসাব','জ্বালা-কুঁড়ো সংবাদ','খাই খাই' প্রভৃতি এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য কবিতা।

সুকুমার রায় যখন লিখছেন, তখন দেশ পরাধীন। সুতরাং একজন সমাজসচেতন শিল্পী হিসেবে তাঁর লেখার মধ্যে হাল্‌কা হাসির ফোয়ারায় স্বদেশ ও সমাজের চিত্রও উদ্ভাসিত। দেশকে জড়তা ও পরাধীনতা থেকে মুক্ত করতে রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা' কাব্যের প্রথম কবিতা 'সবুজের অভিযান'-এ তাজা-তরুণ-যৌবনের আহ্বান করে বন্দনা গান গেয়েছেন; সুকুমারও তেমনি 'আবোল-তাবোল'-এর সূচনায় সুনিপুণ তীক্ষ্ণ রসিকতায় যৌবনবন্দনাই করেছেন—

"আয় রে ভোলা খেয়াল-খোলা
স্বপনদোলা নাচিয়ে আয়,
আয় রে পাগল আবোল তাবোল
মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়।
... ...
আয় খ্যাপা-মন ঘুচিয়ে বাঁধন
জাগিয়ে নাচন তা ধিন্ ধিন্,
আয় বেয়াড়া সৃষ্টি ছাড়া
নিয়মহারা হিসাবহীন।"
('আবোল তাবোল', সুকুমার রচনা সমগ্র)

'গোঁফ চুরি' কবিতায় রসাল ভঙ্গিতে শিশুমনের উপযোগী করে হেড অফিসের বড়বাবুর খামখেয়ালিপনা ও স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশিত হয়েছে। অফিসের ইংরেজ বড়বাবু যে অন্যান্যদের উপর কি পরিমাণে অন্যায় -অত্যাচার ও যথেচ্ছাচার করতো তা এখানে প্রকাশিত। নিজের গোঁফ চুরি যায়নি। শুধু তাঁর গোঁফ নোংরা ছাঁটা ও থ্যাংরা ঝাঁটার মতো বিশ্রি বলেই তিনি নিজের গোঁফকে অস্বীকার করে অন্যকে আক্রমণ করে বলে—

"অফিসের এই বাঁদরগুলো, মাথায় খালি গোবর
গোঁফ জোড়া যে কোথায় গেল, কেউ রাখেনা খবর।
ইচ্ছে করে এই ব্যাটাদের গোঁফ ধরে খুব নাচি,
মুখ্যগুলোর মুণ্ডধরে কোদাল দিয়ে চাঁচি।" ('গোঁফ চুরি')

—অফিসের বড়বাবুর অপদার্থতা ও বোকামি এখানে তুলে ধরেছেন কবি।

তাঁর 'বাবুরাম সাপুড়ে', কবিতাটি সাপের রোমাঞ্চকর কাহিনীতে শিশুমনে আনন্দ ভরিয়ে দেয়। কিন্তু এই সরস হাল্‌কা হাসির ফোয়ারায় সমকালীন ইংরাজ সরকারের অত্যাচারের আর এক নারকীয় রূপ রূপকার্থে ব্যঞ্জিত করে। কবিতাটির সাধারণ অর্থ

হল—বাবুরাম নামক এক সাপুড়ের কাছে সাপ খেলা দেখার অভিলাষ—যে সাপের চোখ-শিং-নোখ কিছু নেই, সেই সাপ ছোটে না বা হাঁটে না, কাউকে কামড়ায়ও না। এমনকি কোন উৎপাতও করে না, সেই জীবন্ত সাপকে ডাণ্ডা দিয়ে মেরে ঠাণ্ডা করে দিয়ে নিশ্চিন্ত ও ভয়শূন্য হয়ে আনন্দ পাওয়ার কথা শিশুমনে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এর নিহিতার্থ গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাহিনী সুন্দরভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে। ১৯১৯খ্রীঃ ১৩ এপ্রিল অবিভক্ত পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে ইংরেজী সেনানায়ক ব্রিগেডিয়ার রেগিনাল্ড ডায়ারের নির্দেশে নৃশংস হত্যাকাণ্ড হয়। ১৯১৪-১৯ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মহাত্মাগান্ধীর আহ্বানে ভারতীয়রা ইংরাজদের পক্ষে লড়ে ছিলেন। ইংরাজ সরকার ভারতীয়কে স্বায়ত্বশাসন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধজয়ের পর তাঁরা সেই প্রতিশ্রুতি রাখেননি। উপরন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদানকারী ভারতীয় সৈন্যদের চাকরীর ব্যবস্থা না করে নিজেদের বাড়িতে চলে যেতে বাধ্য করেন। ফলে কংগ্রেসের মধ্যে দু'টো দল সৃষ্টি হয়—নরমপন্থী ও চরমপন্থী। নরমপন্থীরা মহাত্মাগান্ধীর নির্দেশ অহিংস এবং সত্যাগ্রহ তথা রক্তপাতহীন আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরাজ সরকারের দমনমূলক পীড়ন বন্ধ তথা প্রতিবাদের আয়োজন করে। গান্ধীজি গ্রেফতার হন। এরই প্রতিবাদে ধর্মঘটে ও বিক্ষোভে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইংরাজ সরকার আপোষে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে আন্দোলনকারীদের জালিয়ান ওয়ালাবাগে ডেকে সেখানে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। এই হত্যা দৃশ্যের পটভূমি 'বাবুরাম সাপুড়ে' কবিতায় সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। ভারতীয়া বিষধর সাপের মতোই সাহসী ও বীর্যবান, আঘাতকারীকে দংশন ও ফোঁস করার মতো শক্তি ও সামর্থ্য তার আছে। কিন্তু অহিংস-সত্যাগ্রহী আন্দোলন করার কারণে সমস্ত বল-বীর্য সে ত্যাগ করে মাথা নিচু করে চলে, আঘাতকারীকে দংশন করে না, এমনকি ছোবলমারে না বা ফোঁসও করে না। মার খেয়ে মরে গেলেও কোনো প্রতিবাদও করেনা—ব্যঙ্গ্যার্থে তা এখানে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে—

"ছোটে না কি হাঁটে না, কাউকে যে কাটে না,
করে নাকো ফোঁসফাঁস, মারে নাকো টুঁশটাঁশ,
নেই কোনো উৎপাত, খায় শুধু দুধ ভাত—"

—এই বক্তব্যে নরমপন্থী অহিংস-সত্যাগ্রহী আন্দোলনকারীদের চিত্র উদ্ভাসিত। আর কবি যখন বলেন—

"সেই সাপ জ্যান্ত গোটা দুই আন্‌তো!
তেড়ে মেরে ডাণ্ডা ক'রে দিই ঠাণ্ডা।"

—তখন জালিয়ানওয়ালাবাগে ঐ নরমপন্থী অহিংস-সত্যাগ্রহী আন্দোলনকারীদের নৃশংসভাবে হত্যা করার মর্মন্তুদ চিত্র পরিস্ফূটিত হয়।

ইংরাজ শাসক অত্যাচার-অনাচার-শোষণ-বঞ্চনা চালিয়ে যাচ্ছেন নিরবচ্ছিন্নভাবে। এর প্রতিকার ও সাহসী-মানসিকতা প্রকাশিত হয়েছে 'চোর ধরা' কবিতায়—

"খাড়া আছি সারাদিন হুঁশিয়ার পাহারা,
দেখে নেব রোজ রোজ খেয়ে যায় কাহারা।" ('চোর ধরা')

শুধু দুর্বলভাবে সতর্কতা নয়, প্রয়োজনে গর্জে ওঠে এবং ঝাঁপিয়ে পড়ার কথাও প্রকাশিত হয়েছে—

"রামু হও, দামু হও, ওপাড়ার ঘোষ বোল—
যেই হও এইবারে থেকে যাবে ফোঁস্‌ফোঁস্।" ('চোর ধরা')

উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষ নিম্নবিত্ত শ্রেণীকে একের পর এক কাজের চাপে রেখে নাকাল করে ছাড়তো—সেই দিকটি প্রকাশিত হয়েছে 'বুঝিয়ে বলা' কবিতায়। এইসব সাধারণ মানুষদের দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ, রোগ-শোক কোনো কিছুকেই গুরুত্ব দিত না উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। তারা সব অজুহাত মনে করে বলে—

"জ্বর হয়েছে? মিথ্যে কথা! ওসব তোদের চালাকি—
এই যে বাবা চেঁচাচ্ছিলি, শুনতে পাইনি? কালা কি? ('বুঝিয়ে বলা)
"বড় যে তুই পালিয়ে বেড়াস, মারাম না যে এদিকই!
বলছি দাঁড়া, ব্যস্তকেন? বেস্‌ তাহলে নিচুতেই—"

উচ্চবিত্ত মানুষ নিম্নবিত্ত মানুষকে যে অবজ্ঞা করে সেই সামাজিক চিত্রও তাঁকে ভাবিয়েছিল—

উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষ নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষকে সর্বদা নিচু আসনে বসায়, পদতলে রাখে, কাজ করিয়ে নেয়, অথচ মর্যাদা দেয় না এই শিশুতোষ কবিতায় কবি তা ব্যঞ্জিত করেছেন।

পরাধীন ভারতে আইন-কানুন ও বিচার ব্যবস্থার নামে যে প্রহসন হতো সেদিকের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার জন্য কবি লিখেছেন 'একুশে আইন' কবিতা। পরাধীন ভারতে ইংরাজ শাসক যে যথেচ্ছাচার করে সেই দিকটি এখানে রূপকার্থে ব্যঞ্জিত—

"শিবঠাকুরের আপন দেশে,
আইন কানুন সর্বনেশে!
কেউ যদি যায় পিছলে পড়ে
প্যায়দা এসে পাকড়ে ধরে,
কাজির কাছে হয় বিচার—
একুশ টাকা দণ্ড তার।।" ('একুশে আইন')

শুধু তাই নয়, সেখানে সন্ধ্যা ছয়টার আগে হাঁচলে পিঠে মার পড়ে এবং একুশ দফা হাঁচিয়ে মারে। কারুর দাঁত নড়লে চার টাকা মাশুল দিতে হয়, গোঁফ গজালে একশো আনা ট্যাক্স দিতে হয় এবং একুশবার সেলাম দিতে হয়। রাস্তায় চলার সময় ডাইনে-বামে তাকালে একুশ হাতা জল গিলিয়ে দেয়, কেউ ঘুমের ঘোরে নাক ডাকালে একুশ পাক ঘুরিয়ে একুশ ঘন্টা ঝুলিয়ে রাখে—ইত্যাদি একুশে আইনের কুফল ও ব্যঙ্গাত্মক দিকটি হাস্য-রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কটাক্ষে প্রকাশিত হয়েছে।

'রাম গরুড়ের ছানা' এক অনবদ্য কবিতা—যা আজও পাঠককে আনন্দ দেয়। ব্রিটিশ শাসনকালে নানা বিধি-নিষেধ, আইন-কানুন আরোপে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত ছিল। এরকম এক অবস্থার ব্যঙ্গচিত্র 'রামগরুড়ের ছানা' কবিতা। শাসকের ভয়ে সর্বদা কাবু হয়ে থাকার ভাবটি এখানে স্পষ্ট—

"রাম গরুড়ের ছানা হাসতে তাদের মানা,
হাসির কথা শুনলে বলে,
'হাসব না-না, না-না!'
সদাই মরে ত্রাসে— ওই বুঝি কেউ হাসে!
এক চোখে তাই মিটমিটিয়ে
তাকায় আশেপাশে।" ('রামগরুড়ের ছানা')

—'হাসব না-না, না-না!' কথাটির গুরুত্ব অপরিসীম ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। হাসতে অদম্য ইচ্ছা, অথচ হাসতে পারবে না; যেন খুব জোর পূর্বক মনকে 'না-না' বলে দমিয়ে রাখা—এই ভাবটি এখানে তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। অন্যের 'হাসি' অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দেখে তারা দুঃখাতুয়াচিত্তে নিজেদের ব্যথাতুর জীবনে কষ্ট পায়। তাই কবি বলেছেন—

"হাসতে হাসতে যারা হচ্ছে কেবল সারা,
রামগরুড়ের লাগছে ব্যথা
বুঝছে না কি তারা?"

ইংরাজ শাসকনকালের 'দো-রোখা' বা 'দু-মুখো' নীতি এখানে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

'গন্ধ বিচার' কবিতায় রাজার স্বেচ্ছাচারিতা এবং বেতনভুক আমলা-তন্ত্রের অকর্মণ্যতা ও অপদার্থতা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কোনো একটি সাধারণ ও তুচ্ছ বিষয় নিয়ে রাজা যে কেমন তুলকালাম অবস্থা করে তোলেন মন্ত্রীর জামায় দেওয়া 'এসেন্স' অবলম্বনে তা প্রকাশিত হয়েছে। এখানে হাস্যরসের আবরণে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গরস সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়েছে।

'সঙ্গীহারা' কবিতায় 'হাঁড়িচাঁচা' পাখির রূপকে কবি উন্নাসিক মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছেন। উন্নাসিক মানুষের স্বভাব অন্যের দোষ দিয়ে, ঘৃণা-অবজ্ঞা-তুচ্ছজ্ঞান করে নিজেকে উচ্চমানের বলে প্রকাশ করা। কবি যখন হাঁড়িচাঁচাকে বলেন—

"পায়রা, ঘুঘু, কোকিল, চড়াই, চন্দনা, টুনটুনি,
কারে তোমার পছন্দ হয়, সেই কথাটি শুনি?" ('সঙ্গীহারা')

তখন হাঁড়িচাঁচা অন্যসব পাখি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য পেশ করে 'ছোট জাত' বলে ঘৃণা করে নিজেকে উচ্চমানের বলে প্রকাশ করে বলে—

"এই গুলো সব ছ্যাবলা পাখি, নেহাত ছোট জাত,
দেখলে আমি তফাৎ হটি অমনি পঁচিশ হাত!" ('সঙ্গীহারা')

কবি তাই এই সমস্ত উন্নাসিক ভাবাপন্ন মানুষদের সম্পর্কে ব্যঙ্গোক্তি করে বলেছেন—

"এতক্ষণে বুঝতে পারি ব্যাপারখানা কি যে—
সবার তুমি খুঁত পেয়েছ, নিখুঁত কেবল নিজে!
মনের মতন সঙ্গী তোমার কপালে নেই লেখা,
তাইতো তোমার কেউ পোঁছে না, তাইতে থাকো একা।।" ('সঙ্গীহারা')

হাঁড়িচাঁচা নিজেই সুন্দর নয়, অথচ সে নিজেকে সুন্দর মনে করে অন্যদের থেকে আলাদা থাকে ও উন্নাসিকতা প্রকাশ করে; ইংরেজ শাসনকালে এই রকম হাঁড়িচাঁচা শ্রেণীর মানুষ ও অনেক আছে। কবি তাদের সম্পর্কে এমন ব্যঙ্গোক্তি করেছেন। এই শ্রেণীর মানুষ সবার মাঝে থেকেও নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে থাকে।

ইংরেজ শাসনকালে বিচারের নামে যে প্রহসন হতো, মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দিয়ে মামদোবাজি করতো—সেই দিকটিও প্রকাশিত হয়েছে 'বিচার' কবিতায়। যার সঙ্গে মকদ্দমা—সেই-ই বিচারক। সুতরাং সুবিচার পাওয়া কখনোই সম্ভব নয়—সাধারণ মানুষের জেল-জরিমানা-হয়রানি, এমনকি ফাঁসিও অবশ্যম্ভাবী—সেই কথাই ইঁদুরের প্রতি মামদো কুকুরের উক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে—

"আমিই হব উকিল, হাকিম, আমিই হব জুরি,
কান ধরে তোর বলবো, 'ব্যাটা, ফের করেছিস চুরি?'
সটান দেব ফাঁসির হুকুম অমনি একেবারে—
বুঝবি তখন চোর বাছাধন বিচার বলে কারে!" ('বিচার')

—ইংরেজ শাসনাধীন জমিদারী প্রথার কালে অনেক স্বেচ্ছাচারী জমিদার নিজেদের খেয়াল-খুশিতে সাধারণ মানুষকে মামলায় জড়িয়ে নাকাল করে ছাড়তো। জমিদার বা

প্রভাবশালী ব্যক্তি নিজেই আসামী ও বিচারক দুই-ই হতো এবং সাধারণ মানুষকে সর্বস্ব হরণ করে মৃত্যুও ঘটাত—সেই দিকটি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে এখানে প্রকাশিত হয়েছে, এখানে 'ইঁদুর' হল সাধারণ নিরীহ মানুষ এবং 'মামদো কুকুর' হলো অত্যাচারী শোষক শ্রেণীর রূপক।

পরাধীন ভারতে সংঘটিত অহিংস ও সহিংস আন্দোলনের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে 'হিতে বিপরীত' কবিতায়। কবি যখন বলেন—

"ওরে ছাগল, বল তো আগে
সুড়সুড়িটা কেমন লাগে?
কই গেল তোর জারিজুরি
লম্ফঝম্প বাহাদুরি।" ('হিতে বিপরীত')

তখন অহিংস আন্দোলনকারীদের প্রতি ইংরেজ শাসকের ব্যঙ্গোক্তি প্রকাশ পায়। আবার সেই ছাগল যখন শিং বাগিয়ে গুঁতনোর মানসিকতায় —এগিয়ে আসে, তখন ভারতের মুক্তিকামী আন্দোলনকারীদের সহিংস দিকটি উন্মোচিত হয়—

"ছাগল ভাবে সামনে এ কি!
একটুখানি গুঁতিয়ে দেখি!
গুঁতোর চোটে ধড়াধ্বড়
হুড়মুড়িয়ে ধুলোয় পড়।" ('হিতে বিপরীত')

ইংরেজ শাসনাধীন শাসকগোষ্ঠী বা জমিদার—প্রভাবশালী শ্রেণী সাধারণ মানুষকে লোভ দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে কাজ করিয়ে নিতো, লোভের প্রশমন ঘটাতো না; সেই দিকটি ব্যঙ্গোক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে 'অসম্ভব নয়' কবিতায়—

"খাবার লোভে উদাস প্রাণে
কেবল ছোটে মূলোর টানে—
ডাইনে বাঁয়ে মূলোর তালে
ফেরেন গাধা নাকের চালে।" ('অসম্ভব নয়')

পরনির্ভরশীলতায় সুখে থাকার চেয়ে স্বনির্ভরশীলতায় সাধারণ জীবনযাপন যে অনেক শ্রেয় তা প্রকাশিত হয়েছে 'জালা-কুঁজো সংবাদ'-এ। জালা গর্জন করে কুঁজোকে বলে—

"ঘাড়ে ধরে হেঁট করে জল নেয় তোর যে!"
প্রত্যুত্তরে কুঁজো বলে—
" নিজ পায়ে তবু খাড়া রই তো—
বিঁড়ে বিনা কুপোকাৎ তেজ তোর ওই তো।"

অন্যের সাহায্য ছাড়া যে থাকতে পারে না—তার আস্ফালন বেশি এবং সেটা যে হওয়া উচিত নয় ব্যঙ্গোক্তিতে তা প্রকাশিত।

সুকুমার রায় শিশুতোষ কবিতা লিখেছেন; কিন্তু তাঁর মধ্যেও সমকালীন পরাধীন ভারতের চিত্র তিনি সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাননি—শিশুপাঠ্য কবিতার মধ্যেও রূপকাবরণে তিনি তা অনেকটা তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'ওরা কাজ করে' কবিতায় বলেছেন—

"রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত-আখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।"

সুকুমারের শিশুপাঠ্য কবিতায়ও তেমনি ভাবে দুষ্টু মানুষের চিত্র, পরাধীন ভারতের চিত্র, পরাধীনতা মুক্তিকামী আন্দোলনকারীদের চিত্র রূপকাবরণে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। শিশুরা প্রথমে বুঝতে পারে না—ছন্দের তালে পড়ে যায়; কিন্তু বড় হয়ে বুঝতে পারে সেই কবিতার মর্মার্থ। তাঁর অনেক কবিতা ছোটদের জন্য লেখা হলেও সেখানে বড়দের ভাব-বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে; সেদিক দিয়ে তিনি শুধু ছোটদের কবি নন, বড়দেরও কবি।

গ্রন্থঋণ ঃ

আকর গ্রন্থ ঃ "সুকুমার রচনাসমগ্র', ভূমিকা ঃ ড. বিষ্ণু বসু, তুলিকলম, ১, কলেজ রো, কলকাতা-৭০০০০৯, ষষ্ঠ সংস্করণ-২০০১

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১) আনসার উল হক—'২০০ বছরের বাংলা শিশুসাহিত্যের ইতিহাস', পারুল প্রকাশনী প্রা. লি, ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ-২০১৬
২) আজহার ইসলাম—'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুক), অনন্যা, ৩৮/২ বাংলা বাজার ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ-২০০১।

সুকুমার রায় ঃ সাহিত্যে নব্য বিজ্ঞান চেতনা

আনসার উল হক

সুকুমার রায়ের সাহিত্যকৃতি এতটাই বিস্তৃত যে সম্পূর্ণ মূল্যায়ণ করা বেশ কঠিন। সাকুল্যে গোটা পঞ্চাশেক ছড়া (বেনামে ও নামছাড়া কিছু লেখা হারিয়ে গেছে), নব্বুইটির মতো কবিতা, আটটি নাটক, খান সত্তর গল্প রচনা করে তিনি ছোটোদের সাহিত্যকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করেছেন। এছাড়া পাস্তুর, সক্রেটিস, গ্যালিলিও, আর্কিমিডিস, কলম্বাস, ডারউইন প্রমুখদের নিয়ে ষোলটি জীবনীমূলক নিবন্ধ লিখেছেন। আর অন্যান্য নিবন্ধ-প্রবন্ধের সংখ্যা একশো পঁচিশটিরও বেশি। সব রচনাই যে সব উপাদানে ভরপুর বা মশলায় সমৃদ্ধ, তা জোর দিয়ে বলা যাবে না। কোনোটা বর্ণনামূলক, কোনোটা বা গল্পের ঢঙে লেখা আবার কোনোটা বা বিজ্ঞানের মোড়কে পরিবেশিত। ছোটো বড়ো এই সময় প্রবন্ধ ছোটাদের উপযোগী। অত্যন্ত অল্প বয়সে তিনি যে পরিমাণ মেধা ও জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, তা বাংলা সাহিত্যে এক বিরল ঘটনা। মনে হয় অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য সুকুমার জন্মেছিলেন।

অসম্ভবের ছন্দেতে দুলে খেয়ালরসের সন্ধান দিয়েছেন বাচ্চা-বুড়ো সবাইকে। সেই খাম খেয়ালিপনা আর উদ্ভট রসের মধ্যে বাস্তব পরিচিত জগতের প্রতিচ্ছবি পেয়ে যায় পাঠক। এখানে এডওয়ার্ড লিয়র কিংবা লুইস ক্যারোলদের সঙ্গে সুকুমার রায়ের আসল তফাত। একদিকে মজার মোড়কে কঠিন বাস্তব ও বিজ্ঞান ভাবনা, অন্যদিকে শুধুই উদ্ভট-আজগুবি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, তাঁর লেখায় আবোলতাবোল, অনাসৃষ্টি, নিয়মহারা, হিসাবহীন, খেয়ালখোলা সৃষ্টিছাড়া শব্দের হুটহাট প্রয়োগে তিনি নিছক মজা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। বরং প্রতিটি শব্দই অনেক কেটেকুটে, ঘষেমেজে, ঝেড়েবেছে, চিন্তাভাবনা করে তিনি প্রয়োগ করেছেন। 'আবোল তাবোল' কিংবা অন্যান্য বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখলেই তা মালুম হয়। তবে একথা অবশ্যই সত্যি, কল্পনার হিস্টিরিয়াকে তিনি কখনওই মগজ অবধি চড়তে দেননি। চারপাশের সমাজ, সমসাময়িক রাজনীতি কিংবা বিজ্ঞানচেতনার অভাবকে ত্যারচা চোখে দেখার অসঙ্গতিগুলোকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর চশমাটা রেখে গিয়েছেন আপামর পাঠক জনসাধারণের জন্য!

তাঁর লেখায় যেমন মজাদার উপাদান থাকে, তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞান আর পরিমিতি বোধ। তাঁর 'হাত গণনা', 'ভুতুড়ে খেলা', 'বিজ্ঞান শিক্ষা', 'পাকাপাকি', 'নদী', 'সাগর যেথায়', 'মেঘের খেলায়','বর্ষ গেল বর্ষ এল' কিংবা 'জীবনের হিসাব' ছড়া-কবিতাগুলি

তো বিজ্ঞান ভাবনায় জারিত। যেমন, 'হাত-গণনা' কবিতায় নন্দ গোঁসাই হস্তরেখা বিশ্বাস করে রীতিমত নাস্তানাবুদ হয়ে নিজেই বলেছেন, 'ষাটটা বছর পার হয়েছি বাপদাদাদের পুণ্যফলে/ ওরে তোদের নন্দখুড়ো এবার বুঝি পটল তোলে।' আসলে সুকুমার রায় তির্যকভাবে সমাজকে কষাঘাত করেছেন। শনি, ফাঁড়া, আয়ুর রেখা কোনোদিন বিজ্ঞাননির্ভর নয়—সে কথা তিনি ব্যঙ্গ করে বলতে চেয়েছেন। পান্তাভূতের জ্যান্ত ছানাদের বিনা চশমাতে কবি দেখেছেন মানসলোকে। কিন্তু মজায় মুড়ে হাস্যরস পরিবেশনের পর একেবারে শেষে তিনি নির্ভয়ে বলে দেন ভূত বলতে কিছু নেই; ভয় দেখানোর একটা উপায় মাত্র। তাইতো তিনি বলতে পারেন— 'কোথায় বা কি, ভূতের ফাঁকি মিলিয়ে গেল চট করে!' (ভুতুড়ে খেলা)। এছাড়া তাঁর নাটক, গল্প, প্রবন্ধ, জীবনী ইত্যাদি রচনা ছিল বিজ্ঞানের মশলায় ঠাসা। 'পাস্তুর' গদ্যে জলাতঙ্ক সম্পর্কে সহজ ধারণা, 'গ্যালিলিও'তে দূরবিনে আকাশ দেখা, কিংবা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সবই অত্যন্ত সহজ ভাষায় ছোটোদের জন্য থরে থরে সাজিয়ে দিয়েছেন বইয়ের পাতায় পাতায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথা, ভূমিকম্পের কথা, মানুষের কথা, গ্রামোফোনের কথা কিংবা আলফ্রেড আর ডিনামাইটের কথা সুকুমার রায় শুনিয়েছেন খেলাচ্ছলে। হাসি-মজা, বিজ্ঞানের উৎস খুঁজতে খুঁজতে বাচ্চা-বুড়ো সবাই ঢুকে যায় লেখার অন্দরমহলে। এখানেই সুকুমারের মুনশিয়ানা।

শিশুসাহিত্যের রাজাধিরাজ উপেন্দ্রকিনশোর রায়চৌধুরীর দ্বিতীয় সন্তান সুকুমার রায় ছিলেন বিশ্বের বিরলতম প্রতিভা। কি পড়াশোনায় কি সাহিত্য রচনায়, কি হাস্যরস সৃষ্টিতে কি বিজ্ঞান ভাবনায় তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের থেকে অন্তত একশো বছর এগিয়ে। তাঁর জন্ম ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ অক্টোবর, ১৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট লাহাদের বিশাল বাড়ির দোতলার একটি ঘরে। পরবর্তীকালে বাচ্চাবুড়ো সবার কাছে এই শিশুই হয়ে গেলেন শিশুসাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট, খুল যা সিম-সিম 'আবোলতাবোল'-এর আলিবাবা সুকুমার রায়। তাঁকে ছোটোদের লেখক বললে সবটাই বলা হয় না। আবার বড়োদের বলে চিহ্নিত করে দিলে একটু বাড়াবাড়ি হয়। তবে তাঁর লেখা নিয়ে বাচ্ছাবুড়ো সবাই যে কাড়াকাড়ি করে, সে বিষয়ে সবাই একমত। তাইতো তিনি কোনোদিন ফুরিয়ে যান না। তাঁর রচনা আমাদের প্রতিদিনকার আস্বাদনের বস্তু। তিনি আমাদের নিত্যদিনের সাথী, নতুন নতুন ভাবনার আবিষ্কারক। গাম্ভীর্য আর পণ্ডিতি—দুটোই ঘোরতর অপছন্দ ছিল তাঁর। ছোটোদের ওপর মাষ্টারি করার ইচ্ছে তাঁর আদৌ ছিল না। ছোটোদের অনেক প্রবন্ধে তবুও মাষ্টারির ছাপ পাওয়া যায়। তবে সে মাষ্টার গম্ভীর নয়, তাঁর হাতে বেত নেই, গলায় গর্জন নেই, চোখ টকটকে লালও নয়। এই মাষ্টারটি নিপাট আড্ডাবাজ, ছোটোদের বন্ধু। কারণ, মাষ্টারমশাই জানেন, ছোটোরা সাধারণত গদ্য বা প্রবন্ধ পড়তে

খুব একটা পছন্দ করেনা। তাদের জন্য লিখতে গেলে হালকা মজাদার কথার মোড়কে সহজ করে পরিবেশন করা দরকার। তাই তাঁর লেখায় মজা আছে, জ্ঞান আছে, ভালোলাগার বিষয় আছে। আর আছে পৃথিবী জানার পরিমিতিবোধ ও রসায়ন। তার জ্বলন্ত উদাহরণ তাঁর 'খাই খাই' ছড়াগ্রন্থ।

'জীবনের হিসাব' ছড়া-কবিতায় (খাই খাই, পৃ ৯) মাঝি এবং বাবুমশাই-এর কথপোকথনে উঠে আসে সূর্য ওঠার কথা, চাঁদের বাড়া-কমার কথা, জোয়ারের হ্রাস-বৃদ্ধির কথা, পাহাড় থেকে নদীর জন্মকথা, সাগর জলে লবনের উপস্থিতি, আকাশ কেন নীলচে দেখায় কিংবা চাঁদ-সূর্যের গ্রহণ লাগার কথা ইত্যাদি। কবিতার গুণগত মান, জমাট ভাবনা, চিরচেনা পরিবেশ—সবই উঠে আসে ছোটোদের মনের ক্যানভাসে। সর্বোপরি, অতি সহজেই কবি সুকুমার জীবনবোধের কথা বুনে দেন পাঠকের হৃদয়ে। 'বর্ষশেষ' কবিতায় 'পাকে পাকে দিনরাত' কী করে হয়, কিংবা 'রবি যায় শশী যায় গ্রহতারা সব যায়। বিনা কাঁটা কম্পাসে বিনা কল কব্জায়'—এসব কথা ছোটোদের বিজ্ঞান মনস্ক হতে শেখায়। তবে, এসব ক্ষেত্রে শিক্ষকদের দায়িত্ব অপরিসীম। আকাশ, পৃথিবী, সূর্য, তারা, মেঘ—সবই ধরা পড়েছে 'আজব খেলা' কবিতায় (পৃ ৩৭, খাই খাই)। এছাড়া 'মেঘের খেয়াল', 'নদী', 'সাগর যেথায়', 'শিশুর দেহ' ইত্যাদি ছড়া কবিতাগুলো বিজ্ঞান ভাবনায় জারিত। এইসব লেখা পড়লে ছোটোদের জানার আগ্রহ বেড়ে যায়। শিশুমনে জন্ম নেয় বিজ্ঞান ভাবনা, বিজ্ঞান চেতনা। তাইতো তিনি অনায়াসে বলতে পারেন ঃ

চশমা-আঁটা পণ্ডিতে কয়, শিশুর দেহ দেখে—
'হাড়ের পরে মাংস গেঁথে, চামড়া দিয়ে ঢেকে,
শিরার মাঝে রক্ত দিয়ে, ফুসফুসেতে বায়ু,
বাঁধলো দেহ সুঠাম করে পেশী এবং স্নায়ু।' (পৃ ৫০, শিশুর দেহ)।

সুকুমার যে তাঁর রচনায় একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বাঁধিয়ে ফেলেন, তার অন্যতম প্রধান কারণ তাঁর উদ্দাম কল্পনা আর বাস্তব চিন্তা-ভাবনা। পৃথিবীতে কী হতে পারে, কী হতে পারে না, কিংবা কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, অথবা কোনটা বিজ্ঞানসম্মত, কোনটা অবৈজ্ঞানিক—তাঁর মাথা থেকে বেরিয়ে আসে লাফিয়ে লাফিয়ে। ভাষা আর কল্পনার মেলবন্ধন ঘটে তাঁর লেখা হয়ে ওঠে হিরের কুচি। মজা-আনন্দ, ভাব-ভাবনা আর বাস্তব-বিজ্ঞানের সংমিশ্রণে বাচ্চাদের কাছে হয়ে ওঠে সোনায় সোহাগা, মজায় মোড়া আনন্দনাড়ু। তিনি এগুলো তৈরি করেন গভীর সচেতন চিন্তা থেকে। আসলে সুকুমার প্রতিভার চরিত্রই আলাদা। তাঁর মস্তিষ্কের কারখানায় অনর্গল উৎপাদন চলে। তিনি তাঁর এলোপাতাড়ি ননসেন্স ছড়ার সঙ্গে গহন কবিতাকেও বুনে দিয়েছেন পাঠকের হৃদয়ে।

তাই ছড়া পড়া শেষ হয়ে গেলেও হিজিবিজবিজ বাবুরা কিংবা হাঁসজারু বকচ্ছপ পাঠকরা ভাবতে থাকে ছড়া-কবিতার ভেতরের হাসি-মজা অর্থ। তাঁর লেখার এখন কায়দা যে, মনে হয় লড়াইয়ে প্রতিপক্ষ নকআউট হওয়ার পরেও নিজে বুঝতে পারে না তার পা আসলে মাটিতে নেই। সমকালীন চেনাশোনা জগতের ট্যাঁশগুরু, হুঁকোমুখো হ্যাঁংলা, কুমড়োপটাশ কিংবা রামগরুড়ের ছানাদের তিনি ননসেন্সের মাঠে ধরে এনে একেবারে তুলোধোনা করে ছেড়েছেন।

সুকুমার এক অজানা প্রতিভা আর ব্যক্তিত্বের পরিচয় চিরকাল যেন বহন করে চলেছে। একথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন যে, উপেন্দ্রকিশোরের সবচেয়ে কৃতি সন্তান, রায়পরিবারের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক শিশুসাহিত্যের এক দুর্লভ অমর স্রষ্টা এই সুকুমার। তাঁর বাল্যকাল বঙ্গ সরস্বতীর ঝকমকে এক সৌভাগ্যকাল বললে অত্যুক্তি হয়না। তাঁর শৈশব কেটেছে 'সখা ও সাথী'র কালে (১৮৮৩-১৮৯৪), বাল্যকালেই এসেচে 'মুকুল' (১৮৯৫)। কৈশোরেই হাতে পেয়েছেন পিতৃদেবের 'সন্দেশ' (১৯১৩)। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ১৯১৫-য় সে 'সন্দেশ' নিজে হাতে তুলে নিয়ে শিশুসাহিত্যের এক স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ -অবনীন্দ্রনাথের লেখায় ও রেখায় শিশুসাহিত্যের জগতে সহস্র মানিকজ্বলা খুশি ছড়িয়ে পড়েছে। সুকুমার রায়ের সাহিত্য বিচারে একথা পরিষ্কার যে, পৈর্তৃক উত্তরাধিকার হিসাবে সুকুমার একই সঙ্গে তিনটি জিনিস আয়ত্ব করেছিলেন ঃ (১) বৈজ্ঞানিক মানসিকতা (২) সাহিত্যরসবোধ (৩) চিত্রবিদ্যা। সময়ের সাথে সাথে সেগুলোর স্ফূরণ হয়েছে মাত্র। তাঁর জন্মের প্রায় একশো তিরিশ বছর পরে আজও তিনি বাঙালি পাঠকসমাজে সমানভাবে আদৃত। তাঁর লেখা পড়েনি বাংলাদেশে এমন পড়ুয়া নেই বললেই চলে।

তাঁর হাস্যরস ও বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির মেলবন্ধনের কথা রবীন্দ্রনাথ অনুভব করতে পেরেছিলেন। 'পাগলা দাশু'র স্কেচ এঁকেছিলেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র সত্যজিৎ রায় আর ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন ঃ

> সুকুমারের লেখনি থেকে যে অবিমিশ্র হাস্যরসের উৎসধারা বাংলা সাহিত্যকে অভিষিক্ত করেছে, তা অতুলনীয়। তাঁর সুনিপুণ ছন্দের বিচিত্র ও স্বচ্ছল গতি, তাঁর ভাব-সমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা প্রতি পদে চমৎকৃত আনে। তাঁর স্বভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিল, সেই জন্যেই তিনি তাঁর বৈপরীত্য এমন খেলাচ্ছলে দেখাতে পেরেছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে ব্যঙ্গ, রসিকতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আরো কয়েকটি দেখা গিয়েছে, কিন্তু সুকুমারের হাস্যোচ্ছ্বাসের বিশেষত্ব তাঁর প্রতিভার যে স্বকীয়তার

পরিচয় দিয়েছে তার ঠিক সমশ্রেণির রচনা দেখা যায় না। তাঁর এই বিশুদ্ধ হাসির দানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অকালমৃত্যুর সকরুণতা পাঠকদের মনে চিরকালের জন্য জড়িত হয়ে রইল।

প্রসঙ্গত, সুকুমার রায়ের মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বলা বাহুল্য, বাংলা ভাষা সাহিত্যের সর্বোত্তম ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ ও স্নেহাশিস পেয়েছিলেন সুকুমার। তিনি রবীন্দ্রনাথের অতি আদরের পাত্র ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রার সভায় সুকুমারের নিত্য উপস্থিতি, অংশগ্রহণ একাধিকবার শান্তিনিকেতন গমন, বিলেত প্রবাসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলি ঠাকুর ও রায়চৌধুরী পরিবারের মধ্যে দীর্ঘকালীন সুখকর এক সম্পর্কের ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সুকুমারের বিবাহসভায়ও যেমন, মৃত্যুশয্যায়ও তেমনি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ সুকুমারের অনুরোধে 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু' এবং 'দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো, গভীর শান্তি এ যে/আমার সকল ছাড়িয়ে গিয়ে উঠল কোথায় বেজে' গানদুটিও গেয়ে শোনান। সবশেষে বলব, সুকুমার সাহিত্যে যেমন রসের গড়াগড়ি, তেমনি বিজ্ঞান-ভাবনার ছড়াছড়ি। এ ছড়াছড়ি উড়ো খইয়ের মতো হঠাৎ ছড়িয়ে পড়া নয়, শিশুমনের পুষ্টি জোগাতে মগজাস্ত্র থেকে সূক্ষ্ম হিসেব নিকেশ করে বের করা। তাঁর সমগ্র রচনা বিশ্লেষণ করে তাঁর লেখাকে আমরা কয়েকটি বিশেষ শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি। যেমন ঃ (১) অদ্ভুতুড়ে পর্যায় (২) মূল্যবোধ পর্যায় (৩) দর্শন পর্যায় (৪) বিজ্ঞান পর্যায় (৫) পশুপক্ষী ও কীটপতঙ্গ পর্যায় (৬) প্রকৃতি পর্যায় (৭) হাস্যরস (৮) বিবিধ পর্যায় ইত্যাদি। সব পর্যায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার দরকার না থাকলেও, একথা অবশ্যই উল্লেখ্য যে সুকুমারের মতো বহুমুখী প্রতিভা সাহিত্যের যে শাখাতেই হাত দিয়েছেন, সোনা ফলেছে। ছড়া, কবিতা, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ, ইংরেজি রচনা—সবই তিনি থরে থরে সাজিয়ে দিয়েছেন ছোটোদের জন্য, ছোটোদের উপযোগী করে। তাঁর অদ্ভুতুড়ে পর্যায়ে পড়ে আড়ি, বিষম চিন্তা, ছড়া, নন্দগুপী ইত্যাদি। 'কাজের লোক'কে মূল্যবোধ পর্যায়ে ফেলা যায়। দর্শন পর্যায়ের কবিতাগুলো 'জীবনের হিসাব' (পৃ ১২৯), 'আজব খেলা' (পৃ ৯৭), 'অন্ধ মেয়ে' (পৃ ৯৪), 'আশ্চর্য' (পৃ ১১৫০, 'বিচার' (পৃ ১০১) ইত্যাদি। তবে সব কিছুকে ছাড়িয়ে তাঁর বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের ছোঁয়াচ লাগানো রচনাগুলি ছোটোদেরকে বিজ্ঞান-মনস্কতার উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার উপাদানে ভরপুর। যেমন ঃ প্রবন্ধের মধ্যে আছে 'শরীরের মালমশলা' (পৃ ৫১৮), 'পৃথিবীর শেষ দশা' (৪৯৯), 'শনির দেশে' (পৃ ৫১০), ভূমিকম্প (পৃ ৪৮২), 'দক্ষিণদেশ' (পৃ ৪৭৮), 'আশ্চর্য প্রহরী' (পৃ ৫৪৩), 'সূর্যের রাজ্য' (পৃ৫৫৪), 'বায়োস্কোপ' (পৃ ৫২৬), 'আকাশের বিপদ' (পৃ ৫২০), 'কাচ' (পৃ ৫১৫), 'ফটোগ্রাফি' (পৃ ৪৫৯), 'মেঘ বৃষ্টি' (পৃ৪৮৮)

ইত্যাদি। এরকম অজস্র বিজ্ঞান রচনা প্রাধান্য পেয়েছে তার সৃষ্টির রসায়নে। শুধু ছোটোদের কথা মাথায় রেখে সুকুমার এসেব কথা লিখলেও, বড়োরা কিন্তু এগুলো বেশি পড়ে। তার অন্যতম কারণ সহজ সরল ভাষায় এগুলো পরিবেশিত। ছোটোরা যেমন গোগ্রাসে গেলে বড়োরাও তারিয়ে তারিয়ে পড়ে আনন্দ পায়। এমন সব লেখা ছোটোদের জন্য সুকুমার ছাড়া কে আর ভাববে, কে আর লিখবে কে আর উপহার দেবে। আর সেই জন্যই তো বলা হয় সুকুমার তার সময়ের চেয়ে অন্তত একশো বছর এগিয়ে ছিলেন।

সুকুমারের ম্যাজিক লণ্ঠনের আলোয় বিজ্ঞান হয়েছিল রসসিক্ত, সুপাঠ্য হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল সাহিত্যের আনাচে কানাচে, আপামর মানুষের মনের অন্দর মহলে। তিনি নবাঙ্কুর ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, আনন্দ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন শিশুর প্রাণে, তারায় তারায়, আকাশে বাতাসে। বাংলা শিশুসাহিত্যের এই যুগান্তকারী প্রতিভা কালান্তরে আক্রান্ত হয়ে ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর ৮-১৫ মিনিটে আকস্মিকভাবে সবাইকে ছেড়ে চলে গেছেন। তবু আজও আমরা ভাবি তাঁর কথা, তাঁর পাহাড় প্রমাণ সৃষ্টির কথা। সেই ভাবনার শেষ ভাবনায় তাঁর শান্তি সমাহিত উচ্চারণ ছিল ঃ

আজকে দাদা যাবার আগে
বলব যা মোর চিত্তে লাগে
.....
আপনাকে আজ আপন হতে
বাসিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে
.....
আলোয় ঢাকা অন্ধকার
ঘন্টা বাজে গন্ধে তার
.....
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর
গানের পালা সাঙ্গ মোর।

দুহাতে প্রজ্ঞাপ্রদীপ দিয়ে নিজেকে প্রতিনিয়ত নতুনভাবে নির্মাণ করতে করতে তিনি এগোচ্ছিলেন। সেই প্রদীপ হঠাৎ নিভে গেলেও তার বিচ্ছুরিত আলো আজও উজজ্বল, অমলিন। তাঁর বিরল ভাবনা ও বিস্ময়কর প্রতিভা আজও তাঁকে বিশ্বের সমস্ত বাঙালির কাছে অতি আপনজন করে রেখেছেন। এ বড়ো গৌরবের, এ বড়ো আনন্দের। তিনি অমর, তিনি কিংবদন্তী।

তথ্যসূত্র ঃ

১। সুকুমার সাহিত্য সমগ্র, ভূমিকা—সত্যজিৎ রায় (১ম খণ্ড, ১৯৭৩)
২। সেরা সন্দেশ (১৯৮১, পৃ -৪১)
৩। পাতাবাহার। সম্পা ঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায় (বিশেষ সংখ্যা)
৪। রোববার, প্রতিদিন—৩০ অক্টোবর, ২০১১
৫। সুকুমার রচনা সমগ্র—সাহিত্যম, কল-৭৩
৬। সুকুমার রায় ঃ বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় প্রতিভা (প্রবন্ধ) অপূর্ব দত্ত। বাচনিক (৭ম সংখ্যা) সম্পাদক-অঞ্জন বিশ্বাস যতীন দাস নগর, কল-৫৬
৭। ছড়ায় ছড়ায় সুকুমার রায়। সম্পাদক—নীলাদ্রিশেখর সরকার প্রিয়ম প্রকাশন, বেলপুকুর, নদিয়া।
৮। ২০০ বছরের বাংলা শিশুসাহিতের ইতিহাস—আনসার উল হক। পারুল প্রকাশনী, কল-৯
৯। খাই খাই-সুকুমার রায়। বসাক বুক স্টোর, কল-৭৩

সুকুমার রায় ও আজগুবি ঃ 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'

সমরেশ ভৌমিক

প্রথিতযশা সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সুযোগ্য পুত্র সুকুমার রায় ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অমূল্য ভাণ্ডারে nonsenseসাহিত্যের পথিকৃৎ। 'nonsense'—শব্দটি ইংরাজীতে প্রয়োগের কারণ বাংলায় এর অর্থ যদি আজেবাজে ধরা হয় তা হলে বোধ হয় তা সঠিক অর্থবহ হবে না। nonsense শব্দটি বিভিন্ন জনের কাছে ভিন্নার্থক, এই এক্ষেত্রে সুসান স্টুয়াটের মতামত প্রণধিান যোগ্য,

'An activity by which the world is
disorganised and reorganised'.

কিংবা হগ্ হফ্টন (Hugh Haughton)-এর মতামত ও এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত মূলবান।

'The term 'nonsense' is mainly used to police the frontiers of acceptable

meaning and establish the limits of significant argument.'

সুকুমার রায়ের জন্ম ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, তখন বিশ্বসাহিত্যে nonsense কথাসাহিত্যের জনক এডওয়াড লিয়র (Edward Lear, ১৮১২-১৮৮৮) তাঁর অমূল্য nonsense সাহিত্য রচনা করে চলেছেন, অপরদিকে বরেণ্য সাহিত্যিক লুইস্ ক্যারলের (Lewis carroll-১৮৩২-১৮৯২) বিখ্যাত nonsense সাহিত্য 'Alice in wonderland' (১৮৬৫) প্রকাশিত হয়ে গেছে। সুকুমার রায় ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে স্নাতক হন। পিতা ও পিতামহের শিক্ষার উত্তরাধিকার ও বিজ্ঞানে স্নাতক হওয়ার সূত্রে প্রাপ্ত বিজ্ঞানমনস্কতার ছোঁয়ায় তাঁর সাহিত্য হয়েছে অমূল্য। তিনি বিভিন্ন ধরণের লেখা লিখলেও তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন nonsense কথাসাহিত্যকেই। এই ক্ষেত্রটিতে তাঁর রচনা দেখলে মনে হত তিনি যেন মেতে উঠেছিলেন 'সৃষ্টিসুখের উল্লাসে'। অনেকের মতে তিনি লিয়র ও ক্যারলের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এমনকি তাঁর নাটক 'চলচিত্তচঞ্চরী' 'Alice in wonderland' দ্বারা অনুপ্রাণিত বলে ধরা হয়। তবে অনুপ্রাণিত হওয়া দোষের নয়, তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা সবাই যেন বাঙালী।

তাঁর মজাদার আজগুবি ছড়া (limerick) এখনও সমানভাবে সবার কাছে জনপ্রিয়। সুকুমার রায়ের কবিতায় Pun বা শ্লেষের ব্যবহারও খুব পরিলক্ষিত হয়। যেমন—'পাকাপাকি'— কবিতায় দেখা যায়—

'আম পাকে বৈশাখে, কুল পাকে ফাগুনে,
কাঁচা ইঁট পাকা হয় পোড়ালে তা আগুনে।
রোদে জলে টিকে রঙ পাকা কই তাহারে,
ফলারটি পাকা হয় লুচি দই আহারে।.....'

পুরো কবিতাটিতে তিনি 'পাকা' শব্দটি নিয়ে অক্লেশে জাগলিং করেছেন।

তাঁর কবিতা বা ছড়াতে আবার বিদ্রুপ বা satire-ৰ ছোঁয়াও পাওয়া যায়। যেমনটা আমরা 'ভালো ছেলের নালিশ'—কবিতায় দেখি।

'মাগো! প্রসন্নটা দুষ্টু এমন। খাচ্ছিল সে পরোটা
আমায় দেখে একটা দিল, নয়কো তাও বড়টা,
দুইখানি সে আপনি খেল ক'সে!
তাইতো আমি কান ধরে তার একটুখানি পেঁচিয়ে
কিল মেরেছি 'হ্যাংলা ছেলে' বলে—
অমনি কিনা মিথ্যে করে ষাঁড়ের মত
চেঁচিয়ে গেল সে তার মায়ের কাছে চলে।'

সুকুমার রায় অনেক বিজ্ঞানভিত্তিক রচনাও লিখেছেন যেমন ' হেঁশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরী'—একটি কল্পবিজ্ঞান ভিত্তিক প্যারডি। তিনি 'মণ্ডা ক্লাব' বলে একটি ক্লাব চালাতেন। সেই ক্লাবের আমন্ত্রণপত্রগুলিও হত ছন্দোময়। একটি উদাহরণ—

'শনিবার ১৭ই
সাড়ে পাঁচ বেলা,
গড়পারে হৈ হৈ
সরবতী মেলা।

অতএব ঘড়ি ধরে
সাবকাশ হয়ে
আসিবেন দয়া করে
হাসিমুখ লয়ে।

সরবৎ, সদালাপ
সঙ্গীত ভীতি—
ফাঁকি দিলে নাহি মাপ,
জেনে রাখ—ইতি।'

তবে সুকুমার রায়ের সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি হল নানাধরণের আজব চরিত্রগুলি। যেমন—

হাঁসজারু, হাতিমি, কুমড়োপটাশ, কিম্ভূত, ট্যাঁশগরু প্রভৃতি। তাঁর সৃষ্টি ট্যাঁশগরু, তাঁর কথাতেই

'.....গরু নয়, আসলেতে পাখি সে;
.....চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু, মুখখানা মস্ত,
ফিট্‌ফাট্ কালোচুলে টেরিকাটা চোস্ত।
তিন বাঁকা শিং তাঁর, ল্যাজখানি প্যাঁচান—
একটুকু ছোঁও যদি, বাপরে কি চ্যাঁচান!....'

তাঁর রচিত 'খিচুড়ি' কবিতায় তিনি নানা অদ্ভুত প্রাণীর সৃষ্টি করেছেন। যেমন—'হাঁসজারু' (হাঁস + সজারু), বকচ্ছপ (বক + কচ্ছপ), 'টিয়ামুখো গিরিগিটি', 'হাতিমি' (হাতি + তিমি)। এছাড়াও, ছাগল ও বিছার সংমিশ্রণ—

'ছাগলের পেটে ছিল না জানি কি ফন্দি,
চাপিল বিছার ঘাড়ে, ধড়ে মুড়ো সন্ধি!'

কিংবা জিরাফের সাথে ফড়িঙের বা গরুর সাথে মোরগের সংমিশ্রণ বেশ উল্লেখযোগ্য ও অভিনব।

'জিরাফের সাধ নাই মাঠে ঘাটে ঘুরিতে,
ফড়িঙের ঢং ধরি, সেও চায় উড়িতে।
গরু বলে 'আমারেও ধরিল কি ও রোগে?
মোর পিছে লাগে কেন হতভাগা মোরগে!"

সিংহ কেন হরিণের সাথে মিশে গেছে সে বিষয়ে তাঁর বক্তব্য—

'সিংহের শিং নেই, এই তার কষ্ট—
হরিণের সাথে মিলে শিং হল পষ্ট।'

চরিত্রগুলি সত্যিই খিচুড়ির মত নানা প্রাণীর সংমিশ্রণ। বিজ্ঞান কি এমন প্রাণীকে মানে। এক প্রাণীর সাথে অপর প্রাণীর সংমিশ্রণ কি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কিন্তু বিজ্ঞানের 'Xenotransplantation'– শাখার কাজই অন্য প্রাণীর অঙ্গ মানুষের দেহে প্রতিস্থাপনযোগ্য করে তোলার কাজ। এছাড়াও যখন কোন প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীর সৃষ্টি হয় তখন তাদের দুটি প্রাণীর বৈশিষ্ট্যযুক্ত 'missing link' নামক মধ্যবর্তী প্রাণী পাওয়া যায়।

এবার দেখা যাক। Nonsense অর্থাৎ কিনা যার কোনো sense নেই বলে যে কথাসাহিত্যকে অন্যান্য সাহিত্য থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে তা অন্যান্য সাহিত্যকর্ম থেকে ঠিক কতটা পৃথক। সুকুমার রায়ের যে অদ্ভুত চরিত্রগুলি তাঁর Nonsense সাহিত্যের মূল স্তম্ভ সেগুলি সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও রয়েছে, না বিরল কোনো

উদাহরণ হিসাবে নয় বরং অত্যন্ত সবল তাদের উপস্থিতি, তা সে শিষ্ট সাহিত্যেই হোক কিংবা লোকগাথায় (folklore)। জাতি, ধর্ম, স্থান, কাল ভেদে কখনও তারা ভিন্ন রূপে ভিন্ন নামে উপস্থিত, তবে হয়তো হাস্যরসের মোড়কে তারা উপস্থাপিত হয়নি।

আমাদের সর্বাধিক পূজিত দেবতা বিষ্ণু। তাঁর রয়েছে দশাবতার, ক্রমান্বয়ে সাজালে সেই দশাবতার হল—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কি। এর মধ্যে প্রথম চারটি অবতার হলেন মৎস্য (মানুষ + মাছ), কুর্ম (মানুষ + কচ্ছপ), বরাহ (মানুষ + বরাহ), নরসিংহ (মানুষ + সিংহ) সবই দুই প্রকার প্রাণীর সংমিশ্রিত রূপ। তবে কৃষ্ণের বিরাটরূপ (নভগুঞ্জরা'—তে সংমিশ্রণ সর্বাধিক। কৃষ্ণ তাঁর এই রূপটি প্রিয়সখা অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন। ওড়িয়া লেখক সরল দাসের লেখা মহাভারতে কৃষ্ণের এই রূপের উল্লেখ পাওয়া যায়।

> নভগুঞ্জরা নয়টি প্রাণীর সংমিশ্রণ। এর মাথাটি মোরগের। তিনটি পা বিশিষ্ট নভগুঞ্জরার প্রথম পা হাতির, দ্বিতীয় পা বাঘের এবং তৃতীয় পাটি কখনোও হরিণের আবার কখনোও ঘোড়ার হয়। একটি মাত্র হাত তা মানুষের তাতে পদ্ম অথবা চক্র ধরা থাকে। তার গ্রীবা ময়ূরের, পৃষ্টদেশে ষাঁড়ের কুঁজ, বুক সিংহের আর লেজটি একটি সাপ।

হিন্দু পুরাণগুলিতে, রামায়ণ-মহাভারতের ন্যায় মহাকাব্যে এরূপ বহু উদাহরণ দেখা যায়, সবার উল্লেখ করা সম্ভব না হলেও বেশ কিছু উদাহরণ দেওয়াই যায়। আমাদের সবার পূজিত গণেশ ঠাকুর (মাথা কাটার পর হাতির মাথা দেহে জোড়া হয়েছিল), রামায়ণের হনুমান (বাঁদর-মানুষ), জাম্বুবান (ভালুক-মানুষ), নন্দী (ষাঁড়-মানুষ), গড়ুর (ঈগলের ন্যায় মুখ ও ডানা বিশিষ্ট্য মানুষের দেহধারী এই বিষ্ণুর বাহন), উচ্চঃশ্রবা (ইন্দ্রের এই ঘোড়া সাত-মাথাওয়ালা ডানাযুক্ত, কামধেনু (মাথা মানুষের, শরীর গরুর আজ লেজ ময়ূরের), কিন্নর (মানুষ + পাখি), গন্ধর্ব (মানুষমুখী ঘোড়া), কেতু (চার হাত যুক্ত, নিম্নাঙ্গ সাপের ন্যায় এক অসুর), দক্ষ (প্রাণদানের পর দেহের উপর ছাগলের মাথা বসানো হয়েছিল)—সবই এরূপ সংমিশ্রিত রূপ।

হিন্দু পুরাণে বর্ণিত গন্ধর্বরা মানুষমুখী ঘোড়া গ্রীক সাহিত্যে একই প্রাণী centaur হিসাবে খ্যাত। গ্রীক পুরাণের Cimera নামক এক প্রাণীর নাম পাওয়া যায়, যার দেহটি সিংহ ও ছাগলের মিশ্রিত রূপ এবং লেজটি সাপ, Hapy (মহিলামুখী পাখি), Lilitu (মুখাবয়ব মহিলার, পা-পাখির এবং ডানাও পাখির), triton (মৎস্যপুরুষ কিন্তু লেজের সংখ্যা দুটি)—এরূপ নানা মিশ্রিত প্রাণীর উদাহরণে গ্রীক সাহিত্য সমৃদ্ধ।

মিশরীয় দেব-দেবীদের বেশিরভাগই অর্ধ-মানুষ ও অর্ধ-পশু। উদাহরণ হিসাবে বেশ কিছু দেব-দেবীর নাম নীচে উল্লেখ করা হল—

Horus (বাজমুখি মানুষের দেহযুক্ত দেবতা)

Anubis (শৃগালমুখী মানুষের দেহযুক্ত দেবতা)

Bastet (বিড়ালমুখী মানুষের দেহযুক্ত দেবতা)

Heqet (ব্যাঙের মাথা মানুষের দেহযুক্ত দেবতা)

Khepri (গুবরেপোকা বা কাঁচপোকার (durg-bettle) মুখও মানুষের দেহযুক্ত দেবতা)

Meret seger (কোবরা সাপের মুখবিশিষ্ট দেবতা)

Monthu (বাজপাখির মাথাবিশিষ্ট মানুষদেহের দেবতা)

Taweret (জলহস্তীর মুখ ও মানুষের দেহবিশিষ্ট দেবী)

Sobek (কুমীরমুখী মানুষের দেহবিশিষ্ট দেবী) প্রভৃতি বস্তুত মিশরীয় দেব-দেবীর অধিকাংশ মূর্তিই এরূপ দুই প্রাণীর সংমিশ্রিত রূপ।

রাশিয়ান লোকগাথায় Alkonost (পাখির মুখ বিশিষ্ট নারী) Gamayun (পাখির মুখবিশিষ্ট নারী) উল্লেখ পাওয়া যায়।

Kakura — বলে একপ্রকার প্রাণীর উল্লেখ জাপানী, হিন্দু, বৌদ্ধ তিনটি প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়, যার মাথা পাখীর ন্যায় আর শরীর মানুষের ন্যায়চীনা পুরাণে বলদ কিংবা ঘোড়ার সাথে মানুষের সংমিশ্রিত প্রাণীর উল্লেখ রয়েছে। Nü Wa একটি এরূপ চৈনিক লোকগাথায় প্রাণী যিনি মহিলা ও সাপের সংমিশ্রণে সৃষ্ট।

পার্সিয়ান সাহিত্যে Buraq-এর উল্লেখ পাওয়া যায় যার মানুষের মতো মুখ আর দেহটি ডানাওয়ালা ঘোড়ার।

নর্সীয় প্রাচীন সাহিত্যে Valkyrire-এর উল্লেখ পাওয়া যায় তিনি একজন ডানাযুক্ত জিন ছিলেন।

ফিলিপীনীয় লোকগাথার siyokoy —এমন এক প্রাণী যে আঁশযুক্ত মারম্যানের (মৎস্যপুরুষ) ন্যায় দেখতে।

এছাড়া বিশ্বব্যাপী সমগ্র সাহিত্যকর্মে এরূপ উদাহরণের ছড়াছড়ি। কখনও অক্টোপাসের সাথে (cecaelia), কখনও গাধার সাথে (Onocentaur) কখনও বা বিছার সাথেও (Scorpionman) মানুষের সংমিশ্রণ ঘটতে দেখা গেছে। 'Beauty and the Beast'—গল্পের Beast-এর চরিত্রায়ণে এরূপ সংমিশ্রণের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। 'Tourney to the West" নভেলের একটি মুখ্যচরিত্র Zhu-Bayieএকটি শূকরমুখী মানুষ চরিত্র।

সুকুমার রায়ের nonsense সাহিত্য তাই শুধু অর্থহীন শব্দ ভাণ্ডার নয় নবরসের শ্রেষ্ঠরস পরিবেশিত হয়েছে এই ছড়াগুলিতে। এর অর্থ কি সেটা ভাবতে ইচ্ছুকদের কবির ভাষাতেই বলতে ইচ্ছা করে—

এই কথাটার অর্থ যে কি, ভাবছে না কেউ মোটেও—
বুঝে না কেউ লাভ হবেকি, অর্থ যদি জোটেও।'

আট থেকে আশি আপামর জনগণের কাছে এই সাহিত্যিক বেশি প্রিয় তার এই অদ্ভুতুড়ে চরিত্রগুলির জন্যই। তাঁর উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তি তাঁর কলম বেয়ে জীবন্ত করে তুলেছে তাঁর চরিত্রদের। তাঁর লেখার জাদুকরীতে একটা সময় বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে এরা সত্যি, আজগুবি নয়

'আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা—'.....।

এই ছড়া বা গল্পগুলি নিখাদ আনন্দ দেয়। এগুলি পড়ার লাভ-ক্ষতি হিসাব করতে বসলে এর আনন্দ রস পানে বঞ্চিত হতে হবে। তবুও যদি কেউ লাভের হিসাব কষেন, তাহলে তাকে জানিয়ে দিই সুকুমার রায়ের লেখা পড়াটা কত লাভজনক—

'.....ঘন্টা হিসাবে চার আনা, মাইল হিসাবে দশ পয়সা। নগদ দিলে দু-পয়সা কম, যোগ করলে দশ আনা, বিয়োগ করলে তিন আনা, ভাগ করলে সাত পয়সা, গুণ করলে একুশ টাকা।'

তথ্যসূত্র ঃ

১। সুকুমার রচনা সমগ্র
২। রামায়ণ
৩। মহাভারত
৪। বিষ্ণুপুরাণ
৫। রায় পুরাণ
৬। গ্রীক পুরাণ
৭। Alice in wonderland–Lewis Carro..
৮। Beauty and the Best–Gabrille suzaune Barloot de villeneuve

আবোল তাবোল ঃ খেয়ালরসে সত্যের অনুসন্ধান

মধুশ্রী সেন সান্যাল

সাহিত্য জগতে এমন কিছু মানুষ রয়েছেন যাঁরা প্রত্যক্ষ বাস্তবভূমিতে তাঁদের জীবনচেতনার স্ফূরণ খুঁজে পান না, বরং তাঁদের সৃজনশীলতা অনেক বেশি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এক আশ্চর্য কল্পলোকের রোমান্টিক অবাস্তবতার মধ্যে। বিশিষ্ট্য শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায় তেমনই এক স্রষ্টা যাঁর পরিণত বুদ্ধিদীপ্ত মনে, জীবন ও জগতের অন্তর্নিহিত বহু বিচিত্র বৈপরীত্য থেকে জেগে ওঠা অনুভূতি, নির্মাণ করেছে এমন অপূর্ব এক জগৎ যার মধ্যে অনাবিল হাস্যরসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকে এক সূক্ষ্মতর চিন্তার ভুবন। পারিবারিক আবহাওয়া তাঁর মানসিক বিকাশে সাহায্য করেছিল অনেক।

শৈশবজীবনের কুমড়োপটাশ, রামগরুড়ের ছানা, ট্যাঁশগরু কিংবা বাবুরাম সাপুড়ের রচয়িতা সুকুমার রায় নিজেকে যতই প্রচ্ছন্ন রাখুন অনর্থের কুয়াশায়, কিন্তু একথা বিশ্বাস করা কঠিন যে লেখায় যে নিছক কৌতুকরসের যোগান দেওয়াই ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। ননসেন্স রাইম মাত্রই বিশুদ্ধ নন্‌সেন্স নয়, অনেকক্ষেত্রেই তা গভীর 'সেন্স'-এর ধারক বাহক। 'আবোল তাবোল'-এর জগৎও একেবারে বিশুদ্ধ নন্‌সেন্স নয়, সেখানে আছে পরিচিত বাস্তব-সত্যেরই রূপান্তরীকরণ তাই কি এত পরিচিত ও সত্য হয়ে ওঠে আবোল তাবোল বিশ্ব, যা সাবালক মনের কাছেও এত উপভোগ্য? এমনকি জীবনানন্দ দাশেরও মনে হয়েছে; 'সুকুমার রায়ের স্বকীয়তার কথা যতই ভাবা যায় ততই বিস্ময়ে ও আনন্দে স্তব্ধ হয়ে থাকতে হয়।'

'আবোল তাবোল' ১৯১৫ থেকে ১৯২৩-এর মধ্যে রচিত। বইটি বিভিন্ন কবিতা যতই উদ্ভট, আষাড়ে, খেয়ালি হোক না কেন, তবু তাদের একটা পা যে মাটির সঙ্গেই সংলগ্ন। তাই কবিতাগুলির ভাঁজে ভাঁজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তৎকালীন রাজনীতি, শিক্ষানীতি, সামাজিক সমস্যা ও ব্যক্তি মানসের উদ্ভট আচরণের অসংখ্য আলেখ্য। ডারউইনের বিবর্তনবাদতত্ত্ব থেকে শুরু করে হিন্দুসমাজের কৌলিন্যপ্রথা, কিছুই বাদ যায় নি। 'আবোল তাবোল'-এর সব কবিতার মধ্যে হাস্যরসের আড়ালে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ এবং যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

সুকুমার রায়ের কৌতুকে ঘেরা অদ্ভুত জগতে বেড়াতে যায়নি এমন শৈশব বুঝি খুঁজে পাওয়া দুর্লভ। 'আবোল তাবোল'-এর বেশির ভাগ কবিতাই দৃশ্যপাঠ্য, শুধু পড়ার জন্য নয়, চোখের সামনে ভেসেও ওঠে কত ছবি। 'ইহা খেয়াল রসের বই', বলেছিলেন কবি নিজে এবং সে-রস যাঁরা উপভোগ করতে পারেন না, বইটি অন্তত তাঁদের জন্য

নয়, এমনই এক মনোভাব পেশ করেছিলেন অকপটে। শৈল্পিক আচরণে ঢাকা 'খেয়াল' হল এই বইয়ের বাইরের আস্তরণ, অথচ ভেতরে প্রচ্ছন্ন আছে অর্থদ্যোতনায় ভাস্বর সমকালীন নানা প্রতিবিম্ব! 'আবোল তাবোল'-এর খেয়াল-খোলা জগৎ শুরু হয়েছে স্বপনদোলার নাচে, মত্ত মাদলের বোলে। সূচনাপর্বেই খেয়ালরসের পাত্রে ব্যাকরণ না মেনে রাঁধা হল 'খিচুড়ি' ঃ

হাঁস ছিল সজারু, (ব্যাকরণ মানি না),
হয়ে গেল 'হাঁসজারু' কেমনে তা জানি না।
বক কহে কচ্ছপে, বাহবা কি ফূর্তি
অতি খাসা আমাদের বকচ্ছপ মূর্তি
টিয়ামুখো গিরগিটি, মনে ভাবি শঙ্কা
পোকা ছেড়ে শেষে কিগো খাবে কাঁচা লঙ্কা!

আটজন অদ্ভুত প্রাণীর অস্তিত্ব আমরা কবিতা পড়ে শুধু অনুভব করি না, একেবারে চোখের সামনে যেন স্পষ্ট দেখতে পাই। ষোলোটা জীবজন্তুর ইচ্ছে-অনিচ্ছের পরোয়া না করে আজব সন্ধি ঘটানো হয়েছে। পাঠককে নাজেহাল করে দেওয়ার সব উপকরণ এখানে প্রস্তুত, তবু যুক্তির একটা আন্দাজ পাঠকের চেতনার কোনো গভীরতর তলে আপনা আপনি রয়ে যায়।

ছোটোদের জন্য লেখা সহজ কথা নয়। কবি যদি ছোটোদের মন থেকে কৌশলে সরিয়ে দিতে চান ভ্রান্ত সংস্কার অথবা ধারণাগুলি, পরিবর্তে তাদের সামনে সাজিয়ে তোলেন জীবনযাপনের এক স্বাস্থ্যময় ছবি, তাঁকে তখন খুঁজে নিতেই হয় হাসির চাল কিংবা খেয়ালখুশির হালকা মেজাজ। সুকুমার রায় একাধারে যেমন পেশ করেছেন 'হাসছি মোরা হাসি দেখ'র উচ্ছ্বাস, আবার পাশাপাশি তুলে ধরেছেন বাতিকগ্রস্ত কিছু মানুষের দীর্ঘ মিছিল। তাঁর কবিতার পৃথিবীতে একে একে হাজির হয়েছেন হেড-অফিসের বড়বাবু, গায়ক ভীষ্মলোচন, চণ্ডীদাসের খুড়ো, লড়াই খ্যাপা পাগলা জগাই, হাতুড়ে ডাক্তার, ষাঁড়ের তাড়ায় বিহ্বল কেতাব সর্বস্ব পণ্ডিত কিংবা শনির তাড়ায় আতঙ্কিত নন্দখুড়ো। অনিচ্ছুকদের তাড়া করে বেড়ানোই মূলত অধিকাংশের বাতিক। এসব চরিত্র ঘিরে আবর্তিত হয় আলতো একটা সমালোচনা কিংবা সরাসরি কোনো সাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে কৌতুক। তবে এই বাতিকগ্রস্থদের মধ্যে অনেকেই বুড়ো—কাঠবুড়ো, কাতুকুতুবুড়ো, বদিবুড়ো প্রভৃতি। আবার কিছু উচ্চারণে 'বুড়ো' শব্দটি হয়তো ব্যবহৃত হয়নি, কিন্তু ছবি বা বিবরণ দেখলেই বোঝা যায় যে, সমস্ত বাতিক সেইসব বয়সের গণ্ডিতেই পৌঁছে যাচ্ছে শেষে। তবে কি ছোটোরা নেই এই 'আবোল তাবোল'-এর দেশে? অছে তারাও,

নানাবিধ মজার চরিত্রে—আহ্লাদী, ডানপিটে অথবা কাঁদুনে হয়ে। সকৌতুকে শিক্ষার কথা কিংবা নিছক আমোদ, অসাধারণ দক্ষতায় সুকুমার রায় সরবরাহ করেছেন ছোটোদের দরবারে। বৈপরীত্যে ভরা অসম্ভবের সহজ আনন্দ পাবার আশায় কখনও মেনে নেওয়া হয় বোম্বাগড়ের রাজপরিবার ও তাদের প্রজাবৃন্দকে (বোম্বাগড়ের রাজা) অথবা হাসির নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়া রামগরুড়ের আস্তানাকে (রামগরুড়ের ছানা। কখনও আবার একটু অপ্রতিভ হাসিতে মজা মিশিয়ে দেখা যায় কত মূঢ় রীতিনীতিতে বদ্ধ আমাদের জীবন (কুমড়োপটাশ), কোথাও হাজির হয় গোঁফ দিয়ে মানুষ চেনার মতোই অসংগত কাজের নজির (গোঁফচুরি), কোথাও বা ফুটে ওঠে মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে গিয়ে একাংশের কাছে বংশকৌলিণ্যই শুধুমাত্র বিচার্য (সৎপাত্র), কখনও আবার পেশ করা হয় শক্তিমানের আদরে দুর্বলের প্রাণান্তকর অবস্থার করুণ ছবি (ভয় পেয়ো না)। এভাবে 'আবোল তাবোল'কে কেন্দ্র করে কত চেনা চেহারা, পরিচিত অনুষঙ্গ বাস্তব জগতে হঠাৎ উঁকি মেরে আমাদের একেবারে চমকে দিয়ে যায়।

খামখেয়ালের জগতের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে বিশেষ মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করে তোলার কাজটাও বড় সহজে করে যান সুকুমার রায়। 'ছায়াবাজি' বা 'কাঠবুড়ো' কবিতার ভাষ্যে, বাইরের চালটা ভর করে আছে সেই বাতিকগ্রস্থ মানুষদের ওপরেই—একজন ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করছে, অন্যজন সেদ্ধ করে ভিজে কাঠ চেটে খাচ্ছে। কিন্তু অপর একটি মাত্রায় এই কবিতা উন্নীত হয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরছে অন্য একটি দেখার চোখ। 'ছায়াবাজি' কবিতার পরতে-পরতে খুলে যাচ্ছে রকমারি ছায়ার রূপ। সেখানে একজন কবির চোখ 'ছায়ার কিছু কিছু' ঘুরে প্রত্যক্ষ করছে প্রহরে প্রহরে কীভাবে ছঠফটিয়ে সরে যায় ছায়া, আর নতুন-নতুন রূপ নিয়ে হয়ে ওঠে 'পাতলা ছায়া, ফোকলা ছায়া, ছায়া গভীর কালো।' আবার অন্যদিকে কাঠের স্বাদে, গন্ধে ও তত্ত্বে ভরা 'কাঠবুড়ো' কবিতায় কৌতুকের ছটার ফাঁকেই মূর্ত হয়ে ওঠে ফাটা কাঠ, ফুটো কাঠ, টিম্‌টিমে কাঠ ছুঁয়ে দেখার অভিজ্ঞতাটুকু। আজগুবি এক কল্পলোক আর অদ্ভুত এক বস্তুলোকের টানটান ভারসাম্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে কবির সহাস্য, অসম্ভব ভুবন। এই কারণেই তাঁর লেখায় ছড়িয়ে থাকা রসিকতারা, একাধারে সরল এবং তির্যক। সেসব উচ্চারণের কোষে-কোষে মিশে আছে নন্‌সেন্স আর লক্ষ্যময় শ্লেষ।

'বাবুরাম সাপুড়ে' কবিতাটির সঙ্গে আমাদের অশৈশব পরিচয়। সাপুড়েরা সাধারণত বিষাক্ত সাপ ধরে তার খেলা দেখায়। অথচ বাবুরামের ঝোলায় যে সাপ, তা দাঁত-নখ-চোখ হীন। সে সাপ নড়াচড়াও করে না, এমনকি ফোঁস করতেও জানা নেই তার। শিশুর কল্পনার মোড়কে ঢাকা এই ছবিটি কিন্তু এ লেখার আসল কথা নয়, এরমধ্যে কাজ করছে ভিন্ন এক সমাজসত্য। এমন অনেক মানুষই রয়েছেন যাঁরা জীবনের

দাঁত-নখের আঁচড় কিংবা কামড় সহ্য করতে অপারগ। সেইসব কাপুরুষতার বিরুদ্ধে কটাক্ষে ও শ্লেষে সোচ্চার এই কবিতা। কিন্তু শোনা যায় কুড়ি বছরের ব্যবধানে কবি নিজে কবিতাটির এক আলাদা ব্যাখ্যায় অগ্রসর হন। এই কবিতা রচনার ঠিক আগে ১৯২০ সালে গান্ধিজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। কংগ্রেসের নরমপন্থীরা এমন রাস্তা বেছে নিতেন যেখানে তেমন ঝুঁকি থাকত না। কিন্তু দেশের পরিস্থিতি তখন এতটাই উত্তাল ছিল যে এই আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তার দেশের নানান অঞ্চলে গণ-বিদ্রোহের আকার নিয়ে নেয়। স্বভাবতই গান্ধিজি এবং কংগ্রেসের নরমপন্থীরা বিচলিত হয়ে পড়েন। উৎপাতহীন সাপকে 'তেড়ে মেড়ে ডাণ্ডা'-য় ঠাণ্ডা করতে চেয়েছিলেন যে নেতৃত্ব, সেই ঝুঁকি না নেওয়ার মানসিকতাকে কবি বিদ্রূপ করতে ছাড়েননি। যদিও নখদন্তহীন সাপটি আদতে কে, তা কিন্তু এই ব্যাখ্যায় ততটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না।

পক্ষান্তরে 'একুশে আইন' কবিতায় ব্যঙ্গ তেমন তির্যক নয়, অপেক্ষাকৃত সরাসরি। ইতিমধ্যে অসহযোগ আন্দোলন থেকে গান্ধী সরে অসার পর দেশ জুড়ে ঔপনিবেশিক অত্যাচার প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছে। সাধারণ মানুষের অভ্যুত্থানে সন্ত্রস্ত ব্রিটিশ সরকার দেশের তরুণ, যুবক ও বিপ্লবী শক্তিকে দমন করার তাগিদে একের পর এক আইন তৈরি করতে থাকে। নির্বিচারে চলে হত্যা, গ্রেপ্তার, দীপান্তর। 'একুশে আইন' প্রকাশের কিছু পর নজরুল গ্রেপ্তার হন। অথচ অদ্ভুতভাবে আগেই রচিত কবিতায় মিলে যায় কবির কল্পনা ঃ 'যে সব লোকে পদ্য লেখে/তাদের ধরে খাঁচায় রেখে....।' সমস্ত কবিতার শরীরে রয়েছে ইংরেজ শাসনের ভয়াবহতার ছবি ও রোষ। এমনকি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে সাধারণ মানুষকেও কিছু কম হেনস্থা করা হত না সেসময়ে ঃ "চলতে গিয়ে কেউ যদি চায়/ এদিক ওদিক ডাইনে বাঁয়/ রাজার কাছে খবর ছোটে/পল্টনেরা লাফিয়ে ওঠে/দুপুর রোদে ঘামিয়ে তায়/একুশ হাতা জল শেলায়।" তবে এইসব রচনায় সমাজভাবনা খোঁজার তাগিদে যদি নির্দিষ্ট ঘটনাসূত্রের বেড়াজালে আটকে পড়ি আমরা, তাহলে লেখাগুলির মৌলিক সৌন্দর্য কিন্তু অধরাই থেকে যায়। কবি সমাজের দিকে মমতায় ভরা চোখ নিয়ে তাকিয়েছেন বলেই রকমারি ব্যধিকে তিনি পরিহাস ছলে ফূর্তির ছাঁদে ফুটিয়ে তুলেছেন অনায়াস মুন্সিয়ানায়।

'আবোল তাবোল'—এ সুকুমার রায় 'খ্যাপার গান নাইকো মানে নাইকে সুর' বলে পাঠককুলকে সতর্ক করে দিলেও শব্দের অর্থ-বৈচিত্র্য রকমারি শৈলীতে প্রস্তুত করেছেন। অনেকের মতে, আজগুবি জগতের স্রষ্টা এড়োয়ার্ড লিয়ার বা লুইস ক্যারলের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন সুকুমার রায়। হয়তো ছিলেন কিছুটা তবু এই কবির স্বাতন্ত্র্য একেবারে ভিন্ন ঘরাণার। শব্দের পাশে শব্দ গেঁথে, রঙ্গ-পরিহাসকে মুহূর্তে নিরর্থ থেকে

অর্থের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন তিনি, কবিতার নানা ভাঁজ থেকে ছিটকে বেরিয়েছে বোধ আর অর্থের রকমারি আলো। শৃঙ্খলাকে ভেঙে দেওয়ার এক সচেতন প্রয়াস বারবার পরিদৃষ্ট হয় তাঁর রচনায়। কবিতা নির্মাণে তিনি কোনও উদ্ভট কিংবা অলৌকিক ভাষার উপাদান প্রয়োগ করেননি, বরং বাংলার কথ্যভাষাকে সহজ পদ্যছন্দে বেঁধেছেন ঃ 'এটা চাই সেটা চাই কত তার বায়না—/কি যে চায় তাও ছাই বোঝা কিছু যায় না' (কিম্ভূত)। গায়ে পড়ে ঝগড়া করার ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে হঠাৎ অশুদ্ধ ইংরেজির মিশেল বাকস্পন্দকে আরও স্বাভাবিক করে তুলেছে ঃ 'ক্যান্‌রে ব্যাটা ইস্টুপিড্? ঠেঙিয়ে তোরে করব টিট।' 'বোলাও' কিংবা 'বোখার'-এর মতো হিন্দি শব্দ যেমন এসেছে নির্দ্বিধায় কৌতুকরস সৃষ্টির প্রয়োজনে, আবার ভৌতিক সুচকি হাসির অনবদ্য চেহারা ফুটে উঠেছে অন্য একটি কবিতার অঙ্গে ঃ 'শুনতে পেলাম ভূতের মায়ের সুচকি হাসি কটকটে'। (ভূতুড়ে খেলা) শব্দের ধ্বনিগত রূপ অবলম্বন করে 'খিচুড়ি' কবিতায় কবি তৈরি করেছেন জোড়কলম সব উদ্ভট প্রাণী। তবে এর উচ্চারণে হাঁসজারু-বকচ্ছপ-হাতিমির প্রসঙ্গ ছাড়া, অন্য জোড়কলম প্রাণীদের সচিত্র বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও কবিতায় তাদের নামের উল্লেখ নেই। একঘেয়েমির ক্লান্তি এড়ানোর জন্য হয়তো স্রষ্টার এই সংযম, যা কবিতাটিকে আরও উপভোগ্য করে নতুন আয়াস যুক্ত করেছে।

শব্দের ধ্বনি-গঠনকে বহুভাবে কাজে লাগিয়েছেন সুকুমার রায়। শব্দের প্রকৃত অর্থ বর্জন করে ধ্বনির নতুন নতুন অর্থ আবিষ্কৃত হয়েছে তাঁর হাতে। তিনি জানেন বিশেষ-বিশেষ পরিমণ্ডলে বিশেষ বিশেষ অর্থ গৃহীত হয়, কিন্তু তাকে যদি পরিমণ্ডল বিরোধী করে ব্যবহার করা যায়, তাতে বিপুল মজা তৈরি হয়। 'শব্দকল্পদ্রুম' কবিতায় নানা ক্রিয়াপদকে একেবারে অন্য প্রতিবেশে বসিয়ে অদ্ভুত কৌতুকরসের সঞ্চার করা হয়েছে। ফলে এই কবিতায় 'ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম দ্রাস' শব্দে ফুল ফোটে, 'হুড়মুড় ধুপধাপ' শব্দে হিম পড়ে, 'খ্যাঁস খ্যাঁশ ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ' শব্দে রাত কাটে আর 'দুড়দাড় চুরমার' করে ঘুম ভাঙে। আবার অন্য বাতাবরণে 'বুড়ির বাড়ী' ভাষ্যে হসন্ত ধ্বনির অবিরাম ব্যবহারে বুড়ির ঝুরঝুরে কাঁচা ঘরের নড়বড়ে ভাবটা আশ্চর্যভাবে যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অসামান্য শব্দের ছবিতে, ছন্দে-মিলে, কল্পনার অভাবনীয় উল্লাসে ও ধ্বনির বিচিত্র বিন্যাসে, ভাষার দিগ্‌দিগন্ত ছুঁয়ে আসতে চেয়েছেন এই কবি। বাংলাভাষায় অনুকার শব্দের এত অজস্র ব্যবহার, যেন চমকে দেওয়া প্রান্তিক মিলের আয়োজন, বাংলা দেশজ ও মৌলিক শব্দের অন্তরঙ্গ প্রয়োগ, বাংলার প্রচলিত ছন্দের শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে কাব্যবোধের নির্যাসে সুকুমার রায়ের ভাষা নির্মাণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অপ্রতিম। ছড়ার আঙ্গিকে লেখা ব্যঞ্জনাধর্মী এসমস্ত রচনা তাই সহজেই কবিতার মর্যাদায় উত্তীর্ণ।

সুকুমার রায়ের খেয়ালরসের মূল উৎস ছিল তাঁর গভীর জীবনবোধ। 'আবোল তাবোল'-এর শেষ লেখায় কবির আত্মসচেতনতার সমস্ত ঐশ্বর্য যেন ধরা রয়েছে ঃ

আজকে দাদা যাবার আগে
বলব যা মোর চিত্তে লাগে
নাইবা তাহার অর্থ হোক
নাইবা বুঝুক বেবাক লোক
আপনাকে আজ আপন হাতে
ভাসিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে

খেয়াল স্রোতে ভেসেও কবিতাটির আত্মায় ক্রমে এসে ছোঁয়া লাগে জীবনের আলোতাপ, গুটিয়ে আসা এক ধূসর পরিবেশের। সেখানে অন্ধকার আলোয় ঢেকে গেলে, সুরভিত অন্ধকার থেকে বেড়ে ওঠে ঘন্টা জীবনকে 'তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম' বলে উড়িয়ে দিয়ে মহানন্দে কবি তখন সাঙ্গ করেন তাঁর গানের পালা।

শিশু সাহিত্যের এই প্রবাদ পুরুষ কিন্তু দেখে যেতে পারেননি তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থটিকেও। স্বল্পায়ু জীবনে তাঁর সৃষ্টি ছিল বিস্ময়কর। গল্পে, কবিতায়, নাটকে আপাত অসলগ্ন সৃষ্টি ছড়া উপকরণ নিয়ে তিনি যে কল্পনার ইন্দ্রজাল রচনা করেছিলেন, তা আজও বাংলার ঘরে ঘরে পুরাকাহিনির গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত। অসম্ভবের কথা বলতে বলতে তিনি লেখার অন্তরে ফুটিয়ে তুলেছেন যে অসম্ভবের ছন্দ-যাপন; তা মূলত কৌতুকের বাহনে, খেয়ালরস বেয়ে, সত্যের অনুসন্ধান করে এবং সেখানেই তিনি অনন্য।

ঋণ ঃ

১) প্রস্তুতি পর্ব, বিশেষ সংখ্যা সুকুমার রায়, কারিগর
২) অনর্ঘ পত্রিকা ঃ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীও সুকুমার রায় সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০১২

কাব্য-শৈলীর আলোয় 'আবোল তাবোল'

পীযূষকান্তি অধিকারী

'শৈলী' শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে সংস্কৃত যে 'শীল্' ধাতু থেকে তার অর্থ হ'ল 'স্বভাব' অর্থাৎ নিজ অনুভূতির গভীরতা বা হৃদয়াবেগ। সুতরাং ব্যুৎপত্তিকেন্দ্রিক অর্থে যা নিজ অনুভূতি বা হৃদয়াবেগের অনুগামী তা'হল শৈলী (style)। একজন কবি-সাহিত্যিকের এই শৈলীই পাঠককে আকৃষ্ট করে, তাঁদের হৃদয়ে চিরস্থায়ী আসন করে দেয়। বিচিত্র পৃথিবীতে বিচিত্র মানুষ আর মানুষের মন। তবে সকল মনের অন্তঃপুরে থাকে এক যে শাশ্বত মন তারই কারবার চলে সাহিত্যিকের সৃষ্ট শৈলীর মধ্যে। এই শৈলী নিয়ে গুণীজনেরা বহু আলোচনা করেছেন। শৈলী বর্তমান বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে একটা একটা আধুনিক স্রোতের সৃষ্টি করেছে। শ্রদ্ধেয় হরলাল রায় তাঁর বিখ্যাত 'সাহিত্যের স্টাইল' প্রবন্ধে বলেছেন ঃ "সাহিত্যে সাহিত্যিক প্রকাশ করেন নিজেকে। সাহিত্য-শিল্পের মধ্যে তাই আমরা পাই লেখকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যকে।....লেখকের বাণীভঙ্গির মাধ্যমেই বিকশিত হয় লেখকের ব্যক্তিত্ব। সাহিত্যে লেখকের এই যে ভাব ও ভাবনার সম্যক প্রকাশ, একেই আমরা বলি 'স্টাইল'।" সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে বহু আলোচিত 'রীতি'কে অনেকে 'স্টাইল' বলে বিবেচনা করলেও এদের মধ্যে স্বরূপগত পার্থক্য আছে বলে কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানী অভিমত প্রকাশ করেছেন। আর সেইসকল ভাষা বিজ্ঞানীগণের মতে, রীতি হ'ল 'Literary style' ও শৈলী হ'ল 'Sociolinguistic style'। সুতরাং অতি সাধারণ ভাষায় বলা যায় যে, 'রীতি'র ক্ষেত্রে যেখানে ব্যক্তির পরিবর্তে সমষ্টির ভাবনা বেশী গুরুত্ব পায়, সেখানে 'শৈলী' সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে সাহিত্য-স্রষ্টার নিজের উপরে। ব্যক্তিগত ভাষাব্যবহারের দিকটি মাথায় রেখেই শৈলীর জলচেরা বিশ্লেষণ চলতে থাকে। বিষয়টি আরো সুন্দরভাবে বিকশিত করার জন্য অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তীর বক্তব্যটি তুলে ধরা যেতে পার ঃ "একটি কবিতা রচিত হল। বিশেষ করে সেই কবিতাটিই রচিত হবার কালে কবির মনে ভেসে উঠেছে কবিতাটির একটি নির্দিষ্ট গড়ন। মনের মধ্যে আকার নিয়েছে একটা ছাঁচ। সেই ছাঁচটিকে অবলম্বন করে রচিত কবিতাটির বিষয়-ভিত্তি থেকে শুরু করে অলঙ্করণের শেষ টানটির রেখা-বিভঙ্গ পর্যন্ত সমস্ত কিছুই সেই শৈলীর অন্তর্গত।....কবি যে অনুভবের কেন্দ্র থেকে একটি কবিতাকে তুলে আনেন সেই উপলব্ধির সম্পূর্ণতা কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তির মনের মধ্যে ঠিক সেইভাবেই গৃহীত হতে পারে না। আবার প্রত্যেক পাঠকের আছে নিজস্ব ভাবনাবলয়। নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির বহু-কৌণিকতা। সেখানে

দাঁড়িয়ে প্রত্যেক পাঠক কবিতাটির অবয়ব থেকে নিষ্কাশন করে নিতে পারেন নিজস্ব অনুধ্যানগত নবীনতর কোনো অর্থ এবং তদনুযায়ী সেই পাঠকের চোখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে কবিতাটির নতুন কোনো শৈলীগত দিক-যা হয়তো সবটাই ছিল না কবির সচেতন মনে।" সুতরাং এ বক্তব্য থেকে এটা বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না শুধু কবিই নন, সচেতন পাঠকও হয়ে উঠতে পারেন কোনো লেখায় নতুন কোনো শৈলীর আবিষ্কর্তা; যে শৈলীর বিষয় স্রষ্টার সচেতন ভাবনাতে হয়তো কখনো ছিল না। শৈলী সম্পর্কে বিধিবদ্ধ আলোচনাই হল শৈলীবিজ্ঞান। কোনো কবি ও তাঁর কাব্যকে বুঝতে, কবির বিশেষ আবেদন সৃষ্টির উপকরণগুলিকে চিনে নিতে পাঠককে সাহায্য করে শৈলীবিজ্ঞান। কোনো বিশেষ ভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে শৈলী বিজ্ঞানী প্রচলিত ব্যাকরণের সীমাকেও অনেক সময় লঙ্ঘন করে থাকেন। অনেক সময় যখন কবিতায় 'জুতুয়া' (লাল জুতুয়া পায়ে) শব্দের প্রয়োগ হতে দেখি তখন তা ব্যাকরণের সীমা লঙ্ঘন করলেও মূল অর্থ-গৌরবকে উজ্জ্বলই করেছে। এ ধরণের ব্যতিক্রমী প্রকাশ-ভঙ্গি হ'ল শৈলী যা আর পাঁচজন লেখক থেকে আলাদা। আবার এ ধরণের ব্যতিক্রমী প্রকাশ-ভঙ্গির অন্তরের মূল প্রেরণা হল লেখকের ব্যক্তিত্বের নিজস্বতা, যাকে সাহিত্যিক শৈলীবিশেষজ্ঞরা বলেছেন idiosyncrasy। শৈলী হচ্ছে লেখকের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ। ফরাসী সাহিত্যতাত্ত্বিক আঁরি ব্যুঁফোর মতে ঃ 'Style is the man himself.'। যেহেতু কবিতার ভাষা পরাভাষা, তার অন্তরালে থাকে নানা সংকেত রূপকের সমারোহ। একমাত্র প্রকৃত পাঠক পারেন সংকেতের মূল লক্ষ্যে পৌঁছাতে। আর এ কারণে কবিতা পাঠও হয়ে ওঠে এক ধরণের পুনর্লিখন। এসব ক্ষেত্রে শৈলী বিচার বিষয়টি শুধু ভাষা-রূপগত বিশ্লেষণের বিষয় হয়ে থাকে না। শৈলীবিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ শ্রীবাস্তব যথার্থই বলেছেন ঃ "শৈলীবিজ্ঞানও কবিতাকে সর্ব প্রথমে কবিতারূপেই গ্রহণ করে। শৈলীবিজ্ঞানও একথা স্বীকার করে যে, 'কবিতা' শুকনো কাঠ (অর্থাৎ নীরস পদার্থ) নয়।.....শৈলীবিজ্ঞান এই সিদ্ধান্তে কখনো বিরোধিতা করে না যে, কবিতার সঙ্গে একদিকে বিশ্লেষণী বুদ্ধির অতীত এক বক্তব্য এবং ভাবজগতের জীবনদৃষ্টির চিরন্তন সম্পর্ক রয়েছে। বরং এসব কথা স্বীকার করেও শৈলীবিজ্ঞান এই সিদ্ধান্তে অবিচল থাকে যে, কাব্যের সেই বুদ্ধির অতীত বক্তব্যবের জগতে পৌঁছাতে হলে ভাষারূপী মাধ্যমের সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য।"

বলা যায় সম্পূর্ণ এক নতুন শৈলী নিয়ে বাংলা শিশুসাহিত্যে সুকুমার রায়ের আত্মপ্রকাশ অভিনব ও বিস্ময়কর। বিশেষত্ত 'আবোল তাবোল' গ্রন্থটি বিশেষভাবে আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। শিশু সাহিত্যিক হিসেবে সুকুমার রায় এক চিরস্মরণীয় নাম। ১৮৮৭ সালের ৩ রা অক্টোবর তিনি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বাংলা শিশু সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃত এবং মাতা

বিধুমুখীনানা প্রতিভার অধিকারী পিতার সস্নেহ সান্নিধ্যে সুকুমার একটু একটু করে বড় হয়েছেন। শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মুকুল' পত্রিকার হাত ধরেই ছাত্র বস্থায় তাঁর বাংলা সাহিত্যে পথ চলা শুরু হয়। কলেজ ছাড়ার পরে পরেই আত্মীয় বন্ধুদের নিয়ে তিনি ননসেন্স ক্লাব গড়ে তোলেন। এই ক্লাবের পত্রিকা 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'য় ক্লাবেরই জন্য তিনি লেখেন 'ঝালাপালা' ও 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নামে দুটি নাটক। সেই সময়েই এই 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা' পত্রিকার পাতায় পাতায় রসিক সুকুমারকে পাঠক আবিষ্কার করে। 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটকটি বেশী উন্নত মানের হলেও 'ঝালাপালা'য় মৌলিক প্রতিভার ছাপ স্পষ্ট।

শৈলীর বাহন ভাষাকে আশ্রয় করে হাস্যরসের যে প্লাবন সুকুমার সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি 'ঝালাপালা'য় আমরা দারুণভাবে লক্ষ্য করি। আমরা লক্ষ্য করি, পাঠশালার ছাত্র কেষ্টা পণ্ডিতমশায়ের কাছে যখন ইংরেজি কথার মানে জানতে চায় ঃ

কেষ্টা—'আই গো আপ্, উই গো ডাউন' মানে কি?

পণ্ডিত—'আই'-'আই' কিনা চক্ষুঃ, 'গো'-গয়ে ওকারে গো-গৌ গাবৌ গাবঃ ইতমঃর, 'আপ্' কিনা আপঃ সলিলং বারি, অর্থাৎ জল। গরুর চক্ষে জল, অর্থাৎ কিনা গরু কান্দিতেছে। কেন কান্দিতেছে? না, 'ইউ গো ডাউন', কিনা 'উই' অর্থাৎ যাকে বলে উই পোকা—'গো ডাউন' অর্থাৎ গুদামখানা। গুদামখানায় উই ধরে আর কিছু রাখলে না, তাই না দেখে 'আই গো আপ্'—গরু কেবলই কান্দিতছে—এখান থেকেই পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির অভিমুখ হাস্যরসের সমুদ্রবক্ষে চিরকালের জন্য মিলিত হতে চলেছে। 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটকে "রামায়ণের কিছু চরিত্রকে মহাকাব্যের জগৎ থেকে টেনে নামিয়ে একেবারে রং তামাসার আসরে এনে ফেলা হয়েছে। এই রামায়ণে পুঁইশাক চচ্চড়ি, বাথগেট কোম্পানি, হোমিওপ্যাথি, ব্যায়ামবীর স্যান্ডো, রেকারিং ডেসিম্যল ইত্যাদি অকাব্যিক প্রসঙ্গ অনায়াসে স্থান পেয়ে গেছে। এই রামায়ণে হনুমান বাতাসা খায়, যমদূতের মাইনে বাকি পড়ে, সুগ্রীব জখম পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধে, বিভীষণের দাড়ির গন্ধ জাম্বুবানের বিরক্তি উদ্রেক করে।" (সত্যজিৎ রায়) শুধু তাই নয়, এ নাটকেরই প্রথম আমরা সংগীত-রচয়িতা সুকুমারের যে গানগুলি আবিষ্কার করি সে গানগুলিও নাটকের হাস্যরস দারুণভাবে বিকশিত করেছে।

১৯১৩ সালের মে মাস। এসময়ে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় মাসিক সন্দেশ পত্রিকা পথ চলা শুরু করে। উপেন্দ্রকিশোর বেশ হাস্যরসিক ছিলেন। তাঁর পৌরাণিক গল্পের ছবিতে হাস্যরসের তেমন কোনো সুযোগ না থাকলেও শুধুমাত্র শিশুদের কথা চিন্তা করে দৈত্য-দানব-রাক্ষস-পিশাচের ছবি ফুটিয়ে তুলতে তিনি ভয়ঙ্কর

রসের সাথে হাস্যরসকে মিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর আঁকা মানুষের হাসির ছবিতে শ্লেষ-বিদ্রূপ নয়, আছে মৃত্যু-স্নিগ্ধ মোলায়েম হাসি, যা তাঁর নিজ চরিত্রের প্রতিফলন বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু সুকুমার অসাধারণ কল্পনাশক্তিও পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতার সমন্বয়ে 'আবোল তাবোল', 'খাই খাই' 'অন্যান্য কবিতা' নামক কাব্য কবিতার ও 'হ য ব র ল'-এর ছবিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। আলোচ্য 'আবোল তাবোল' কাব্য কবিতায় তাঁর আঁকা কাল্পনিক বাস্তব জগতে আঁকা কোনো প্রাণীর অস্তিত্বে কোনো সন্দেহ থাকে না। তাঁর কাঠবুড়ো বা চন্ডীদাসের খুড়ো, রামগরুড় যেমন জীবন্ত তেমনি বিশ্বাস হারায় না। ১৯১৪ সালের তিনি লেখেন 'খিচুড়ি' কবিতা। তাঁর লেখায় এই সবে স্থান পেল উদ্ভট সব প্রাণীর মিছিল, যা সুকুমারী শৈলীর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঃ

"হাঁস ছিল সজারু, (ব্যাকরণ মানি না),
হয়ে গেল "হাঁসজারু" কেমনে তা জানি না।
বক কহে কচ্ছপে—'বাহবা কি ফূর্তি!
অতি খাসা আমাদের বকচ্ছপ মূর্তি!"

এমনভাবে অদ্ভুত প্রাণীজোড় শব্দকে কবিতায় ব্যবহার তিনি যেমন করেছেন, তেমনি তার সঙ্গে মোরগরু, গিরগিটিয়া, সিংহরিণ, হাতিমি প্রভৃতি নামকরণের প্রাণীর চেহারাও এঁকে এঁকে দেখিয়ে দিলেন। এর মাস কয়েক পরে 'সন্দেশ' পাঠকদের সাথে দেখা হয় কাঠবুড়োর। এই কাঠবিশেষজ্ঞ চরিত্রটিকে কবি সুকুমার অত্যন্ত দরদ দিয়েই অঙ্কন করেছেন। তাকে কবি সমাজের আজগুবি ভাবনায় রত একশ্রেণির উদ্ভট বাতিকগ্রস্থ মানুষের প্রতীকরূপে গড়ে তুলেছেন। অবশ্য তাঁর কবিতায় হামেশাই চোখে পড়ে ছায়াধরার ব্যবসাদার, ফুটোস্কোপের আবিষ্কর্তা, চন্ডীদাসের খুড়ো, হেড অফিসের বড়বাবু প্রমুখের মতো এক ঝাঁক অস্বাভাবিক চরিত্রে। এসব চরিত্রের অসঙ্গতি মজার কবি সুকুমার অত্যন্ত নিখুঁতভাবে এঁকেছেন। তাঁর কলমের আঁচড়ে নানা বিকৃত চরিত্রকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়েছে মানুষের অন্তর্নিহিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রকাল্পনিক মনে হলেও শেষ পর্যন্ত বাস্তব চরিত্রের অভিজ্ঞতার সাথে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে কোথাও না কোথাও মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

আমরা লক্ষ্য করি জান্তব চরিত্রের সচেতন মিশ্রণের মধ্যে কবির কৌতুকপ্রিয় মানসিকতা প্রকাশিত হবার সাথে হাস্যরসের ভাণ্ডারটিও পরিপূর্ণতা পেয়েছে। তাঁর আঁকা জান্তব চরিত্র চির রহস্যে মোড়া। আবার তাঁর অনেক মনুষ্য চরিত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জান্তব জগাখিচুড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়। কবিতা প্রকৃত ভাষায় পৌঁছানো যায় বক্রোক্তির পথ ধরেই। আর এই সুবিধের দিকটিকে কবিতা রচনায় তিনি সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছেন অদ্ভুত, উদ্ভট চরিত্র এবং আজগুবি বিষয় নির্বাচন করে। আর এসব বিষয়

পাঠে পাঠকমনে বিশেষ করে শিশুমনে হঠাৎ জেগে ওঠা অস্বাভাবিকতা বোধ হাসির উদ্রেক করবে এটাই স্বাভাবিক। কারণ আমাদের সদা জাগ্রত নমনীয় শান্ত স্বভাব যখন কোনো অস্বাভাবিক অনমনীয়তার দ্বারা আক্রান্ত হয় তখনই হাসির সৃষ্টি হয়। এই অস্বাভাবিক অনমনীয়তা যত বৃহৎ হবে হাসির মাত্রাও তত বাড়তে থাকবে। হাসির কবি সুকুমার রায়ের 'অবোল তাবোল' কাব্যের এমন কোনো কবিতা নেই, কবিতায় এমন কোনো স্তবক নেই, স্তবকে এমন কোনো চরণ নেই, চরণে এমন কোনো শব্দ নেই যেখানে হাস্যরসের কোনো উপাদান নেই। হাস্যরস এখানে এমন এক শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যা দেখে স্রষ্টাকে বহুর মধ্যে খুঁজে নিতে তেমন কোনো চেষ্টাই করতে হয় না। এখানেই তাঁর সৃষ্টিতে শৈলীর বাহাদুরি। এছাড়াও তাঁর কাব্য-কবিতায় নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের যে যে ছাপ তিনি রেখেছেন তা হল ঃ

(ক) কবিতার নাম নির্বাচনে। খিচুড়ি, কাঠ-বুড়ো, গোঁফ চুরি, কাতুকুতু বুড়ো, গানের গুঁতো, খুড়োর কল, লড়াই-ক্ষ্যাপা, কুমড়ো পটাশ, ট্যাঁশ গরু, আবোল তাবোল প্রভৃতি। এমন মজাদার যে কোনো কবিতার নাম হতে পারে তা সুকুমার রায় প্রথম প্রমাণ করে দেখালেন। আরো দেখালেন বড় আজগুবি বিষয়ও কীভাবে শিশু-কিশোরের, সর্বোপরি পাঠকের মনোলোকে চিরকালের বিষয় হয়ে ওঠে।

(খ) বিষয়ের বর্ণনা ভঙ্গিতেও তার কবিতা স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। 'আবোল-তাবোল' কাব্যের প্রথম থেকে শেষ কবিতা 'আবোল তাবোল' পর্যন্ত প্রত্যেকটি কবিতার অতি সাধারণ বিষয় শুধু বর্ণনার গুণে চিরকালের বিষয় হয়ে উঠেছে। তাঁর বর্ণনার বাহাদুরিতে দূরের অজানা, অপরিচিত, অবাস্তব বিষয়ও বড় কাছের বলে মনে হয়। আমরা লক্ষ্য করি, 'হাত গণনা' কবিতায় কবি এই পেশার ভণ্ডামির মুখোশ পরিপূর্ণরূপে খুলে দিতে সমর্থ হয়েছেন পাঠকের সামনে। স্বভাবে সরল সোজা অমায়িক শান্ত প্রকৃতির সুস্বাস্থ্যের অধিকারী 'ও পাড়ার নন্দ গোঁসাই' মানে নন্দ খুড়ো হঠাৎ খেয়ালে নিজের হাত গণনা করাতে গেলে গণনাকারী তাকে 'শনি'র দশা আর 'ফাঁড়ায় ভরা আয়ুর রেখার' কথা বলে ভয়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়। আর এর ফলে নন্দ কিভাবে 'পটল তোলা'র অবস্থায় পৌঁছায় তা দেখানোই কবির মূল উদ্দেশ্য। হাত দেখানোর পর নন্দর সকরুণ অবস্থা কবির বর্ণনায় ধরা পড়েছে এইভাবে : 'বুড়ো আছে নেই কো হাসি, হাতে তার নেই কো হুঁকো।' আবার 'রামগরুড়ের ছানা' কবিতায় 'হাসতে মানা' ছানাগুলি সমাজের প্রতিবাদহীন এক শ্রেণীর মানুষের কথাই মনে করিয়ে দেয়। 'হাতুড়ে' কবিতায় অন্তঃসারশূন্য তৎকালীন চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় :

"কালাজ্বর, পালাজ্বর, পুরানো কি টাট্‌কা,
হাতুড়ির একঘায়ে একেবারে আট্‌টা!"

বিষয় বর্ণনার সামগ্রিক বিচারে শ্রদ্ধেয় সত্যজিৎ রায় বলেছেন : "....ট্যাশ্ গরুকে অনায়াসে দেখা যায় হারুদের আপিসে, কিম্ভূত কেঁদে মরে 'মাঠপারে, ঘাটপারে', কুমড়োপটাশও নিশ্চয়ই শহরের আশে-পাশেই ঘোরাফেরা করেন, নইলে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের এতটা সতর্ক হবার প্রয়োজন হত না। একমাত্র রামগরুড়ই সংগত কারণেই নিরিবিলি পরিবেশ বেছে নিয়েছে; কিন্তু সেও রূপকথার রাজ্যে নয়। অবশ্যি এদের জগৎটাকে ঠিক বাস্তব জগৎও বলা চলে না। এটা আসলে হল সুকুমারের একান্ত নিজস্ব একটি জগৎ এবং এই জগতের সৃষ্টিই হল সুকুমারের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।"

(গ) কবিতায় ছবির সংযোজন। রসিক কবি সুকুমার রায় তাঁর অধিকাংশ কবিতার পাশে বিষয় ও চরিত্রকে আরো বেশি বিকশিত সহজবোধ্য করার জন্য নিজে ছবি এঁকেছেন। তাঁর ছবি কথা বলে। কবিতার বক্তব্যকে আরো বেশি সরল-তরল করে দেয়। তাঁর কবিতার ছবি বিজ্ঞান ভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত। ছবির বিষয়ে আকর্ষণ তাঁর মধ্যে সংক্রামিত হয়েছিল পিতা উপেন্দ্রনাথের ছবি-প্রীতির সূত্র থেকেই। উপেন্দ্রনাথ রাক্ষস দৈত্য দানবের চেহারা ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে ভয়ঙ্কর রসের সাথে হাস্যরস মিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ছবির হাসিতে শ্লেষ বা বিদ্রুপের কোনো স্থান ছিল না। কিন্তু সুকুমারে ছবির হাসিতে শ্লেষ না থাকলেও ব্যঙ্গ দারুণভাবে উপস্থিত। কৌতুকপ্রিয় মজলিসী মেজাজের কবি সুকুমারে ছবিতে প্রাণখোলা অট্টহাসির ঝাঁঝ পাঠক মাত্রেই উপভোগ করেন।

(ঘ) শব্দপ্রীতি ও শব্দসৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ। বলা যায় কবি শব্দ নিয়ে খেলা করেছেন কবিতার অলিতে-গলিতে সর্বত্র। তিনি ইচ্ছা মতো শব্দকে ভেঙেছেন, ভেঙে অন্য কোনো শব্দাংশের সঙ্গে জুড়েছেন, নতুন রূপ দিয়েছেন। শব্দ-সৃষ্টি এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রচলিত গতানুগতিক রীতি-নীতির বাইরে এসে সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে এমনভাবে মেতেছেন তিনি যাকে কোনোভাবে ব্যাকরণের নিয়ম-লঙ্ঘন বলে পাঠক প্রতিবাদ জানাতে পারেন না; বরং শব্দ-সৃষ্টির বৈচিত্র হিসেবে স্রষ্টা পাঠকের কৃতজ্ঞতা আদায় করে নিতে সমর্থ হন। 'হাঁসজারু', 'বকচ্ছপ', 'মোরগরু', 'গিরগিটিয়া', 'সিংহরিণ', 'হাতিমি', প্রভৃতি নামকরণের প্রাণীর চেহারা কবির নিজের মস্তিষ্ক-প্রসূত। অনেক ক্ষেত্রে সুকুমারের স্টাইল বিশেষ ধরণের শব্দ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। অব্যক্ত ধ্বনির অনুকরণে যে ধ্বনাত্মক বা আকার অব্যয় গঠিত হয় তার শ্রুতিগ্রাহ্য ও অনুভূতি গ্রাহ্য-দুটি রূপেরই বহুল ব্যবহার তাঁর লেখায় হামেশাই চোখে পড়ে। যেমন :

১) ঢপ্ ঢপ্ ঢাক্ ঢোল ভপ্ ভপ্ বাঁশি
ঝন্ ঝন্ করতাল্ ঠন্ ঠন্ কাঁসি।

২) চুপ্ চুপ্ ঐ শোন্! ঝুপ্ ঝাপ্ ঝ-পাস!

চাঁদ বুঝি ডুবে গেল?—গব্ গব্ গবা-স্!
খ্যাঁশ্ খ্যাঁশ্ ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ্ রাত কাটে ঐরে!
দুড্ দাড্ চুরমার-ঘুম ভাঙে কই রে!

৩) তাই বলি-সাবধান! ক' রোনোকো ধুপ্ ধাপ্,
টিপি টিপি পায় পায় চলে যাও চুপ্ চাপ্।

এছাড়া ধুপ্ ধাপ্, ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ্, ফোঁস্ ফোঁস্, ঘটর্ ঘটর্, ঠাঁই ঠাঁই, ঠক্ ঠক্, খক্, খক্, ঠন্ ঠন্, দুম্ দাম্, ঠুক্ ঠাক্ প্রভৃতি অসংখ্য শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনাত্মক অব্যয় এবং ছি ছি, চট্ পট্, ছট্ ফট্, চুপ্ চাপ্, কপ্ কপ্, টন্ টন্ প্রভৃতি অসংখ্য অনুভূতিগ্রাহ্য ধ্বনাত্মক অব্যয় কবিতার পর কবিতায় রয়েছে। একথা ঠিক তাঁর 'আবোল তাবোল' কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় তিনি কোনো না কোনো ধ্বন্যাত্মক অব্যয় ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত সচেতনভাবে। খ্যাতনামা লেখকগণের মতো সুকুমার রায়ের বিশেষ বিশেষ চরিত্র নির্বাচনের মধ্য দিয়েও শৈলী প্রকাশ পেয়েছে। যেমন ঃ

১) 'এক যে রাজা"—"থাম না দাদা, (গল্প বলা)

২) কেউ কি জান সদাই কেন বোম্বাগড়ের রাজা— (বোম্বাগড়ের রাজা)

৩) রাজা বলে, "কেইবা শোনে যে কথাটা ঘুর্‌ছে মনে, (নেড়া বেলতলায় যায় ক' বার?)

৪) রাজা এত ঘুম্‌ছে কেন—শুনতে মোদের বারণ কি?

৫) ওগো রাজা মুখ্‌টি খোল—কওনা ইহার কারণ কি?

৬) সিংহাসনে বস্‌লে রাজা বাজ্‌ল কাঁসর ঘন্টা, (গন্ধ বিচার)

৭) এক যে ছিল রাজা—(থুড়ি,
রাজা নয় সে ডাইনি বুড়ি)! (আবোল তাবোল, অন্যান্য কবিতা) প্রভৃতি।

—শুধু 'আবোল তাবোল' কাব্যের এই কয়টি উদাহরণ থেকেই, সুকুমারের কবিতায় 'রাজা' শব্দটির বারবার ব্যবহারের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই একই চরিত্রক্ষেত্র বিশেষে প্রতিবারই পাঠকের মানসলোকে নতুন সংবেদন সৃষ্টি করে। 'রাজা' শব্দটি বিভিন্ন কবিতায় যেমন ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি কোনো কোনো কবিতায় বহুবারও উপস্থিত রয়েছে। 'গন্ধ বিচার' শীর্ষক কবিতায় নয় বার 'রাজা' শব্দটি প্রয়োগ করে কবি তাঁর প্রেষণা বা মোটিভেশনের পরিচয় রেখেছেন। এ ধরণের প্রেষণার পথরেখা অনুসরণ করে সুকুমারের কবি সত্তার পরিচয় উদ্‌ঘাটন অসম্ভব নয়।

ঙ) বাক্য গঠনেও তাঁর লেখায় বেশ বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। শব্দের মালা গেঁথেই সৃষ্টি হয় বাক্য। আর এই বাক্যকে একটা ব্যাকরণ রূপ সংবিধানের নিয়ম মেনে চলতে হয়। কিন্তু প্রতিভাধর কবিরা অনেক সময় তাঁদের লেখায় সাধারণ ব্যাকরণের গতিবিধি

ভেঙে তছ্‌নছ্‌ করে ভাব ব্যক্ত করে চলেন পাতার পর পাতায়। 'হাসতে হাসতে আসছে দাদা আসছি আমি আসছে ভাই', (আহ্লাদী) বা 'বল্‌লে রাজা', "মন্ত্রী তোমার জামায় কেন গন্ধ?" (গন্ধ বিচার) প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রে বাংলা বাক্যের পদক্রমের নিয়ম অনুযায়ী শব্দ-সজ্জা হয়নি অর্থাৎ ক্রিয়ার পরে বসেছে কর্তা। তথাপি এসব চরণের ছন্দ-পতন হওয়াতো দূরে থাক বরং তা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আবার আমরা যখন দেখি :

"রোদে রাঙা ইঁটের পাঁজা তার উপরে বসল রাজা
ঠোঙা ভরা বাদাম ভাজা খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না।"

তখন এর শব্দ-সজ্জার ঐশ্বর্য ব্যাকরণগত ত্রুটিকে শুধু ম্লানই করে না, আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করি ইঁটের পাঁজার সঙ্গে রাজার, বা রাজার সঙ্গে বাদাম ভাজার কী অসাধারণ সম্পর্ক রয়েছে। এই উপলব্ধির সাথে সাথে ছন্দ-মিলে ভর করে নব অনুভূতি পাঠককে সাধারণ কাব্য-কৌতুকের জগৎ থেকে এক নব্য জগতে পৌঁছে দেয়।

চ) কাব্যের আত্মা ধ্বনি। ননসেন্স ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা, সাড়ে বত্রিশ ভাজা'র লেখক কবি সুকুমার রায় তাঁর কাব্যে অত্যন্ত সচেতনভাবে ধ্বনিকে কাজে লাগিয়েছেন। জগৎ ও জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখতে দেখতে তিনি অভিজ্ঞতায় নিজেকে অনেকটা জোকারের পর্যায়ে উন্নীত করতে পেরেছেন। স্বাভাবিকভাবে সাহিত্যের কারবারে তাঁর শব্দ-ধ্বনি নিয়ে খেলা সরল শিশু থেকে সাধারণ পাঠকের কাছে অস্বাভাবিক, উদ্ভট লাগে। ফলে তাঁর কাব্য-পাঠে অতি বড় গম্ভীর মানুষও না হেসে পারেন না। তিনি 'খেয়াল রসের' ধারাকে সমৃদ্ধ করতে যখন লেখন—

"ঠাস্‌ ঠাস্‌ দ্রুম্‌, দ্রাম্‌, শুনে লাগে খট্‌কা—
ফুল ফোটে? তাই বল! আমি ভাবি পট্‌কা!
শাঁই শাঁই পন্‌ পন্‌, ভয়ে কান্‌ বন্ধ—
ওই বুঝি ছুটে যায় সে-ফুলের গন্ধ?"

—তখন এসব শব্দের ধ্বনি-ঝঙ্কারের মহিমা কাব্যেদেহে সৌন্দর্যের প্লাবন সৃষ্টি করে এবং অর্থ বাচ্যকে ছাড়িয়ে যায়।

ছ) চিত্রকল্প সৃষ্টিতেও মজার কবি সুকুমার ছিলেন অসাধারণ দক্ষ। তিনি শব্দ দিয়ে ছবি এঁকে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাই তাঁর কবিতা পাঠে বর্ণিত বিষয় ছবির মতো মানসপটে ভেসে ওঠে। 'বুড়ীর বাড়ী' কবিতায় বুড়ীর ভয়ানক দারিদ্র্য, অসহায়তা, নিঃসঙ্গ জীবনের করুণ চিত্র ভেসে উঠেছে কবিতার শেষ চারটি চরণে :

"ছাদগুলো ঝুলে পড়ে বাদ্‌লায় ভিজে,
একা বুড়ী কাঠি গুঁজে ঠেকা দেয় নিজে।
মেরামত দিনরাত কেরামত ভারি,
থুর্‌থুরে বুড়ী তার ঝুর্‌ঝুরে বাড়ী।"

আবার তৎকালীন হাতুড়ে ডাক্তার কেন্দ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সকরুণ চিত্র ভেসে উঠেছে কবির বর্ণনায় :

"ছেলে হও, বুড়ো হও, অন্ধ কি পঙ্গু,
মোর কাছে ভেদ নাই, কলেরা কি ডেঙ্গু—
কালাজ্বর, পালাজ্বর, পুরানো কি টাট্‌কা,
হাতুড়ির একঘায়ে একেবারে আট্‌কা!" (হাতুড়ে)

অহংকারী বিদ্যেবোঝাই বাবুমশায়ের চির অসহায়তা ও হাহাকারের ছবি ফুটে উঠেছে মাঝির শেষ ভাষণে :

"বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব করো পিছে,
তোমার দেখি জীবনখানা ষোল আনাই মিছে।"

শুধু জীবন-চিত্র নয়, প্রকৃতির অনিন্দ্য অপরূপ রূপের অতি জীবন্ত বিশ্বস্ত চিত্র তাঁর কবিতা-কাব্যে ছড়িয়ে আছে। তাঁর 'অন্যান্য কবিতা'র 'মেঘের খেয়াল'-এর বর্ণনা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখা নিখুঁত চিত্রকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় :

"আকাশের ময়দানে বাতাসের ভরে,
ছোট বড় সাদা কালো কত মেঘ চরে।
কচি কচি থোপা থোপা মেঘেদের ছানা
হেসে খেলে ভেসে যায় মেলে কচি ডানা।
কোথা হতে কোথা যায় কোন্‌ তালে চলে,
বাতাসের কানে কানে কত কথা বলে।"

জ) তাঁর 'আবোল তাবোল' কাব্যের মোট ৪৫টি কবিতার মধ্যে 'কাঠ-বুড়ো', 'কুম্‌ড়ো পটাশ', 'একুশে আইন', 'হুঁকোমুখো হ্যাংলা', 'রামগরুড়ের ছানা'—এই পাঁচটি কবিতা মাত্র ছ'টি করে স্তবক নিয়ে গঠিত। এছাড়া চার স্তবকের কবিতা হচ্ছে 'নেড়া বেলতালায় যায় ক'বার?', 'দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম', 'হুলোর গান', 'ফস্‌কে গোলো'। তাঁর এ কাব্যে 'ডান্‌পিটে' কবিতাটি হল তিন স্তবকের। দু'স্তবকের কবিতা দু'টি হল 'খুড়োর কল' ও 'ভয় পেয়ো না'। অন্য ৩৩ টি কবিতাই এক স্তবকের। তিনি তাঁর কাব্যে ছন্দ ও অলংকার সৃষ্টিতে যে যাদু দেখিয়েছেন তা বড় বিস্ময়ের! অলংকার প্রয়োগের বৈচিত্র তাঁর লেখায় হামেশাই চোখে পড়ে। যেমন—

১) কাঠে কাঠে ঠুকে করে ঠকাঠক্ শব্দ, (কাঠ-বুড়ো) বৃত্ত্যনুপ্রাস অলংঙ্ককার,

২) খেলার ছলে যষ্টিচরণ হাতী লোফেন যখন তখন,
দেহের ওজন উনিশটি মণ, শক্ত যেন লোহার গঠন। (পালোয়ান)

(এখানে একসঙ্গে অপহ্নতি অলংকার, অন্ত্যানুপ্রাস অলংকার, বৃত্ত্যনুপ্রাস অলংকার হয়েছে।)

৩) হাত পাকে লিখে লিখে, চুল পাকে বয়সে, (পাকাপাকি, খাই খাই) যমক অলংকার,

৪) ভোজের বাজি ভেল্কি ফাঁকি পড়্ পড়্ পড়্বি পাখি—ধপ্! (ফস্কে গেল) শ্রুত্যনুপ্রাস অলংকার,

৫) ছুটছে মোটর ঘটর্ ঘটর্ ছুট্ছে গাড়ি জুড়ি; (দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম) বৃত্ত্যানুপ্রাস অলংঙ্কার,

৬) দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্ ! দেড়ে দেড়ে দেড়ে! (দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্) বৃত্ত্যনুপ্রাস অলংকার,

৭) তার যে মাতুল—মাতুল কি সে? (গল্প বলা)

৮) দেহের ওজন উনিশটি মণ, শক্ত যেন লোহার গঠন। (পালোয়ান) উৎপ্রেক্ষা অলংকার,

৯) ঢপ্ ঢপ্ ঢাক্ ঢোল ভপ্ ভপ্ বাঁশি
ঝন্ ঝন্ করতাল্ ঠন্ ঠন্ পাঁসি। বৃত্ত্যনুপ্রাস অলংঙ্কার,

১০) চুপ্ চুপ্ ঐ শোন্! ঝুপ্ ঝাপ্ ঝ-পাস! (শব্দ কল্প দ্রুম!) বৃত্ত্যনুপ্রাস অলংকার ইত্যাদি।

ঝ) আমরা লক্ষ্য করি সুকুমার রায় তাঁর কাব্য-কবিতার সৌন্দর্যায়নে বাংলায় তিন প্রকার (অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত) প্রধান ছন্দেরই প্রয়োগ অত্যন্ত নিপুণভাবে করেছেন। এখানে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হল—

১) এইত সেদিন/রাস্তা দিয়ে/চলতে গিয়ে/ দৈ বশে, ৪ + ৪ + ৪ + ৪
উপর থেকে/প্রকাণ্ড ইঁট/পড়ল তাহার/মাথায় খ'সে। (স্বরবৃত্ত ছন্দ)
৪ + ৪ + ৪ + ৪

২) হাত পাকে/ লিখে লিখে,/ চুল পাকে/বয়সে, ৪ + ৪ + ৪ + ৩
জ্যাঠামিতে/পাকা ছেলে/বেশি কথা/ কয় সে। (মাত্রাবৃত্ত) ৪ + ৪ + ৪ + ৩

৩) এই দেখ/ঢাল নিয়ে/ খাড়া আছি/ আড়ালে, ৪ + ৪ + ৪ + ৩
এইবারে/ টের পাবে /মুণ্ডুটা/বাড়ালে। (মাত্রাবৃত্ত ছন্দ) ৪ + ৪ + ৪ + ৩

৪) রাজার শালা/ চন্দ্রকেতু/তারেই ধ'রে/শেষটা,৪ + ৪ + ৪ + ২

বল্ল রাজা,/ "তুমিই না হয়/ কর না ভাই/ চেষ্টা।" ৪ + ৪ + ৪ + ২
চন্দ্র বলেন,/ "মারতে চাও ত/ডাকাও নাকো/জল্লাদ, ৪ + ৪ + ৪ + ২
গন্ধ শুঁকে/মর্তে হবে/ এ আবার কি/ আহ্লাদ? (স্বরবৃত্ত ছন্দ)
৪ + ৪ + ৪ + ২

৫) বুড়ো বুড়ো ধাড়ি মেঘ/ ঢিপি হয়ে উঠে ৮ + ৬
শুয়ে ব'সে সভা করে/ সারাদিন জুটে। ৮ + ৬ (অক্ষরবৃত্ত ছন্দ), ইত্যাদি।

ঞ) সুকুমার রায় তাঁর বিচিত্র কবিতায় যতিচিহ্ন ব্যবহারেও দারুণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রয়োজনে তিনি সব ধরণের যতিচিহ্ন প্রয়োগ করলেও জিজ্ঞাসা চিহ্ন (?), বিস্ময় বোধক চিহ্ন (!), এবং ড্যাশ (—) একটু বেশি বেশি ব্যবহার করেছেন। তাঁর প্রবন্ধগুলিতে বিচারবুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক মননের ছাপ আমরা লক্ষ্য করি। তাঁর নাটকে আইডিয়ার সংঘাত থাকলেও এর উপভোগ্যতার মূল কারণ হল শাণিত কমিক সংলাপ। আর এই শাণিত কমিক হৃদয়ের ছোঁয়া লেগেছে অন্যান্য কাব্য কবিতার মতো 'আবোল তাবোল' কাবের ৪৫টি কবিতার মধ্যেও। তিনি 'আবোল তাবোল' কাব্যের প্রথম কবিতা আবোল তাবোল, ভালোরে ভালো, কাতুকুতু বুড়ো, গানের গুঁতো, খুড়োর কল, প্যাঁচা আর পাঁচানি, কুম্ড়ো পটাশ, বুড়ীর বাড়ী, একুশে আইন, কি মুস্কিল, ডানপিটে, ভুতুড়ে খেলা, ট্যাঁশ্ গরু, পালোয়ান—এই ১৪টি কবিতায় কোনো জিজ্ঞাসা (?) চিহ্ন ব্যবহার করেননি। এই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবির জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়ের অনন্ত। 'আবোল তাবোল' কাব্যের ৩১টি কবিতাতে তিনি কোথাও না কোথাও এক বা বহুবার প্রশ্ন চিহ্ন (?) প্রয়োগ করে তার উত্তর সন্ধান করে ফিরেছেন চরণ থেকে চরণান্তরে। তাঁর 'বোম্বাগড়ের রাজা' কবিতায় ১৬টি চরণের মধ্যে ১৪ টিতেই জিজ্ঞসা সূচক চিহ্ন ব্যবহার করছেন। এছাড়া অন্য কবিতায় বদ্যি বুড়ো বর্ণনায় পাই—

"সে নাকি রোজ খাবার সময় হাত দিয়ে ভাত মাখে?
শুন্ছি নাকি খিদেও পায় সারাদিন না খেলে?
চক্ষু নাকি আপনি বোজে ঘুমটি তেমন পেলে?
চল্তে গেলে ঠ্যাং নাকি? চোখ দিয়ে সব দেখে?
কান দিয়ে সব শোনে নাকি? চোখ দিয়ে সব দেখে?
শোয় নাকি সে মুণ্ডুটাকে শিয়র পানে দিয়ে?

তাঁর কবিতার এসব জিজ্ঞাসা সূচক বাক্যগুলো একই সঙ্গে রহস্যময়তা ও চিত্রমূলক অর্থনির্মাণের ইঙ্গিতবাহী। এবার আমরা লক্ষ্য করি এই কাব্যেই ৩৮টি কবিতাতেই তিনি কোথাও না কোথাও এক বা বহুবার বিস্ময় সূচক চিহ্ন (!) ব্যবহার করেছেন। যেমন—

"চুপ চুপ্ ঐ শোন্! ঝুপ ঝাপ্ ঝ-পাশ!
চাঁদ বুঝি ডুবে গেল?-গব্ গব্ গবা-স্!
খ্যাঁশ্ খ্যাঁশ্ ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ্ রাত কাটে ঐরে!
দুড়্ দাড়্ চুরমার-ঘুম ভাঙে কই রে!" (শব্দ কল্প দ্রুম)

তিনি 'আবোলে তাবোল' কাব্যের আবোল তাবোল, ভালোরে ভালো, খুড়োর কল, বুড়ীর বাড়ী, ঠিকানা, বিজ্ঞান শিক্ষা, আহ্লাদী, পালোয়ান—এই ৮টি কবিতায় কোনো বিস্ময়বোধক (!) চিহ্ন ব্যবহার করেননি। বিষয় নির্বাচনে ও নির্মাণে একটা বিস্ময়বোধ যে কবিকে তাড়িত করেছে তার প্রমাণ এই বিস্ময় চিহ্ন ব্যবহার। আর এই বিস্ময়বোধ থেকে তাঁর কবি-হৃদয়ে একের পর এক প্রশ্ন জেগেছে। বস্তুতঃ এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়িয়েছেন তিনি সবসময়, সর্বত্র। তাঁর কবিতায় তিনি সচেতনভাবে যথেষ্ট পরিমাণে চরণের শেষে ড্যাশ (—) ব্যবহার করেছেন। এখানে জার্মান কবি শীলারের সেই হীরক-দ্যুতি-ময় বাণীর কথা মনে পড়ে ঃ "The artist is known by what he omits." অর্থাৎ রচনা নৈপুণ্যের সার্থকতা লেখক কতটুকু বলেছেন তাকে নয়; না-বলা বাণীই লেখকের রচনাকে স্বতন্ত্র, সার্থক করে তোলে। এই ধরণের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে তিনি চরণের শেষে ড্যাশ (—) ব্যবহার করেছেন।

সবথেকে বড় কথা হল, লেখককে আলাদা করে চিনিয়ে দেওয়াই যদি শৈলীর ধর্ম হয় তাহলে সেই ধর্ম-রক্ষার দায়িত্ব কবি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন 'আবোল তাবোল' সহ সব লেখায়। তাঁর লেখা পড়ে পাঠক যতটা না জানতে পারেন তার থেকে হাজার গুণ বেশী জানতে পারেন 'না-লেখা বাণী'র ইঙ্গিত থেকে। তিনি 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জীবনের শেষ আট বছর ১৯১৫ থেকে ১৯২৩ সাল। এর মধ্যে শেষ আড়াই বছর রোগ-সজ্জায় কাটলেও এ সময়টিই ছিল তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির গৌরবময় অধ্যায়। একদিকে তিনি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন, অন্যদিকে তাঁর চির চঞ্চল রসিক মন সৃষ্টির আনন্দে মেতেছে। তিনি প্রাণপ্রিয় শিশু-কিশোরদের জন্য একের পর এক অমর কবিতা লিখছেন, সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকছেন এবং সেগুলি ছাপার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সৃষ্টি-পাগল রসিক সুকুমারের প্রথম পুস্তকাকারে 'আবোল তাবোল' প্রকাশিত হয় তাঁর তিরোধানের ৯দিন পরে, অর্থাৎ ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯২৩। তিনি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু সেই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে চির রস-স্রষ্টার মৃত্যুর ছায়া পড়া স্বর্ণ-দ্যুতি-ময় চরণগুচ্ছ আজো আলো বিতরণ করছে। রসিক কবির এমন নির্মম শৈলী বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ ঃ

"আদিম কালের চাঁদিম হিম
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম

ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর
গানের পালা সাঙ্গ মোর।"

তথ্যসূত্র ঃ

১) সমগ্র শিশুসাহিত্য-সুকুমার রায়, (সম্পাদক/সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু)
২) 'শৈলীবিজ্ঞান'—ড. অপূর্বকুমার রায়,
৩) শৈলী চিন্তাচর্চা—ড. বিপ্লব চক্রবর্তী
৪) গদ্যরীতি পদ্যরীতি—ড. পবিত্র সরকার

সুকুমার রায়—চরিত্র বিনির্মাণে অভিনবত্ব

রাণু চক্রবর্তী

শিশুসাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গেই যাঁর নাম সর্বাগ্রে উঠে আসে, তিনি সুকুমার রায়। 'সন্দেশ' পত্রিকার পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রেই তাঁর কবিতা, নাটক ও গদ্য রচনার শুরু। শিশু ও কিশোরমনের উপযোগী সাহিত্যস্রষ্টা হিসাবে তাঁর পরিচিতি থাকলেও 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন গল্প-কবিতায় সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক নানা ঘটনা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির বিষয় হিসাবে এসেছে। এমনকি উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথম দশকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বা প্রয়োজনীয় উপাদানকেও তিনি তাঁর স্বকীয় সাবলীল সর সঙ্গীতে পরিবেশন করেছেন গদ্যরচনাগুলিতে। সাপ্তাহিক 'মন্ডাক্লাবে'র (Monday club) প্রতিষ্ঠাতা সুকুমার রায় তাঁর বাড়িতে সাহিত্যরসিক সমমনস্ক মানুষদের নিয়ে যে সভার আয়োজন করেছিলেন সেখানে বিশ্বের সাহিত্য-রাজনীতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যেমন আলোচনা হোত, তেমনি এই মণ্ডাক্লাবের প্রয়োজনেও বহু কবিতা, নাটক ও গল্প রচনা করেছিলেন তিনি। বিভিন্ন চেনা-অচেনা জীবজন্তু বিষয়ে আগ্রহ তাঁর কবিতার বিষয় হয়েছিল। এমনকি জীবজন্তু নিয়ে অভিনব এবং উদ্ভট কল্পনাও সুকুমার সাহিত্যের মৌলিকতা।

সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোল-এর অনেকগুলো কবিতার বিষয় বিভিন্ন ধরণের জীবজন্তু। এদের নিয়ে কবির অভিনব ভাবনা বা মৌলিকতা লক্ষ্য করা যায় 'খিচুড়ি', 'কুমড়োপটাশ', 'কিম্ভূত', 'হুঁকোমুখো হ্যাংলা' বা 'ট্যাশ গরু'র মত কবিতায়। 'খিচুড়ি'তে হাঁসজারু, বকচ্ছপ, টিয়ামুখো গিরগিটিয়া, বিছা-ছাগল, জিরাফ-ফড়িং, মোরগ-গরু, সিংহরিণ বা হাতিমি-র পরিকল্পনা স্পষ্টতই অভিনব। নিছক শিশুমনের উপযোগী কবিতাটির মধ্যে দিয়ে মানুষের মনের অসন্তুষ্টি যেন জীবজন্তুর মধ্যেও কবি দেখাতে চেয়েছেন। প্রত্যেকেই নিজের রূপ বা বৈশিষ্ট্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও কোথাও যেন অসন্তোষ থেকেই যায়। হাঁক তাই সজারুর কাঁটা ধার করে অথবা বক কচ্ছপের ভেক ধরে। রঙ বদলানো গিরগিটিও টিয়ামুখো হয়ে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের পরিকল্পনা করে। শাকাহারী ছাগলের শরীরেও বিচার বিষ সংশ্লেষিত হয়। হরিণের বাহারী শিং-এর প্রতি আকর্ষণই সিংহের শিরোপা হয়ে ওঠে। 'হাতিমি' রূপী হাতির জঙ্গলের প্রতি আর তিমির জলের প্রতি আকর্ষণ ধাঁধার সৃষ্টি করে।

কবির 'কুমড়োপটাশ'-এর পরিকল্পনাও অভিনব। কুমড়োপটাশের বিভিন্ন কার্যাবলী যেমন, কান্না-হাসি, নাচ, দৌড় এবং ডাকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সকলের আচরণীয়

কাজের বিধান দিয়েছেন কবি। কুমড়োপটাশ নাচতে শুরু করলে কেউ যেন আস্তাবলের কাছে না যায় এবং ডাইনে-বাঁয়ে অথবা পিছনে না তাকিয়ে চার হাত-পা তুলে হট্টমূলের গাছে ঝুলে থাকে। গাছে ঝুলে থাকা এই 'হট্টমূলা'র পরিকল্পনাও কবির নিজস্ব। কুমড়োপটাশ কাঁদতে শুরু করলে বাড়ির ছাদে বসা বারণ। মাচার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁধে লেপ-কম্বল নিয়ে বেহাগ রাগিনীতে 'রাধে কৃষ্ণ রাধে' গাইতে হবে। আবার যদি কুমড়োপটাশের হাসি শুরু হয় তাহলে রান্নাঘরের পাশে এক-পা তুলে দাঁড়িয়ে ঝাপ্সা গলায় ফারসি ভাষাতে ফিসফিস করে কথা বলতে হবে এবং তিনটি বেলা ঘাসের ওপর শুয়ে অনাহারী থাকতে হবে। ছুট ও কুমড়োপটাশকে দেখলে আকাশের দিকে না তাকিয়ে তড়বড় করে জানালা বেয়ে উঠে হুঁকোর জল দিয়ে আলতা গুলে ঠোঁটে এবং গালে লাগাতে হবে। কুমড়োপটাশ ডাকলে শামলা পরিধান করে, গামলায় বসে ছেঁচকি শাকের ঘন্ট বেটে মাথায় মলম হিসাবে মাখতে মাখতে নাকে গরম ঝামা ঘষতে হবে। কবির প্রতিটি অবাস্তব কাজের পরিকল্পনার মধ্যেই রয়েছে হাস্যরস। একইসঙ্গে কাজগুলি সঠিকভাবে না করলে বিপদ ঘটতে পারে এমন আশঙ্কার আভাসও কবি দিয়েছেন। 'কুমড়োপটাশ' নামে অদ্ভুত জীব-যার ডানাযুক্ত স্থূল চেহারার চিত্র-পরিকল্পনা বাংলাসাহিত্যে বিশিষ্টার্থক শব্দবন্ধের জন্ম দিয়েছে।

'কিম্ভূত' কবিতায় কিম্ভূত নামক জীবের পরিকল্পনা করতে গিয়ে কবি তাকে নিজেই কিম্ভুত কিমাকার 'বিদ্‌ঘুটে জীব' আখ্যা দিয়েছেন। খুঁতখুঁতে স্বভাব আর ঘ্যান্-ঘ্যানে আবদার ও নালিশ নিয়ে মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায় এই জন্তুটি। তার চাহিদা একই সঙ্গে কোকিলের মত সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, পাখিদের মত আকাশে উড়ে বেড়ানোর জন্য দুটি ডানা এবং হাতির মত দাঁত আর শুঁড়। ক্যাঙ্গারুর মত লাফিয়ে বেড়াতে চায় সে, কেশরযুক্ত পুরুষ সিংহের মত তেজ আর গোলাপের মত খাঁজকাটা সুন্দর লেজ তার অবদার। অবশেষে বাইশে আষাঢ় প্রাত্যাশা পূরণ হলেও খানিক আহ্লাদের পর নিজের পরিচয় নিয়ে নতুন চিন্তার উদয় হয় তার। মন তোলপাড় করে প্রশ্ন উঠে আসে—

'নই ঘোড়া, নই হাতি, নই সাপ কিছু,
মৌমাছি প্রজাপতি নই আমি কিছু।
মাছ ব্যাং গাছপাতা জল মাটি ঢেউ নই,
নই জুতো নই ছাতা আমি তবে কেউ নই'।

পৃথিবীর জড়-জীব প্রত্যেকেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, তাদের নির্দিষ্ট একটা নাম থাকে। প্রতিটি জীবেরই কিছু ভালো ও কিছু খারাপ গুণও থাকে। যদি চাহিদা মত সকল জীবের সকল ভালো গুণ একত্র করে কোনো জীবের পরিকল্পনা করা হয়, তবে তা যেমন বাস্তবসম্মত হয় না, তেমনই তা কিম্ভূত কিমাকার প্রাণীর রূপ নেয়। কবিতার

নিছক হাস্যরসের মধ্যেও সূক্ষ্মভাবে এই গভীর বক্তব্যটি লক্ষ্য করা যায়।

'হুঁকোমুখো হ্যাংলা' কবিতায় হুঁকোমুখোর কল্পনায় কবির মৌলিকত্ব লক্ষ্য করা যায়। মানুষের মত কথা বলা, থপ-থপে পায়ে নেচে-নেচে গান গাইতে অভ্যস্ত হুঁকো মুখোর চিন্তার বিস্তার। সে সারাদিন শুধু মাছি মারার ফন্দি ভাবে। তার দুটি লেজ আছে। ডান দিকের লেজে মাছি বসলে বাম-লেজ আর বাম দিকের লেজে মাছি বসলে ডান লেজ ব্যবহার করে সে। কিন্তু সংকট বাধে যখন কোনো দুষ্টু মাছি দুটি লেজের মাঝামাঝি বসে তাকে বিপদে ফেলে। কারণ, দুটি ল্যাজের কোনোটি দিয়েই সেটা সে তাড়াতে পারে না। হুঁকোমুখো হ্যাংলা নামক জীবটি কিছুটা রূপকথার আদলে গড়া। রূপকথার ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর মত হুঁকোমুখো হ্যাংলাও মানুষের মত কথা বলে, গান করে, নাচ করে আবার গভীর চিন্তাও করতে পারে সে। কখনো আহ্লাদে গদ-গদ হয়ে ওঠে আবার কঠিন সমস্যায় পড়লে মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। এরকম একটা জীবের কল্পনা বাংলা সাহিত্যে অভিনব।

'রামগরুড়ের ছানা'—ও সুকুমার রায়ের কাল্পনিক সৃষ্টি। সে সর্বদাই ত্রস্ত হয়ে থাকে হাসির ভয়ে। আনন্দের স্ফূরণ কখনোই তাকে স্পর্শ করতে পারে না। এহেন রামগরুড়ের ছানার বাড়িটিও 'ধমক দিয়ে ঠাসা', হাসির হাওয়া সেখানে প্রবেশের পথ পায়না। রামগরুড়ের ছানাকে প্রতীকী চরিত্র হিসাবেও কল্পনা করা যায়। কবিতাটি কিশোর মনের অনুকূল হলেও কবি যেন 'রামগরুড়ের ছানা'র মধ্যে দিয়ে অচলায়তনিক মানুষকে এবং তাদের তৈরি বিধি নিষেধকে আঘাত করতে চেয়েছেন।

সুকুমার রায়ের 'ট্যাশগরু'ও একটি আজব জীব। কবিরকল্পনায় ট্যাশ গরু আদতে গরু নয়—সে পাখি। ঢুলুঢুলু চোখ, মস্ত বড় মুখের ট্যাশগরু টেরিকাটা কালো চুল নিয়ে হারুদের অফিসে বসে থাকে। তিনটি বাঁকা শিং, প্যাঁচানো লেজ আর লট্‌খটে হাড়গোড় বিশিষ্ট ট্যাঁশগরুকে ধমক দিলেই 'ল্যাগ্‌ব্যাগ' করে চমকে সে পড়ে যায়। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালে খাবি খায়। নিজের খেয়ালে কখনো সে কাঁদে আবার কখনো রেগে তেড়েও ওঠে। মাঝে মাঝেই দাঁতে-দাঁত লেগে ট্যাঁশগরু কুপোকাত হয়ে পড়ে। এহেন ট্যাশগরুর খাদ্য শুধুই সাবানের সুপ আর মোবাতি। বিবিধ বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ট্যাশগরু নামক পাখি কিনতে আগ্রহী ক্রেতার সন্ধান করেছেন কবি। কেউ যদি শখ করে এই আজব পাখিটি কিনতে আগ্রহী হন, কবি তাকে সস্তায় সেটি দিয়ে দিতে চান।

'আবোল-তাবোল'-এর কবিতাগুলোতে যেমন কবিমনের আবোল-তাবোল ভাবনা কিছু আজব কাল্পনিক জীবের সৃষ্টি করেছে, তেমনি সুকুমার রায়ের গদ্যগ্রন্থের মধ্যে 'হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরী'তে অনেকগুলি অভিনব জীবের কল্পনা করেছেন। এই চরিত্রগুলির সৃষ্টিতে লেখকের বৈজ্ঞানিক ভাবনা সক্রিয়। বিশ শতকের প্রথম দশকে

লেখা আর্থার কোনান ডয়েলের 'The lost world'-এর অনুপ্রেরণায় সুকুমার রায় এই ডায়েরীটি রচনা করেছিলেন। 'The Lost world"-এর Prof. Challenger-এর অনুরূপ চরিত্র এখানে অধ্যাপক হেসোরাম। আফ্রিকার গহন আমাজনের জঙ্গল সুকুমার রায়ের কল্পনায় কারাকোরামের বন্দাকুশ পাহাড়।

বন্দাকুশ পাহাড়ের একুশ মাইল উত্তরে প্রথম যে আজব প্রাণীটির সাক্ষাৎ হোসোরাম এবং তার দলবল পেয়েছিলেন, সেটির চেহারা হাতির চেয়েও বড়। এই জন্তুটি মানুষের মত হাসে। একসঙ্গে পঁচিশ-ত্রিশটা বেলের মত লাল বুনো ফল এবং এক গ্রাসে একখানা আস্ত পাঁউরুটি, আধসের গুড়, পাঁচ-সাতটি খোলা-সুদ্ধ সিদ্ধ ডিম খেয়ে ফেলতে পারে। অভিনব এই জন্তুটির প্রকাণ্ড ক্ষিদের জন্য এর নাম দিয়েছিলেন 'হ্যাংলাথেরিয়াম'।

এরপর প্রফেসর হেসোরাম তাঁর শিকারী দল নিয়ে জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে যে বিচিত্র জন্তুটির সাক্ষাৎ পেলেন, তার স্বভাব অত্যন্ত খিটখিটে। খুঁতখুঁতে গোমরা মেজাজের এই জন্তুটি জগৎ সংসারের সব কিছুর প্রতিই বিরুক্ত। খাবার দিয়ে মনোরঞ্জনের চেষ্টা করলেও খানিকটা খাবার খেয়ে বাকীটা সে রেগে সারা শরীরে মাখিয়ে পিছন ফিরে মাটিতে মাথা ঠুকতে শুরু করে। এরকম বিচিত্র স্বভাবের গোমরামুখো খিট্‌খিটে জন্তুটির নাম 'হ্যাংলাথেরিয়ামে'র সঙ্গে মিলিয়ে 'গোমরাথেরিয়াম' দিয়েছেন।

বন্দাকুশের পঁচিশ মাইল উত্তরে প্রফেসর হেসোরাম আরেকটি আজব-জীব আবিষ্কার করলেন। উটপাখির মতন বড় চেহারা বিশিষ্ট পাখিটির ডান ও বাম পায়ে সামঞ্জস্যের অভাবে ঠিক মতো চলতে পারে না, হোঁচট-খেয়ে পড়ে। ল্যাগব্যাগে প্রকৃতির পাখিটির নামকরণ করেছেন 'ল্যাগব্যাগর্নিস'। পায়ে কাঁটা-বিদ্ধ আরেকটি আহত জন্তুর নাম তাঁরা দিয়েছিলেন 'ল্যাংড়াথেরিয়াম'।

কুমির-সাপ-মাছের মিশ্র আদলে গড়া, একহাত সমান হ্যাঁ বিশিষ্ট 'চিল্লানোসোরাম' এবং তার সামনে ছোট নিরীহ গোছের একটি জানোয়ার 'বেচারাথেরিয়াম'কে তাঁরা আবিষ্কার করলেন। তিমি মাছের মত বড় পাহাড়ের গায়ে বাদুড়ের মত ঝুলে থাকা অসম্ভব বিট্‌কেল গন্ধের আরেকটি জীবের বর্ণনাও হেসোরাম দিয়েছেন।

হেসোরামের ডায়েরীতে বিচিত্র সব জীবের বর্ণনায় সুকুমার রায়ের কাল্পনিকতা এবং বিজ্ঞান-মনস্কতা লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকটি জীবের নামকরণ করেছেন জন্তুগুলির চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে বাংলা ও ল্যাটিন শব্দের মিশ্রণে সংকর প্রকৃতির। যেমন—হ্যাংলাথেরিয়াম, গোমরাথেরিয়াম, ল্যাগব্যাগর্নিস। নামগুলির মধ্যেও একধরণের ছন্দোগত মিলও লক্ষ্য করা যায়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এডওয়ার্ড লীয়ার (1812-1888) এবং লুইস ক্যারল (1832-1898) Nonsense Literature নিয়ে সাহিত্যের একটি নতুন ধারার সূচনা করেছিলেন। সুকুমার রায়ের কিছুটা পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রেই শিশুসাহিত্যের প্রতি আগ্রহ বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। এডওয়ার্ড লীয়ার এবং লুইস ক্যারলকে তিনি নিজস্ব ভালোলাগার স্টাইলে রূপ দেন 'আবোল-তাবোল'-এর কবিতাগুলির মধ্যে। এ প্রসঙ্গে Ruskin Bond লিখেছেন—"....the Bengali language lends itself to rhyme and rhythem, puns and word-play. What Edward Lear and Lewis carrolldid with English, Roy could do with Bengali." (Bond, 'Wordygurdyboom!' ppxii) Nonsense Literature-এর বৈশিষ্ট্যই হোল চেনা জগতের প্রথাবদ্ধ নিয়মশৃঙ্খল বা কার্যকারণ সূত্রের বাইরে গিয়ে অন্যরকম কোনো ভাবনা বা কল্পনা অথবা ইচ্ছাকে রূপ দেওয়া। Michael Heyman তাঁর 'The Tenth Rase' তে সুকুমার রায়ের রচনা সম্পর্কে বলেছেন, "This book was conceived in the spirit of whimsy. It is not meant for those who do not enjoy that spirit" (Heyman, 'The Tenth Rasa', PP.XI) আর এই ' Sprit of whimsy'-র সূত্রেই সুকুমার রায়ের হাঁসজারু, বকচ্ছপ, রামগরুড়ের ছানা, গোমরাথেরিয়াম বা 'চিল্লানোসোরাস'-এর মত আজব জীবের অভিনব পরিকল্পনা।।

গ্রন্থঋণ ঃ

১। সুকুমার সমগ্র/ অনীশ দেব সম্পাদিত, ২০০৮

২। সুকুমার সাহিত্য সমগ্র, পার্থ বসু ও সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত ভূমিকা

৩। Early Bengali Science Fiction, Amardeep singn, Lehigh. edu. May, 07,2006

৪। Sukumar Roy : Master of Science and Nonsense -Zinia Mitra ISSN 1563-8685

সুকুমার রায়ের নাট্যপ্রকরণ

পবিত্র সরকার

"বড়দার কলেজ জীবনের আরো গল্প শুনতাম। তখন থেকেই মজার মজার নাটক লেখেন। শুধু লেখেন না, বাড়ির ছেলেদের আর আত্মীয়-স্বজন নিকটবন্ধুদের শিখিয়ে পড়িয়ে নাটক মঞ্চস্থ না হলেও মেঝেস্থ হয়। না বলে বিছানার চাদর দিয়ে যবনিকা হয়, গোটা ধোপার পঁটুলি উধাও হয়—তা হবে না? পুঁটলিতে ডালপালা জড়িয়ে উৎকৃষ্ট গন্ধমাদন তৈরি হয়। মুশকিল হত জটাজুট দাড়িগোঁপ নিয়ে। তা, ওদের অভিনয় দেখে খুশি হয়ে জ্যাঠাইমা ওদের কতিপয় দাঁড়ি-গোঁপ ইত্যাদি কেনবার পয়সা দিয়েছিলেন। একটা রবিবার দুপুরে আর লোভ সামলাতে না পেরে বড়দা গেরুয়া বসনের সঙ্গে জটাজুট দাঁড়ি-গোঁপ পরে দিব্যি পুরুষ্টু মুনিঠাকুর সেজে গ্রে ষ্ট্রিটে ড. সুন্দরীমোহন দাশের বাড়ি হাজির হলেন। তাঁর ছেলের সঙ্গে বড়দার বড়ই ভাব। তার ঘর খিড়কির দোরের পাশেই। এই দরজায় একটু ধাক্কা দিলেই সে খুলে দেবে। ভারি মজা হবে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। দুঃখের বিষয়, বন্ধু দরজা না খুলে তার মা দরজা খুলেই দেখেন সৌম্যদর্শন জটাজূটধারী এক মুনিঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন। মুনি-ঋষিতে মায়ের বড় ভক্তি।

সঙ্গে সঙ্গে নকল মুনির-দুপায়ের বুড়ো আঙুলে কপাল ঠেকিয়ে ঢিপ করে এক প্রণাম আর যাবে কোথায়, কোথায় আশীর্বাদ করবেন, না মুনিঠাকুর পত্রপাঠ পিছন ফিরে দে ছুট! মায়ের আর্তনাদ শুনে বেরিয়ে এসে বন্ধুর বুঝতে বোধ হয় এক মিনিটও দেরি হয়নি। আশাকরি মাকে কিছু বলে আর লজ্জা দেয়নি সে।"

"একটা রবিবার বৌঠানের আত্মীয় অবিনাশ সেন শিলং-এর বিখ্যাত পরী তলায় সারাদিব্যাপী চড়িভাতির আয়োজন করেছিলেন। বড়দা তাঁর শব্দকল্পদ্রুম নাটকটি পড়লেন।...'পড়লেন বললে কম বলা হয়। বলা উচিত, শব্দকল্পদ্রুম করলেন। নিজেই সব চরিত্র হয়ে গেলেন। কথায় বলে রাম সাজল, রাবণ সাজল। বড়দা কিছু সাজতেন না, ঐ চরিত্রই হয়ে যেতেন। সাজার কৃত্রিমতা তাতে একবিন্দু থাকত না; সাজসজ্জার বালাই তো ছিলই না।..... সাজতেন না, হয়ে যেতেন। নিজের আমিত্ব থেকে বেরিয়ে তার ব্যক্তিত্ব ধারণ করতেন।'

বড়দা অন্যের লেখা নাটক করাতেন না। নিজে লিখতেন নিজে অভিনেতা বেছে নিতেন, নিজে শেখাতেন অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন, অন্যরা সাহায্য করত। নিজে নায়ক হতেন না। সবচেয়ে হাঁদা গঙ্গারামের ভূমিকায় সবচেয়ে ভালো অভিনয়

দেখাতেন। নাটকে যে একটিও স্ত্রীচরিত্র থাকত না সেটা বিশেষ লক্ষণীয়। আমি তাঁদের একটাও নাটক দেখিনি। না সেই বিখ্যাত নন্‌সেন্স ক্লাবের না মণ্ডে ক্লাবের। গোড়ায় কলকাতায় ছিলাম না; পরে বয়সে ও মানে এতই নগন্য ছিলাম যে কেউ ডাকতও না। এই আমার বড় দুঃখ। ওঁদের নাটক না দেখলেও, বড়দার হাতে শিখিত-পড়িত আমার ছোট জ্যাঠামশাই কুলদারঞ্জনের মেয়েকে একবার শিলং-এ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে মনীষা চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে লক্ষ্মীর পরীক্ষা নাটিকায় ক্ষিরে ঝি হতে দেখেছিলাম। ১৬/১৭ বছর বয়সের সুন্দরী বুলুদিদি, তাকে স্রেফ ক্ষিরো-ঝিতে পরিণত হতে দেখেছিলাম। দর্শকদের তাক লেগে গেছিল। এমন উঁচু মানের অভিনয় ওখানে কেউ দেখেনি।"

"তাঁর মৃত্যুর অল্পদিন আগে। চার মাসের মতো; সুকুমারের প্রয়াণ ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩; সত্যজিতের জন্ম ২ মে, ১৯২১-প.স.। মানিকের দু বছরের জন্মদিন করা হলো। বাড়িসুদ্ধ সকলে মিলে স্নেহে আনন্দে দিনটিকে ভরে রেখেছিল। এখন বুঝি, আসন্ন দুঃখের জন্য এও একরকম মনকে তৈরি করা। দোতলায় বসবার ঘরের একপাশে ইজি চেয়ারে বড়দা বসেছিলেন। শ্বেতপাথরে বাঁধানো মেঝের উপর ফরাস পেতে আমরা সবাই বসেছিলাম। শুনলাম রহস্যনাটিকা হবে। সামনে মাটি অবধি ঝোলা চাদরে ঢাকা একটা বড় মতো টেবিল হলো মঞ্চ। মঞ্চের পাশে ও পিছনে পরদা টানানো। নাটক শুরু হলো। সেই পরদা ফাঁক করে অদ্ভুত মোটা বেঁটে একটা কোট-প্যান্ট পরা লোক দেখা দিল। মাথায় সায়েবি হ্যাট। হাতে লাঠি। লাঠি ঠুকে, তালে তালে পা ঠুকে সে একটা দুর্বোধ্য গান গাইল। যদ্দুর মনে পড়ে এই ধরনের কথা সেরামাসান্ডেলতা কাজেরে মন্ডেলতা রামরামরাম। বাকিটা মনে নেই। ঐ গান আর ঐ বদখত চেহারা দেখে সকলে হেস খুন। তখন লোকটি বলল, হাসবেন না, এ বড় করুণ ব্যাপার। ছোটবেলায় বড় বেশি কৌতুহলের কারণে মস্ত একটা ট্র্যাংকে ঢুকেছিলাম। অমনি দুম্ করে ঢাকনি পড়ে গেল। খট করে চাবি লেগে গেল। কেউ বাক্স খুলতে পারল না। দশ বছর বন্দী ছিলাম। ঢাকনিতে ছ্যাঁদা করে খাবারদাবার দেওয়া হত। চওড়ায় বাড়লাম, লম্বায় বাড়লাম না। তাই আজ আমার এই দশা। পরে বাক্সটা নিজেই ভেঙে গেল, তবে আমি বেরুতে পারলাম। সকলে হেসে বাঁচে না। কিন্তু লোকটা কে? নাটক শেষ হলে সে দুটো লোক হয়ে গেল। মণিদার (সুবিনয় রায়—প. স.) হ্যাট দাড়ি-গোঁপ পরা মাথা, প্যান্ট জুতো মোজা পরা হাত, পিছন থেকে আরেকজনের দুটো হাত। সবটার ওপর দিয়ে মস্ত এক কোট পরা। গড়পারের বাড়িতে ঐ আমাদের শেষ হাসির পালা।

উপরে আমরা একটু বিস্তৃতভাবেই শ্রীমতী লীলা মজুমদারের একটি লেখার তিনটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছি। আমাদের উদ্দেশ্য, নাটক সম্বন্ধে সুকুমারের বিশেষ

প্রীতিটি আলাদা করে দেখিয়ে দেওয়া। রবীন্দ্রনাথের মতোই, সুকুমারও নাটককে নিছক বিনোদন মনে করতেন না। তাঁরও কাছে নাটক ছিল জীবনচর্যার একটি জরুরি অংশ। এ প্রসঙ্গে আরো কিছু স্মৃতিচারণ থেকে কিছু সংবাদ বেরিয়ে আসে, যেমন মাধুরীলতা মহলানবীশের এই কথাগুলিতে।

"আমরা তখন খুব ছোটবেলায় দেখতাম সকালবেলায় এক মেমসাহেব আসতেন। সেই মেম পিয়ানো বাজনা শেখাতেন, গান শেখাতেন। দাদা বলতেন 'ওসব আমার ভালো লাগে না। ছবি আঁকো, গান করো, এটা করো, সেটা করো। যত সব ড্রয়িংরুম অ্যাকমপ্লিশমেন্ট। আমরা বরং সন্ধ্যাবেলা নাটক করব।'

তা সন্ধ্যেবেলার সেই নাটক সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়ির উপর প্রকাণ্ড হল ঘরে খুব জমত। সব জ্যাঠতুতো খুড়তুতো ভাইবোনেরা আসতেন, হিতেন বোস আশান বোস শৈলজারঞ্জন হৈমজারঞ্জন। ময়না মালতী আমরা সব ছোট ছোট গুড়ি মেয়েরা বসে, আর সবাই দাঁড়িয়ে। প্রকাণ্ড এক বিছানার চাদর মুড়ি দিয়ে আঠেরোজন দাঁড়ালেন। দাদা বললেন সুরু স্তোত্র পড়।

স্বর্গে যাবার মন্ত্র পড়। অমনি তালে তালে বলা হলো

হলদে সবুজ ওরাং ওটাং
ইটপাটকেল চিৎপটাং।
গন্ধগোকুল হিজিবিজ
নো অ্যাডমিশন ভেরি বিজি
নন্দী ভৃঙ্গী সারেগামা
নেই মামা, তাই কানা মামা
মুশকিল আশান উড়ে মালি
ধর্মতলায় কর্মখালি
চিনেবাদাম সর্দিকাশি
ব্লটিংপেপার বাঘে মাসি।

হঠাৎ সেই চাদরের মধ্যে থেকে দাদা বলে উঠলেন, 'এই রে উলটোদিকে নেমে যাচ্ছি। স্বর্গে যাচ্ছি না নেমে যাচ্ছি পাতালে। ভুল হল। ভুল মন্ত্র। আরেকটা পড়। তখন আবার,

ভাব এক্কে ভাব, ভাব দুগুণে ধোঁয়া,
তিন ভাবে ডিসপেপশিয়া-ঢেকুর উঠবে চোঁয়া
চার ভাবের চতুর্ভুজ ভাবের গাছে চড়—
পাঁচ ভাবে পঞ্চত্ব পাও, গাছের থেকে পড়। ইত্যাদি।

তারপর এ ওর ঘাড়ে গুঁতো দিয়ে ধাক্কা লাগিয়ে সব গড়াগড়ি যেতে লাগলেন। আমাদের খুব মজা লাগত।

পুণ্যলতা চক্রবর্তীর সাক্ষ্য উদ্ধার করেছেন সাহিত্য সমগ্র'-এর সম্পাদক দ্বয়—"বাবার লেখা 'কেনারাম ও বেচারাম বলে একটা হাসির নাটক 'মুকুল' পত্রিকায় বেরিয়েছিল, ভাইদের নিয়ে সেটা অভিনয় করে সবাইকে। [দাদা] খুব আনন্দ দিল।.... সেই থেকে ভাইবোনদের জন্মদিনের উৎসবগুলো দাদার হাসির গান ও অভিনয়ে জমকালো হয়ে উঠল। এতদিন ছোটদের জন্য যেসব নাটক ও গল্প বইয়ে কিংবা পত্রিকায় বোরোত, তাই নিয়ে অভিনয় হত এবার দাদা নিজেই হাসির নাটক লিখতে আরম্ভ করল।" কিংবা শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মরণ—

"আমাদের ছোটবেলা কেটেছে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে। সেখানে 'বিচিত্রা' ক্লাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে সুকুমার রায় কখনও কখনও আসতেন, যেভাবে আসতেন আরও বহু নামকরা কবি সাহিত্যিক। সেখানে নানা সাহিত্য আলোচনা অভিনয় ও পাঠ হত।

সেখানেই একবার সুকুমারবাবুর অসামান্য অভিনয় ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। রবীন্দ্রনাথের বৈকুণ্ঠের খাতা নাটকে তিনি কেদারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। সুকুমার রায়ের কবিত্ব ও সাহিত্যগুণের কথা কারও অজানা নয়, তবে তাঁর অভিনয়ের কথা অনেকেই জানেন না। নাটকটি যখন দেখি তখন আমি তাঁকে সুকুমার রায় বলে জানতুমই না। তবু কেদারের চরিত্রে তাঁর সেই অভিনয় দৃশ্যটি আজও আমার মনে উজ্জ্বলভাবে গেঁথে আছে।

দৃশ্যটি এইরকম ঃ বৈকুণ্ঠবাবুর ঘরে ঝাপসা আলো-আঁধারির মধ্যে কেদার পা টিপে টিপে ঢুকে কুলুঙ্গির উপর থেকে কাঠের পাটা বাঁধা বিরাট স্বরসূত্রসার পুঁথিটি চুরি করে, বগলদাবা করে চুপি চুপি কেটে পড়ছেন। মাত্র কয়েক মিনিটের চুরির এই বিশেষ দৃশ্যে একটু হৃষ্টপুষ্ট চাদর গায়ে সুকুমার রায়কে আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। রবীন্দ্রনাথের মূল রচনায় এই দৃশ্যটির বর্ণনা নেই, তবু সেবারে নাটকে এটি ঢোকানো হয়েছিল।' এই অভিনয়ের সীতা দেবীর স্মরণে ছিল সুকুমারের বিকট মুখভঙ্গি।"

অন্যান্য বিভিন্ন সূত্র থেকেও এ সম্বন্ধে টুকরো সব তথ্য আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়—১৯১১-তে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশতম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে সুকুমার তাঁর 'অদ্ভুত রামায়ণ' (আসলে লক্ষ্মণের শক্তিশেল—প. স) গান করে শোনান, বিদেশ থেকে ফিরেই গিরিডিতে পূর্ণিমা সম্মিলন উপলক্ষ্যে লক্ষ্মণের শক্তিশেল' ও 'ভাবুকদাদা' (ভাবুকসভা হবে —প.স.) "প্লে" করেন, ১. কলেজের পর প্রশান্ত মহলানবীশের ঘরে এসে সুকুমার রায়, কালিদাস নাগ ও প্রশান্তচন্দ্র মিলে 'অচলায়তন'

পাঠ করছেন ১৭ আগষ্ট ১৯১৭ তারিখে ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সমস্ত থেকেই বুঝতে পারি নাটক সম্বন্ধে বর্ষীয়ান ব্রাহ্ম অভিভাবক হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের ধরনে কোনো অস্পৃশ্যতার বোধ সুকুমারের ছিল না, জানি না এই নাটক ও নাট্যানুরাগ তৎকালীন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রজন্ম প্রভেদের আরেকটি কারণ বা লক্ষণ ছিল কি না। যাই হোক, সুকুমার তার ছত্রিশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে এবং সংক্ষিপ্ততর লেখকের আয়ুষ্কালে নিজেকে বন্ধুপরিজনদের এবং বাঙালির সংস্কৃতিকে যে ছোটবড় আটটি উজ্জ্বল সরস নাট্যখণ্ড উপহার দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন এ থেকে তাঁর নাট্যপ্রীতি ও জীবনকে নাট্যকৌতুকে ঋদ্ধ করে তোলার আকাঙ্ক্ষাটি স্পষ্ট হয়।

তবু তুলনায় তাঁর নাট্যরচনার পরিমাণ এমন কিছু বেশি নয় একটা মোটামুটি হিসেব নিয়ে দেখি সমগ্র শিশু সাহিত্যে মোট ১৫৯ পৃষ্ঠার মধ্যে তাঁর নাট্যরচনা মুদ্রিত হয়েছে মাত্র সাড়ে বাইশ পৃষ্ঠার মতো—অর্থাৎ মোট রচনার সাত ভাগের একভাগের তাঁর মতো। নাট্য রচনা, কালের দিক থেকে অনেক বেশি ব্যাপ্ত হলেও তা যে একটি নিরবচ্ছিন্ন এবং নিয়মিত পরম্পরা ধরে এগোয়নি, তাও আমরা লক্ষ্য করি। লুপ্ত 'রামধন বধ'কে (১৯০৫) আমরা হিসেবের মধ্যে ধরছি না। লক্ষ্মণের শক্তিশেল সাহিত্য সমগ্র'-এর সম্পাদকদ্বয় ১৯১১ তে রচিত বলে নির্দেশ করেছেন, ঝালা পালা-ও রচিত ওই একই বছরে, হয়তো একটু পরে। পুলক চন্দ, পুণ্যলতা চক্রবর্তী, লীলা মজুমদার প্রভৃতির সাক্ষ্য থেকে রচনাকাল সংক্রান্ত সংশয়টিকে স্পষ্ট করেছেন, এঁদের প্রথমজনের মতে সে সময় ১৯০৭, দ্বিতীয়জনের মতে এ নাটক সুকুমারের "বছর কুড়ি বয়সে লেখা" 'ভাবুক-সভ্য'-র রচনাকাল ১৯১১-১২।

তার পরে, অন্তত তিন বছরের দূরত্বে রচিত হয় পরের নাটক—শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম', পাণ্ডুলিপিতে পরিষ্কার ১৯১৫ তারিখ দেওয়া আছে। 'চলচিত্তচঞ্চরি' সমগ্র শিশুসাহিত্য-এর সম্পাদকদ্বয় শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম-এর 'সমকালীন' বলে নির্দেশ করেছেন। কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় এক স্মারক রচনায় জানিয়েছিলেন তিনি ১৯১১তেই 'চলচিত্তচঞ্চরি'র অভিনয় দেখেছেন, কিন্তু পুলক চন্দ সম্পাদকদ্বয়ের তারিখকেই সমর্থন করেছেন। বিষ্ণুবসু যুক্তিঋদ্ধ আলোচনার দ্বারা অনুমান করেছেন, নাটকটি ১৯১৭ থেকে ১৯২১ এর মধ্যে রচিত হওয়াই সম্ভব। 'অবাক জলপান' প্রকাশিত হয় তারও পাঁচ বছর পরে, ১৯২০তে। ১৩২৭ বাংলা সনের সন্দেশ-এ জৈষ্ঠে বেরোয় 'অবাক জলপান', ভাদ্রে 'হিংসুটি' এবং চৈত্রে ক্ষুদ্রকায় 'মামা গো!' মনে হয় এই সময় ছোটদের নাটক সম্বন্ধে সুকুমার নতুন করে ভাবতে শুরু করেছিলেন, বিশেষত ছোটদের নাটক রচনায় আর একটু ব্যগ্রতা এসেছিল তাঁর। কিন্তু আসন্ন মৃত্যুর রুগ্‌ণ ছায়া এর মধ্যেই তাঁর দিকে হাত বাড়িয়েছে, ফলে ১৯২০র পর অন্যান্য রচনা প্রচুর লিখলেও নাটক আর লিখলেন না তিনি।

সত্যজিৎ রায় আমাদের জানান, লেখা ও আঁকার দিক থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তির প্রায় সবই সুকুমারের শেষ আড়াই বছরের শস্য। দুর্ভাগ্যের বিষয়—এই শস্যের মধ্যে নাট্যরচনা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এমন কী 'শ্রীশ্রীবর্ণমালাতত্ত্ব' নাম অনুপ্রাসরঞ্জিত শব্দক্রীড়াময় কবিতার দিকেও অসুস্থ অবস্থায় বারবার তিনি ফিরে যান, কিন্তু নাটক আর তাঁর মনোযোগ পায় না। সে কি আর সক্রিয়ভাবে অভিনয় বা প্রয়োজন করতে পারবেন না বলেই। পূণ্যলতা চক্রবর্তী যদিও আমাদের অতীত ননসেন্স ক্লাব পর্বের খবর দেন এইভাবে যে, 'দাদা নাটক লিখত অভিনয় শিখত, তার প্রধান পার্টটা সাধারণত সে নিজেই নিত'। একেবারে শেষ দুটি ক্ষুদ্র নাট্যরচনায়—'হিংসুটি' আর 'মামা গো'-তে তাঁর প্রধান পার্ট নেবার প্রশ্নই ছিল না।

১৯১৫ থেকে ১৯২৩ এ মৃত্যু পর্যন্ত আট বছর তাঁর কবিতা, কল্প ও নিবন্ধমালা যেমন অনর্গল অবিরত অব্যাহতভাবে রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে নাটক সেভাবে হয়নি। নাটকের রচনা ও প্রকাশনা যতিব্যাহত। তার একটা বড় কারণ এই ছিল যে, তাঁর নাট্যরচনা কোনো না কোনো উপলক্ষ্যের অপেক্ষায় থাকত, তার মধ্যে খুব কম রচনাই। (হয়তো শেষের তিনটি ছাড়া) অযাচিতভাবে তাঁর কলমে এসে হাজির হয়েছে। এক্ষেত্রে অনেকেরই প্রামাণিক সাক্ষ্য পাই আমরা। ১৯০৬-৭-এ ননসেন্স ক্লাবের প্রতিষ্ঠা, তার একটি কৃত্য সম্বন্ধে প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন—'এই ক্লাবের সদস্যগণ যে অভিনয় করিতেন তাহা আত্মীয়স্বজনের সম্মুখে অভিনীত হইত। 'ঝালাপালা', 'অবাক জলপান', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'চলচিত্তচঞ্চরি'ও 'শ্রীশঙ্করকল্পদ্রুম'ও (ক্ষেত্রে আমাদের সংশয়—শেষ নাটক তো ননসেন্স ক্লাব পর্বে রচিতই হয়নি—প.স.) অভিনয়ার্থে সুকুমার রচনা করেন।.....এগুলি ব্যতীত এই ক্লাবের সদস্য সুকুমারের পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায় রচিত ও 'সখা ও সাথী' নামক (পূণ্যলতা চক্রবর্তীর সাক্ষ্যে 'মুকুল' পত্রিকায়—প.স.) পত্রিকায় প্রকাশিত 'কেনারাম ও বেচারাম' অভিনয় আরম্ভ করেন। সেই অভিনয় দর্শকদের খুব মনোরঞ্জক হওয়াতে সুকুমার ক্লাবের জন্য নূতন নাটক রচনায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়া এগুলি রচনা করেন। লেখার পর অভিনয়ের পূর্বে ক্লাবের মাসিক পত্রিকা 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'য় এগুলি প্রকাশিত হয়। 'ঝালাপালা' ননসেন্স ক্লাবের জন্য রচিত হয়েছিল তার প্রমাণ তার পাণ্ডুলিপিতে বর্তমান, সেটি প্রথমেই 'ননসেন্স ক্লাবের টাট্‌কা নূতন পালা' হিসেবে আখ্যাত।' বস্তুতপক্ষে 'সমগ্র শিশুসাহিত্য'-এর সম্পাদকদ্বয়-এর গ্রন্থপরিচয় আমাদের পুণ্যলতা চক্রবর্তীর সাক্ষ্যের সমর্থনে জানান এর (১৯০৫ এ 'রামধন-বধ' নাটক রচনার —প. স.) পরে সুকুমারের ভাইবন্ধুদের অভিনয়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত হল ননসেন্স ক্লাব।' অর্থাৎ এ ক্লাবটিই মূলত ছিল অভিনয়কেন্দ্রিক, ১৯১৫-র পরবর্তী মনডে ক্লাব সেদিক

থেকে ছিল লঘুগুরু আলোচনা ও স্বাদুআহার্য আস্বাদনকেন্দ্রিক।

এই উপলক্ষ্যমুখিতা এবং সেই কারণেই বিরতিযুক্ত রচনাবৃত্তান্ত থেকে আমাদের মনে হয়, ছোটদের জন্য ছড়া, কবিতা এমনকী প্রবন্ধ রচনায় সুকুমারের যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রণোদন ছিল নাটক রচনার ক্ষেত্রে তা সে পরিমাণে ছিল না। এসব রচনার উদ্দেশ্য ও চরিত্র প্রকাশ্যতই আলাদা—ছড়া-কবিতায় তাঁর রসোচ্ছল চিত্তের লীলাভঙ্গিময় আত্মপ্রকাশই মুখ্য হয়ে ওঠে, আবার জীবজগৎ ও বিজ্ঞানের নানা প্রসঙ্গে সরস তথ্য ও সংবাদের পরিবেশন এবং 'সন্দেশ'-এর সম্পাদকীয় দায়িত্ববোধ প্রাধান্য পায়, দুটিতেই বাঙালি শিশুদের সুহৃদ ও শিক্ষক হিসেবে নিজের একটি ভূমিকা তিনি নির্বাচন করেন। ছড়া, গল্প সরস সংবাদ-নিবন্ধের স্রষ্টা তবু ব্যক্তি সুকুমার যিনি নিঃসঙ্গ স্রষ্টা, নিজের ভিতরকার প্রসন্ন স্নেহশীলতার আজ্ঞাবাহী। আর প্রাথমিক তুলনাতেই ধরা পড়ে, নাটকগুলির রচয়িতা এক অন্য সুকুমার—ইনি সামাজিক বা পারিবারিক সুকুমার যিনি ভাইবোন বন্ধুস্বজনের নানা আনুষ্ঠানিক বা সামাজিক সমাবেশকে আনন্দময় করে তোলার জন্য নাটক রচনা করেন, এবং সে ধরনের কোনো বাইরের তাগিদ না থাকলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নাটক রচনার কথা ভাবেন না, নাটক-রচনা তাঁর দৈনন্দিন অগ্রাধিকারের মধ্যে আসে না। উপলক্ষ্য-নির্ভর হওয়ার ফলে কিছু দ্রুততার পরিচয়ও হয়তো এ রচনাগুলির কয়েকটি গঠনশৈলীতে থাকা সম্ভব, যদিও সুকুমারের অনুপম কল্পনাপ্রতিভা খুব অনায়াসেই সাধারণ লেখকের প্রবল শত্রু যে সব বিঘ্ন।—যেমন উপলক্ষ্য-নির্ভরতা, দ্রুততা, প্রস্তুতিহীনতা—ইত্যাদিকে পরাভূত করে দিব্য প্রভা অর্জন করতে পারে। তা আমরা সর্বত্রই লক্ষ করব।

৩

রচনার সময় উদ্দিষ্ট দর্শকগোষ্ঠীর বয়স ও মানসিকতার হিসেব করলে সুকুমারের নাট্যরচনাকে দুটি স্পষ্ট ভাগে ভাগ করা যায়—মূলত শিশুদের জন্য লেখা নাটক এবং বয়স্ক উপভোক্তাদের জন্য লেখা নাটক। এখানে এমন কোনো ইঙ্গিত করা হচ্ছে না যে, এ দুয়ের মধ্যে কোনো উভব্যাপী (overlapping) এলাকা নেই, অর্থাৎ শিশুদের নাটক বয়স্কদের, আর বয়স্কদের নাটক অন্তত কিয়দংশে শিশুদের, উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে না। শিশুনাট্যের মধ্যে ফেলতে পারি 'ঝালাপালা', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'অবাক জলপান' 'হিংসুটি' আর 'মামা গো'-কে আর বয়স্কমুখীন নাটক হলো 'ভাবুকসভা', 'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম' আর 'চলচিত্তচঞ্চরি'। যতদূর অনুমান করতে পারি, ননসেন্স ক্লাবের নাটকগুলি মূলত পারিবারিক পরিমণ্ডলের জন্য রচিত এবং শিশুবোধ্য, কিন্তু পরবর্তী মন্‌ডে ক্লাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাটকগুলি বয়স্কদের মনস্কতাকে গ্রহণ করেছে। যদিও 'সমগ্র শিশুসাহিত্য' গ্রন্থে তাঁর সমস্ত নাট্যরচনাকেই গ্রহন করা হয়েছে অর্থাৎ এ নাটক

তিনটিকেও শিশুসাহিত্যরূপেই গণ্য করছেন সম্পাদকদ্বয়, তবু এ তিনটি নাটককে শুদ্ধ শিশুসাহিত্য বলে গ্রহণ করতে আমাদের একটু দ্বিধা হয়। এই দ্বিধা সম্ভবত সম্পাদকদ্বয়ের মনেও ছিল, যে কারণে তাঁরা রচনার কালক্রম না মেনে এ তিনটি নাটককে একসঙ্গে সাজিয়েছেন শেষ দিকে, সব শেষে কেবল রেখে দিয়েছেন অকিঞ্চিৎকর আয়তনযুক্ত, কিন্তু সুসংবদ্ধ 'মামা গো!' কে।

বড়দের নাটক তিনটি আলাদা হচ্ছে কোথায়? সেগুলিতে মজা কম নেই, পরে এই 'মজা'-র নিজস্ব শৈলীগত উপাদানগুলি বিবেচনা করব আমরা—কিন্তু সেগুলিতে আছে বয়স্কদের তত্ত্বগত ঝগড়া, 'চলচিত্তচঞ্চরি'তে যেমন—

সত্যবাহন। আঃ-কেন বাধা দিচ্ছেন? জিজ্ঞাসা করি খণ্ডাখণ্ডের যে তত্ত্বপর্যায় সেটা আপনারা স্বীকার করেন ত?

শ্রীখণ্ড। আমরা বলি, খণ্ডাখণ্ডটা তত্ত্বই নয়—ওটা তত্ত্বাভাস। আর সমসাম্য যেটাকে বলেন সেটা সাধন নয়—সেটা হচ্ছে একটা রসভাব। আপনারা এ সব এমনভাবে বলেন যেন খণ্ডাখণ্ড সমসাম্য সব একই কথা। আসলে তা নয়। আপনারা যেখানে বলেন কেন্দ্রগতং নির্বি-শেষং, আমরা সেখানে বলি-কেন্দ্রগতং নির্বিশেষঞ্চ। কারণ ও দুটো স্বতন্ত্র জিনিস। আপনারা যা আওড়াচ্ছেন ও সব সেকেলে পুরোনো কথা—এ-যুগে ও সব চলবে না।

অর্থাৎ সাম্য সিদ্ধান্ত সভা আর শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রমের মধ্যে নাটকীয় বহির্দ্বন্দ্বের মূলে যে পার্থক্য তার তত্ত্বটি শিশুবোধ্য বা শিশুর জগতের অভিজ্ঞতার অন্তর্গত নয়, যদিও চরিত্রগুলির কিছু ব্যক্তিগত আচরণ, সংলাপ এবং কিছু ঘটনা শিশুদের আনন্দ দেওয়ার মতো। নাটকের সংলাপের মধ্যে আলোচিত একাধিক প্রসঙ্গও শিশুর জগতের নয়, যেমন—

শ্রীখণ্ড। হ্যাঁ,মনে গোরু। গো, রু। 'গো' মানে কী? 'গোস্বর্গপশু - বাক্‌বজ্রদিঙ্‌নেত্র-ঘৃতিভূজলে', গো মানে গোরু, গো মানে দিক, গো মানে ভূ-পৃথিবী, গো মানে স্বর্গ, গো মানে কত কী। সুতরাং এটা সাধন করলে গো বললেই মনে হবে পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, ব্রহ্মাণ্ড। 'রু' মানে কী? 'রব রাব রুত রোদন' 'কর্ণে রৌতি কিমপিশনৈবিচিত্রং'; 'রু' মানে শব্দ। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অব্যক্ত মর্মরশব্দ বিশ্বের সমস্ত সুখ দুঃখক্রন্দন ঘুরতে ছন্দে ছন্দে বেজে উঠছে— মিউজিক অভ দি স্কিয়ার্স দেখুন একটা সামান্য শব্দ দোহন করে কী অপূর্ব রস পাওয়া যাচ্ছে। আমার শব্দার্থ খণ্ডিকায় এই রকম দেড় হাজার শব্দ আমি খণ্ডন করে দেখিয়েছি।

এই প্রাগ্-বৈজ্ঞানিক ভাষাতাত্ত্বিক মরমিয়াবাদ বা lingunistic mysticism ঠিক শিশুদের ভোজা নয়। ভাবুকসভা নাটকে ভাবুকদাদার ভাবনিদ্রার বাইরের মজাটা

শিশুবোধ্য হলেও ভাব ও অর্থের প্রত্যাশিত বন্ধন বিষয়ে ভাবুকদাদার যে বিদ্বেষ—তা শিশুবোধ্যতার গণ্ডি থেকে বহুদূরে

অর্থ! অর্থ তো অনর্থের গোড়া!
ভাবুকের ভাব-মারা সুখ-মোক্ষ-চোরা!
যতসব তালকানা অঘামারা আনাড়ে
'অর্থ, অর্থ, করি খুঁজি মরে ভাগাড়ে!
(আরো) অর্থের শেষ কোথা কোথা তার জন্ম,
অভিধান ঘাঁটা, সে কি ভাবুকের কম্ম?
অভিধান, ব্যাকরণ, আর ঐ পঞ্জিকা—
ষোলো আনা বুজরুকি, আগাগোড়া গঞ্জিকা।
মাখন-তোলা দুগ্ধ, আর লবণহীন খাদ্য,
(আর) ভাবশূন্য গবেষণা—একি ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ?

'শব্দকল্পদ্রুম'-এও ভাষাতাত্ত্বিক মরমিয়াবাদের সূত্রটি পুনরাবৃত্ত হয়েছে। 'বর্ণমালাতত্ত্ব'-এ 'ভাষার অত্যাচার" প্রবন্ধে যা নিয়ে কিছুটা কৌতুকের ছলে সুকুমার রায় আলোচনা করেছেন, তারই রূপকাশ্রিত পরিবেশন এই নাটক, এবং এও শিশুর অধিগম্যতার অতীত। সুতরাং শিশুসাহিত্য এগুলি নয়, যদিও বিচ্ছিন্ন ও পার্শ্বিকভাবে শিশুদের মনোরঞ্জক কিছু কিছু উপাদান এগুলিতে আছে।

সে তুলনায় 'ঝালাপালা', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল, 'অবাক জলপান', 'হিংসুটি', 'মামা গো!'-র শিশুত্বনির্ভর চরিত্র চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর দরকারই হয় না। সহিষ্ণু ও সদাশয় জমিদারের বৈঠকখানায় নানা বিচিত্র উৎপাতের উপস্থিতি, তার একটি উৎপাত পণ্ডিতমশাই ও তাঁর ছাত্রদের শিশুচিত্তরঞ্জক নানা কাণ্ডকারখানা ও সংলাপ এবং শেষে রামা ও মামার বিদ্‌ঘুটে প্রক্রিয়ায় সকলের বিতাড়ন-কোনো বয়স্ক-মুখোপেক্ষী থিম নয়। 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'-এ রামরাবণের যুদ্ধের হুল্লুড়ে 'প্যারোডি, অবাক জলপান'-এর শব্দক্রীড়া-নির্ভর তৃষ্ণার্তির tension-এর প্রলম্বন এবং তার বিচিত্র মোক্ষণ, 'হিংসুটি'-র মৃদু নীতিশিক্ষামূলক সরস স্বনাদ্য সমাধান এবং 'মামা গো'!-র অতি লঘু অথচ চতুর শিশু মনস্তত্ত্বঘটিত মজা—বয়স্কের জগতের বস্তু নয়, যদিও এর সব কটিই বয়স্করও উপভোগ্য।

এর মধ্যে দুটি নাটক ঘটনা পরম্পরাগত সংগঠনের দিক থেকে একটু দুর্বল-অর্থাৎ সেগুলিতে আখ্যানবস্তু ততটা জমাট বাঁধেনি। এ দুটি নাটক 'ভাবুকসভা' আর 'শব্দকল্পদ্রুম'। পুলক চন্দ ভাবুকসভাকে বলেছেন, নাটক 'জাতীয়', কারণ একে নির্দ্বিধায় নাটক বলা যায় না। তিনি এতে 'নাট্যদ্বন্দ্ব' লক্ষ করেননি, ঘটনার পারম্পর্যগত বিকাশ পাননি।

আমাদের কাছে নাটকের সংজ্ঞা আর একটু ব্যাপক বলে আমরা এটিকে নাটক অভিধা থেকে বঞ্চিত করতে চাই না। তাঁর "ঘটনার পারম্পর্যপূর্ণ বিকাশ'-এর অভাবের কথাটা স্বীকার করেও আমরা লক্ষ করি যে, ভাবুকদাদার অর্থবিযুক্ত ভাব সম্বন্ধে বিশ্বাস ও ব্যাখ্যানের সঙ্গে অন্যদের ধারণা বা অজ্ঞতার একটা দ্বন্দ্ব এই রচনাতে আছেই সেখানেই এর যা কিছু নাটকীয়তা। নাটকের দ্বন্দ্ব যে খুব প্রকট বা শারীরিক হবে তার কোনো হেতু নেই—এ নাটকে দ্বন্দ্বটি মূলত বোধাশ্রিত এবং তত্ত্বগত—যদিও তার প্রকাশ নেহাত লৌকিক। ফলে, খানিকটা তরজার চেহারা নিলেও, এটি নাটকই। 'শব্দকল্পদ্রুম'-এও ঘটনার কল্পনা ও গ্রন্থনা খুব স্থির চিন্তা ও নির্মাণগত প্রকৌশলের চিহ্ন বহন করেন না, কিন্তু তুলনায় এর দ্বন্দ্ব অনেক স্পষ্ট ও জটিল। এতে বিশ্বম্ভরের শাদামাঠা রোমান্সবর্জিত কাণ্ডজ্ঞানের সঙ্গে গুরুজি ও তার শিষ্যদের আতিশয্যের দ্বন্দ্ব একদিকে, আর গুরুজির দলবলের সঙ্গে স্বর্গের দেবতাদের দ্বন্দ্ব আরেকদিকে, কিন্তু গুরুজির দলবলের শব্দদর্শনের ধাক্কা কেন যে স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছাবে—তার কোনো শিল্পানুগত লজিক সুকুমার তৈরি করায় মন দেননি। যেন অভিনয়ে দেবতাদের উপস্থিতিতে spectacle জমকালো হবে—এবং লক্ষ্মণের শক্তিশেল'-এর মতোই যা আপাত শ্রদ্ধেয় তাকে নিয়ে প্যারোডি করা যাবে, শুধু এই লক্ষ্য থেকেই গুরুজির আখ্যানের সঙ্গে স্বর্গকাণ্ড জুড়ে দিয়েছেন। ফলে নাটকের ক্লাইম্যাক্সও জমেনি, বিশ্বকর্মার শব্দকল্পদ্রুম'-এর ডাঙশ খেয়ে "দ্রুম" শব্দে স্বশিষ্য গুরুজির স্বর্গ হইতে পতন"-এর আগে পর্যন্ত গুরুজি জানতেই পারেনি স্বর্গের সঙ্গে তাঁর কোনো লড়াই আছে বা তার অর্থনিষ্কাশিত শব্দতত্ত্বের প্রচারণায় দেবতামহলে কোনো অসন্তোষ জমে উঠেছে। ফলে সে বেচারি কোনো লড়াই দেবারই অবকাশ পায়নি। এখানে এ নাটকটির আখ্যানগত বিন্যাস অপূর্ণ হয়ে আছে।

৪

কিন্তু আখ্যান বা ঘটনা পরম্পরা সুকুমারের নাটকের মূল নির্ভর বা আকর্ষণ নয়, সে আকর্ষণ তার সংলাপ। অর্থাৎ নাটকীয়তা বলতে আমরা যা বুঝি, তা সুকুমারের নাটকে মূলত সংলাপের সূত্রেই এসেছে, ঘটনার ভূমিকা গৌণ।

কিন্তু এই দ্বন্দ্বের, অর্থাৎ উক্তি-প্রত্যুক্তি বা কথাকাটাকাটির আকর্ষণও সুকুমারের নাটকের মূল কথা নয় মূল কথা হল প্রতিটি সংলাপের গড়ন তার মধ্যবর্তী উদ্ভট অসংগতি আর রঙ্গকৌতুকের নানা উপাদানের আয়োজন ও কুশলী নির্মাণ। বস্তুতপক্ষে নাটকীয় কথাকাটাকাটি কোনো নাটকেই খুব বেশি পরিমাণে নেই। যেখানে আছে সেখানেও অনেক জায়গায় তা উক্তি-প্রত্যুক্তির চেহারা তেমন নেয় না; এক পক্ষ স্বাভাবিক সংলাপ বলে যায় অন্য পক্ষ তাতে প্রতিক্রিয়ার আতিশয্য দেখায়। যেমন 'ঝালাপালা' আর 'চলচিত্ত-চঞ্চরি' থেকে যথাক্রমে উদ্ধৃত এই দুটি অংশে—

পণ্ডিত।.....এই পাহারাওয়ালা—ইদিকে আও।

(পুলিশের প্রবেশ)

দেখো, হামারা পাশের বাড়িমে দিনরাতভর এইসা ক্যাঁচক্যাঁচ করতা নিদ্রার অত্যন্ত ব্যাঘাত হোতা হায়—ইস্‌কো কুছ প্রতিকার হয় না রে ব্যাটা?

পুলিশ। কেয়া বোল্‌তা বাবু?

পণ্ডিত। আহা, এইটা দেখি একেবারে নিরক্ষর মূর্খ! আরে, পাশের বাড়িমে একঠো গানের ওস্তাদ হায় নেই? উস্‌কো একদম কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেহি হায়-দিন রাত ভর কেবল সারে গামা ভাঁজতা হায়।

পুলিস। কেয়া হোতা?

পণ্ডিত। আরে খেলে যা! (সুর করিয়া) সারে গামা মাপা ধানি ধানি এইসা করতা হায়—

পুলিশ। হাম কেয়া করেগা বাবু—উ হামারা কাম নেহি।

পণ্ডিত। না তোমার কাজ না! মাইনে খাবে তুমি কাজ করবে বেচারাম তেলি।

পুলিশ। হ্যাঁ বাবু।

পণ্ডিত। চে'চাস কাঁহে? ফের পূজার বকশিশ চায়গা ত এইসা উত্তম মধ্যম দেগা—থৌতামুখ ভোঁতা কর দেগা।

পুলিস। আরে, পাগলা হায়রে—পাগলা হায়! (প্রস্থান)

সত্যবাহন। এ'রই নাম ভবদুলালবাবু। এখন কী বলতে চাও এর বিরুদ্ধে বলো।

বিনয়সাধন। না, না, বিরুদ্ধে বলব কেন?

সত্যবাহন। কাপুরুষ! এইটুকু সংসাহস নেই-আবার আস্ফালন করতে এসেছ?

বিনয়সাধন। আহা, আমার কথাটাই আগে বলতে দিন—

সত্যবাহন। শুনলেন ভবদুলালবাবু? ওর কথাটা আগে বলতে দিতে হবে। আমাদের কথাগুলোর কোনো মূল্যই নেই।

এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে একজনের স্বাভাবিক বা প্রায়-স্বাভাবিক কথার জবাবে আরেকজন overreact করছে, তারই ফলে অন্ধ নাটকীয় বিরোধ বা conflict তৈরি হচ্ছে। এমন প্রতিবেশও আছে যেখানে দুজনেই একটু overreact করছে, কিন্তু তার দৃষ্টান্ত এ নাটকগুলিতে খুবই কম। একটি পাই 'অবাক জলপানে'-এ—

বৃদ্ধ।....—বলি ঘুমড়ির জল খেয়েছ কোনোদিন?

পথিক। আজ্ঞে না, তা খাইনি—

বৃদ্ধ। খাওনি? অ্যাঃ! ঘুমড়ি হচ্ছে আমার মামাবাড়ি—আদত জলের জায়গা। সেখানকার যে জল, সে কী বলব তোমায়? কত জল খেলাম—কলের জল, নদীর জল,

ঝরনার জল, পুকুরের জল— কিন্তু মামাবাড়ির কুয়োর যে জল, অমনটি আর কোথাও খেলাম না। ঠিক যেন চিনির পানা, ঠিক যেন ক্যাওড়া দেওয়া শরবৎ!

পথিক। তা মশাই আপনার জল আপনি মাথায় করে রাখুন—আপাত এই তেষ্টার সময়, যাহয় একটু জল আমার গলায় পড়লেই চলবে—

বৃদ্ধ। তাহলে বাপু তোমার গাঁয়ে বসে জল খেলেই পারতে? পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে জল খেতে আসার কী দরকার ছিল? যা হয় একটা হলেই হল—ও আবার কীরকম কথা? আর এমন তাচ্ছিল্য করে বলবারই বা দরকার কী? আমাদের জল পছন্দ না হয়, খেয়ো না—বাস্। গায়ে পড়ে নিন্দে করবার দরকার কী? আমি ওরকম ভালোবাসিনে। হ্যাঁ (রাগে গজগজ করিতে করিতে বৃদ্ধের প্রস্থান)

কিংবা 'হিংসুটি'তে একটি জায়গায়—

প্রথম। না ভাই আমি ঐ ওকে বলব না—ও ভারি হিংসুটে।

পঞ্চম। আচ্ছা নাই বা বললি। ভারি তো স্বপ্ন—আমি বুঝি আর স্বপ্ন দেখতে জানিনে—

প্রথম। দেখলি ভাই কী রকম হিংসে!

এই ধরনের বাচনিক ঝগড়াঝাঁটির একটা নাটকীয়তা অবশ্যই আছে—যাত্রায় নাটকে তার প্রচুর ব্যবহারও হয়, কিন্তু সুকুমার তার সুযোগ নিয়েছেন খুব কম। একজনের অতিপ্রতিক্রিয়া (overreaction)-র চেয়ে দুজনের অতি-প্রতিক্রিয়ায় নাটকীয়তা বেশ খানিকটা বেড়েও যায়—কিন্তু সকুমারকে এ কৌশল খুব বেশি গ্রহণ করতে দেখি না।

তাহলে তাঁর নাটকীয়তা এবং রঙ্গসরসতা সৃষ্টির মূল কৌশলটি কী? বর্তমান আলোচকের মতে, তা হল অসংগতির শর্ত মেনে তৈরি সংলাপের স্তূপীকরণ cumulation। এই স্তূপীকরণ একজনের বিচ্ছিন্ন বা এক সংলাপেও যেমন থাকে, তেমনই কয়েকজনের প্রবহমান সংলাপেও থাকে। আমরা আবার একক সংলাপ এবং একাধিক মানুষের প্রবহমাণ সংলাপ—এ দুয়ের মধ্যে সূক্ষ্মতর পার্থক্যগুলি লক্ষ করব।

সুকুমারের নাট্যরচনাগুলির একটি বিশেষত্ব এই যে, সেগুলিতে খুব কম ক্ষেত্রেই কেবল দুটি লোক তৃতীয়বর্জিতভাবে পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে—অধিকাংশ নাটকেই দৃশ্যে একাধিক চরিত্র উপস্থিত থাকছে। মামা গো!' এর ব্যতিক্রম, যেমন ব্যতিক্রম 'অবাক জলপান'—যেখানে অধিকাংশত দুজনের সংলাপ, কিন্তু একটি চরিত্র অর্থাৎ পথিক সর্বত্রই উপস্থিত ধ্রুবক বা constant হিসেবে, তারসঙ্গে সংলাপী অন্যান্য চরিত্রের বদল ঘটছে—ঝুড়িওয়ালা, প্রথম বৃদ্ধ, দ্বিতীয় বৃদ্ধ, ছোকরা, মামা—এই ক্রমে। অর্থাৎ সেই নাটকের ঘটনার অগ্রগতি এবং সংলাপগত অবস্থানের চিত্রটি এই ঃ

প্রথম দৃশ্য ঃ পথিক বনাম ঝুড়িওয়ালা

দ্বিতীয় দৃশ্য ঃ পথিক বনাম প্রথম বৃদ্ধ

তৃতীয় দৃশ্য ঃ পথিক বনাম দ্বিতীয় বৃদ্ধ

চতুর্থ দৃশ্য ঃ পথিক বনাম ছোকরা

পঞ্চম দৃশ্য ঃ পথিক বনাম মামা

'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'-এও দ্বিতীয় দৃশ্যে যেমন, সুগ্রীব-বিভীষণ, সুগ্রীব রাবণ, রাবণ ও লক্ষ্মণের দ্বিপাক্ষিকতা আছে। বলা বাহুল্য, দ্বিপাক্ষিকতা কেবল দুটি লোকের কথোপকথন নয়, দুটি লোকের দ্বান্দ্বিক কথোপকথন। দুজন ব্যক্তির সমস্ত আলাপ নাটকীয় সংলাপ হয়ে ওঠে না তা dialogue যতটা তার চেয়ে বেশি করে duologue!

কিন্তু দুজনের সংলাপে যেটুকু নাটকীয়তা তৈরি করেন সুকুমার—তাতে প্রত্যক্ষ মুখোমুখি সংঘাতের উপর খুব বেশি নির্ভরতা থাকে না নির্ভরতা বেশি থাকে একজনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াজাত সংলাপ বা normal verbal response-এর সঙ্গে আরেকজনের কিছুটা অস্বাভাবিক সংলাপ প্রতিক্রিয়ার বিরোধের উপর। অবাক জলপান-এ প্রথম দিকে এই প্যাটার্নটিই লক্ষ করি আমরা। পরে তৃষ্ণাকুল পথিকটি ক্রমশ অধৈর্য ও অস্থির হয়ে অতি-প্রতিক্রিয়ার বশীভূত হচ্ছে তাও আমরা লক্ষ করেছি।

৫

আমরা এবার নাট্যসংলাপে সুকুমারের যেটি আসল কৌশল, অর্থাৎ অসংগতি বা কৌতুময় উপাদানের স্তূপীকরণ, সেইটি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখব। জানি না স্তূপীকরণের মেটাফরটি সংগত হল কি না, ভিন্ন একটি মেটাফর ব্যবহার করে আমরা একে সুকুমারের সোপান-নির্মাণও বলতে পারি। বলা বাহুল্য, এখানে আমাদের অবলম্বন বিভিন্ন চরিত্রের টানা সংলাপ। এখানে অনেক ক্ষেত্রেই দৃশ্যে দুয়ের বেশি চরিত্র থাকছে। কিন্তু স্তূপীকরণ ও সংঘাত—এ দুয়ের গূঢ় মিশ্রণেই বিভিন্ন নাটকে সুকুমারের সংলাপ এগিয়ে চলেছে। যেমন 'ঝালাপালা'-র দ্বিতীয় দৃশ্যে দুলিরাম ও খেঁটুরামের সৎলাপে আছে স্তূপীকরণ, অর্থাৎ একজন এক কথা বলছে তো আরেকজন সেই কথাই আরেকটু ভিন্নভাবে আরো বাড়িয়ে বলছে—ইংরেজিতে যাকে one-upmanship বলে, তারই দৃষ্টান্ত তৈরি করছে। কিন্তু কেবলচাঁদ ওস্তাদ আসার পর ওই সংলাপের ধারায় একটা প্রতিমুখী দ্বন্দ্বের ঢেউ জেগে উঠছে। যেমন—

কেবল। আমি মনে কচ্ছিলুম আপনাদের মজলিশে আজ গুটি দশেক গান শোনাব।

খেঁটু ও দুলি। (পরস্পরের প্রতি) এ কে রে?

কেবল। সিকী! আপনারা কেবলচাঁদ ওস্তাদকে চেনেন না?

খেঁটুরাম। কোনো জন্মে নামও শুনিনি—

দুলিরাম। চোদ্দপুরুষে কেউ চেনে না—

কেবল। হ্যাঁ, তা আপনারা গোপীকেষ্টবাবুকে চেনেন তো?

দুলি ও খেঁটু। গোপীকেষ্টু হ্যাঁ—নাম শুনেছি—বোধ হচ্ছে।

কেবল। আমি গোপীকেষ্টবাবুর বাড়িওয়ালার খুড়শ্বশুরের জামাইয়ের পিসতুতো ভাই।

দুলিরাম। তাই নাকি?

খেঁটুরাম। সে কথা বলতে হয়—আসতে আজ্ঞে হোক মশাই।

দুলিরাম। বসতে আজ্ঞে হোক মশাই।

এ দৃশ্যে স্পষ্টতই দুলিরাম ও খেঁটুরাম একদিকে, তাদের বক্তব্য এক, যদিও প্রকাশভঙ্গি ভিন্ন; কিন্তু কেবলচাঁদ অন্যদিকে। প্রথম দুজনের সংলাপে একই ভনিতার বিস্তার, শৈলীগত ভিন্নতা এবং একই কথার স্তূপীকরণ ঘটছে। যেমন এই নাটকেরই অন্যত্র—

পণ্ডিত। যাও যাও, এখন আমায় ঘাঁটিয়ো না, আমার মেজাজ ভালো নেই—

খেঁটুরাম। ওরে বাসরে, দুর্বাসা মুনির মেজাজ ভালো নেই।

খেঁটুরাম। ওরে বাস্‌রে, দুর্বাসা মুনির মেজাজ ভালো নেই!

দুলিরাম। দেখিস্ ঘাঁটাস টাটাসনে—শেষটায় ব্রহ্মতেজে ভস্ম হয়ে যাবি!

এখানে বিরোধী সুর নিয়ে আসছে পণ্ডিতের সংলাপ।

সব স্তূপীকরণই যে এরকম একমুখী সংলাপের প্রতিযোগিতা তা নয়। এক ধরণের স্তূপীকরণে প্রসঙ্গের বিস্তার ঘটে, নতুন (সত্য বা মিথ্যা) সংবাদ পাওয়া যায়, তাতে নাটকের পটভূমিগত তথ্য বা information বেরিয়ে আসে। যেমন 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'-এর প্রথম দৃশ্যে সকলের 'ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্" ধুয়ো এবং তার ফাঁকে ফাঁকে দূতের পদ্যবন্ধে রাবণের অগ্রগতির দ্বিপদী ঘোষণা। এই সংবাদগুলি মূলত প্রশ্নোত্তরের সূত্রে আসে—যেমন 'ঝালাপালা'-তে।

কেদার। দারোগাবাবু আতা হায়?

পুলিস। হ্যাঁ বাবু—

কেদার। হাতকড়া লেকে?

পুলিস। হাঁ বাবু—

কেদার। বাড়ি সার্‌চ হোগা?

পুলিস। হ্যাঁ বাবু—

কিন্তু কেবল প্রশ্নের বিচিত্র স্তূপীকরণ চমৎকার মজা তৈরি হয় 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' এ—

রাম। এত গোলমাল কিসের হে?

সুগ্রীব। রাবণ ইদিকে আসছে না তো?

জাম্বুবান ও বিভীষণ। অ্যাঁ—রাবণ আসছে—অ্যাঁ?

বিভীষণ। আমার ছাতাটা কোথায় গেল? ব্যাগটা?

জাম্বুবান। হাঁরে, তোর গায়ে জোর আছে? আমায় কাঁধে নিতে পারবি।

এখানকার প্রশ্নগুলি একর্থক, একরূপী বা একমুখী নয়—কিন্তু সবগুলির ব্যঞ্জনা এক। প্রশ্নাবলির এই আপাত-বহুমুখিতা এবং অন্তর্গত ব্যঞ্জনার ঐক্য এই স্তূপীকরণকে বিশেষ আকর্ষক করে তুলেছে। 'চলচিত্তচঞ্চরী'তেও স্তূপীকরণ ও সংঘাতের মিশ্রণে সংলাপ চমৎকার এগিয়েছে, তবে তাতে স্তূপীকরণের আধিক্য, সংঘাতের অল্পতাই দ্রষ্টব্য। যেমন এই অংশে—

(রামপদর প্রবেশ)

সত্যবান। এই দেখুন এক মূর্তিমান এসে হাজির হয়েছে।

নিকুঞ্জ। আরে দেখছিস আমরা বসে কথা বলছি, এর মধ্যে তোর পাকামো করতে আসবার দরকার কী বাপু? (আগের সংলাপের সঙ্গে স্তূপীকরণ সম্পর্ক—প.স.)

রামপদ। (স্বগত) কি আপদ! তখনি বলেছি আমায় ওখানে পাঠাবেন না—(আগের সংলাপের সঙ্গে বিরোধ-সম্পর্ক তৈরি করছে, তবে স্বগতোক্তি বলে সে বিরোধ প্রকাশ্য নয়, প্রচ্ছন্ন—প.স.)

নিকুঞ্জ। কী হে, তুমি সমাদ্দার মশায়ের সঙ্গে বেয়াদপি কর—এইরকম তোমাদের আশ্রমে শিক্ষা দেওয়া হয়? (রামপদ-র সংলাপের সঙ্গে বিরোধের কিন্তু অন্যদের সংলাপের সঙ্গে স্তূপীকরণ-সম্পর্ক)

রামপদ। আমি? কই আমি ত আমার ত মনে পড়ে না, আমি— (মৃদু) বিরোধ-সম্পর্ক)

ঈশান। 'আত্মম্ভরী অহংকার আত্মনামে হুহুংকার,

তার গতি হবে না হবে না—' (স্তূপীকরণ)

সোমপ্রকাশ। দেখ, ওরকমটা ভালো নয়—নিজের কথা দশজনের কাছে বলে বেড়াব, এ ইচ্ছেটাই ভালো নয়। (স্তূপীকরণ)

সত্যবাহন। আমি যখন খুলনায় চাকরি করতাম ফাউসন সাহেব নিজে আমায় সার্টিফিকেট দিলে—'বিদ্যায় বুদ্ধিতে জ্ঞানে, উৎসাহে, চরিত্রে, সাধুতায়, সেকেণ্ড টু নন!! কুরু চাইতে অমানুষ। আমি কি সে কথা তোমারে বলতে গিয়েছিলাম (স্তূপীকরণ)

নিকুঞ্জ। আমার পিসতুতো ভাই সেবার লাট। সাহেবের সামনে গান করলে আমি কি তা নিয়ে ঢাক পিটিয়েছিলাম। (স্তূপীকরণ)

ঈশান। আমার তিন ভুল্যম ইংরাজী কাব্য 'ইন মেমোরিয়াম' ও মান্ধাতা!' ও মোরস্' যেবার বেরুল সেবার বেঙ্গলীতে কী লিখেছিল জানতেন ? উই কন্‌গ্র্যাচুলেট দি ডিসটিংগুইশড অথার অব দিস মনুমেন্টাল প্রোডাকশান ডাব্‌ল ডিমাই অকটেভো ৯৭৪ পেজেস) হু ইজ এভিডেন্টলি ইন পোজেশান অভ এ স্টুপেন্ডাস অ্যামাউন্ট অভ অ্যাস্টাউন্ডিং ইনফরমেশান! এরা যদি কথাটা না তুলতেন, আমি কি গায়ে পড়ে গল্প করতে যেতুম।' (স্তূপীকরণ)।

৬

কিন্তু স্তূপীকরণই হোক আর বিরোধই হোক, সুকুমারের নাটকের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ তবু হয়ে ওঠে বহু ক্ষেত্রে একক সংলাপটির নিজস্ব গড়ন, তার অসামান্য কৃৎকৌশল। এখানে ননসেন্স রচয়িতার হাতে যত রকমের কারিগরি আছে, যত অস্ত্র আছে—প্রায় সবই তিনি ব্যবহার করেছেন। আমরা পরপর এই অস্ত্রগুলির কিছু কিছু দৃষ্টান্ত তুলছি।

ক. রসগাম্ভীর্যচ্যুতি বা anticlimax : সত্যবাহন। (খাতা লইয়া) আজ মনে পড়ছে সেই দিনের কথা, যেদিন সেই চৈত্রমাসে আমরা আলাভোলা বাবাজীর আশ্রমে গিয়েছিলাম। ওঃ সেদিনের যে দৃশ্য দেখেছিলাম, আজও তা আমাদের মানসপটে অঙ্কিত হয়ে আছে। দেখলাম মহা প্রশান্ত আত্মভোলা বাবাজী হাস্যোজ্জ্বল মুখে পরম নির্লিপ্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁর পোষা চামচিকেটিকে জিলিপি খাওয়াচ্ছেন। আজ আমাদের কী সৌভাগ্য যে বাবাজীর প্রিয়শিষ্য—একি সোমপ্রকাশ এ কোন্ খাতা নিয়ে এসেছ? ধুতি চাদরখানা, বিছানার চাদর একখানা, বালিশের ওয়াড় একখানা বাকি একখানা তোয়ালে—এসব কী?'

এ সংলাপের প্রথম বাক্যে "আলাভোলা বাবাজী" নামটায় একটু খটকা লাগলেও আমরা তা ততটা গ্রাহ্য করি না, বর্ণনা আমাদের একটি পবিত্র মহৎ প্রত্যাশা তৈরি করতে থাকে। প্রথম রসচ্যুতি ঘটে পোষা চামচিকেটিকে জিলিপি খাওয়ানোর খবরে। পোষা জীবটি বাজপাখি নয়, হরিণ নয়, ধেনু নয়, এমন কী বাঘ-সিংহ নয়—চামচিকে। আর তাকে শস্যখণ্ড, নীবার বা মাংসখণ্ড খাওয়াচ্ছেন না, খাওয়াচ্ছেন জিলিপি। একসঙ্গে দুটি বিপর্যয়কারী অনুসঙ্গ। কিন্তু আরো তীব্র রসবিচ্যুতি ঘটছে সংলাপের শেষাংশে—যেখানে ভূমিকার পর আসল প্রবন্ধ পড়তে গিয়ে বেরিয়ে পড়ছে ধোপার হিসেবের খাতা।

খ. উক্তি ও আচরণের অসংগতি এটা আমরা রামপদের সঙ্গে সত্যবাহন ঈশান, নিকুঞ্জ প্রভৃতির 'অহংকারের অনৌচিত্য" সংক্রান্ত সংলাপগুলিতে স্পষ্টই লক্ষ করেছি।

গ. প্রসিদ্ধ বা প্রথাগতভাবে মহদ্‌ভাবাশ্রিত বিষয়কে লঘু করে দেখানো বা

প্যারোডি য 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটকটিই প্যারোডির একটি চমৎকার নিদর্শন। তাতে সুকুমার রায় Sacred কে profane করার অনেকগুলি কৌশল অবলম্বন করেছেন, যেমন প্রথমত, সকলকে দিয়েই খুব লৌকিক ও কথ্য শব্দ বলিয়েছেন, যেমন রাম কখনো বলছে "রাবণ ব্যাটা", কখনো "আর গোল করিস নে,—নে বকশিশ নে" বলে হনুমানকে কলা প্রদান করছে, বিভীষণ বলছে—'যুদ্ধ করতে এসেছিস, ওমনি করে হাঁটলে লোকে বাঙাল বলবে যে!" রাবণ আসছে শুনে পালাবার ছুতোর জন্য সে "আমার ছাতাটা কোথায় গেল? আমার ব্যাগটা?' বলে অকুল প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছে, রাবণ প্রভৃতি সংলাপে যথেচ্ছ ইংরেজি শব্দ এবং বিদেশী নামও ব্যবহার করছে—"ছি ছি ছি —এত গর্ব করে, এত আস্ফালন করে, শেষটায় চম্পট দিলি? শেম! শেম!" এবং —"আমি পালোয়ান স্যান্ডো সমান/তুই ব্যাটা তার জানিস কী?/ কোথায় লাগে বা কুরো পাট্‌কিন্/ কোথায় রোজেদ্ ভেনিস্কি?" বলে লক্ষ্মণের কাছে ডম্ফাই করছে। কবি মধুসূদন রাম-রাবন প্রভৃতির এই ভাষা শুনে মূর্ছিত হতেন বলে মনে হয়। এই স্বাস্থ্যকর irreverance অবশ্য বাংলায় আগেও লোক-ঐতিহ্যে ছিল---কীর্তনের প্যারোডি—"নবদ্বীপের বাঁধা ঘাটে শ্রীচৈতন্য পাঁটা কাটে, অদ্বৈত ধরেছে তার ঠ্যাঙ রে"—ইত্যাদিতে তার প্রমাণ আছে—ঊনবিংশ শতাব্দীতে লেখা ইংরেজি শব্দ মেশানো বৈষ্ণব পদের প্যারোডিও দুর্লভ নয়। দ্বিতীয়ত চরিত্র-পরিকল্পনাতে এবং চরিত্রগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বিশেষ চাপল্যের আরোপ করেছেন সুকুমার—যেমন জাম্বুমান বিভীষণের প্রায় সর্বাঙ্গীণ কাপুরুষতা, সুগ্রীবের প্রাথমিক আস্ফালন, কিন্তু পরে রাবণের লাঠি খেয়ে 'ছেড়ে দে ভাই কেঁদে বাঁচি, সাধের প্রাণটি হারাব কী শেষে?' বলে পলায়ন। রাবণের শক্তিশেল মেরে লক্ষ্মণকে মূর্ছিত করে তার পকেট লুণ্ঠন কৃতিত্ব যমকর্তৃক যমদূতদের তেরো আনা মাইনে বাকি রাখা, পরে সাফল্যের জন্য প্রত্যেকের। দাবি এমনকী লক্ষ্মণেরও—যার যুক্তি—"আর আমি যদি শক্তিশেল খেয়ে না পড়তাম ত এত সব কাণ্ডকারখানা কিছুই হত না। আর তোমারাও জাহির করতে পারতে না।" এবং শেষে হনুমানের চারটি বাতাসার বকশিশ পাওয়া এসবই সুকুমারের উর্বর রঙ্গকল্পনার উদ্দাম সৃষ্টি। বস্তুতপক্ষে মহাকাব্যের চরিত্রদের উপর ভেতো বাঙালি মধ্যবিত্তরা তৎসংশ্লিস্ট ভণ্ডামির আরোপেই এই প্যারোডি জমকালো হয়ে উঠেছে। দূতের চরিত্রটিকে একটু বেশি মনোযোগ দিয়ে তৈরি করেছেন সুকুমার, বিশেষত তার 'ভালো করে গুছিয়ে' সব কিছু বলার অভ্যাসটিকে—ফলে যুদ্ধক্ষেত্রের অতি জরুরি খবর দেওয়া সে আরম্ভ করছে এইভাবে—"আজ্ঞে আমি ছানটান করেই পুইশাক চচ্চড়ি আর কুমড়োর ছেঁচকি দিয়ে চাট্টি ভাত খেয়েই এমনি বেরিয়েছি—অবিশ্যি আজকে পাঁজিতে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ নিষেধ লিখেছিল কিন্তু কী হল জানেন —আমার কুমড়োটা পচে যাচ্ছিল কিনা—"।

উৎসাহী পাঠকের মনে পড়তে পারে যে পরবর্তীকালে ইউজিন ইয়োনেস্কো প্রভৃতি অ্যাবসার্ড নাট্যকারদের একাধিক নাটকের সংলাপে এই অতিতুচ্ছ inanities এর ব্যবহার আছে। কিন্তু আবার মনে করিয়ে দিতে চাই যে এই সামান্য সাদৃশ্যের জন্য সুকুমার রায়কে অ্যাবসার্ডদের অগ্রপুরুষ বলে দাঁড় করানো বাতুলতা মাত্র। সুকুমার টেনশনের মুখে ওই অতিতুচ্ছ তথ্যের অবতারণা করে রঙ্গ জমিয়েছেন মাত্র—হিউমারিস্টদের এ একটি পুরনো কৌশল আর অ্যাবসার্ড নাট্যকারের তো থেকে অস্তিত্বের রুটিনবাঁধা ক্লান্তিকর ছক আর বিপুল অসারতা (তাঁদের মতে) দেখানোর চেষ্টা করেছেন—তাঁদের উদ্দেশ্য একেবারেই আলাদা।

প্যারোডি শুধু 'লক্ষ্মণের শক্তিশেলে'ই আছে তা নয় 'চলচিত্তচঞ্চরি', 'ভাবুক-সভা' এবং 'শব্দকল্পদ্রুম'- ও এক ধরনের প্যারোডিই। শেষ নাটকটির দ্বিতীয় দৃশ্যে দেবতাদের সংলাপ প্যারোডির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই নাটকটিতে সুকুমার রায়ের ননসেন্স প্রতিভা চমৎকার দু-একটি ভাবনা তৈরি করেছে—একটি হল স্বপ্ন দেখার প্রতিযোগিতা—একজন একটা স্বপ্ন দেখেছে এমন দাবি করে তার বিবরণ দিতে আরম্ভ করামাত্র অন্যরা সেই একই স্বপ্ন দেখার সাক্ষী আছে ঘোষণা করে তার উপর রং ফলাতে আরম্ভ করছে—

বেহারী। হয়েছে কী, আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলুম।

বিশ্বম্ভর। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা সাক্ষী আছি।

বেহারী। আমি স্বপ্ন দেখলুম, অমাবস্যার রাত্তিরে একটা অন্ধকার গর্তের মধ্যে ঢুকে আর বেরুবার পথ পাচ্ছিনে। ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় দেখি এক সন্নিসি—

পটলা। তার মাথায় এয়া বড় জটা—

বিশ্বম্ভর। তার গায়ে মাথায় ভস্মমাখা—তার উপর রক্তচন্দনের ছিটে—

বেহারী। (স্বগত) কী আপদ! স্বপ্ন দেখলুম আমি আর রং ফলাচ্ছেন ওঁরা—

অর্থাৎ স্বপ্নের মতো একটা অতিশয় ব্যক্তিগত ব্যাপারের উপর সমবেত দাবি চাপানো হচ্ছে—এমন অভাবনীয় কাণ্ড সুকুমারের উদ্ভট কল্পনাতেই আসতে পারে। আমাদের মনে আছে, 'হিংসুটি'তে এই স্বপ্ন দেখার ব্যাপারটিই অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে, কিন্তু তাতে একটি সুনীতি সঞ্চারের লক্ষ্য বললাভ করার ফলে সুকুমার-সুলভ উদ্দাম মজার সৃষ্টি হয়নি।

ঘ. অপ্রাসঙ্গিক এবং অর্থবোধহীনভাবে সংস্কৃত শব্দাবলির অতিশয় ভ্রান্ত এবং বিভ্রান্ত প্রয়োগ, কিছুটা malapropism-এর মতো। ঝালাপালার পণ্ডিত এই কাজটি সবচেয়ে বেশি করে করেছে, বিশেষ করে জমি—দারের সামনে, নিজের বিদ্যাবত্তা জাহির করবার জন্য। সে ব্যাকরণের "অভূততদ্ভাবে চ্বী"-কে ন্যায়শাস্ত্রের বাণী হিসাবে উদ্ধার করে, তার মতে "নরাণাম্ মাতুলক্রম", "অলমিতিবিস্তারেণ" আর "নত্বমিচ্ছন্তি

বর্বরাঃ", এমন কী "যা শত্রু পরে পরে"ও ন্যায়শাস্ত্রেরই শ্লোকাংশ। রামকানাই যখন কেবলচাঁদ ওস্তাদকে গলাধাক্কা দেয় তখন কেবলচাঁদ" এইও ইষ্টুপিড বেয়াদব, ভদ্রলোকের। গায়ে হাত তুলিস!" বলে ধমকায় এবং পণ্ডিত "ইকী! ইকী! কাকস্য পরিবেদনা, গতস্য শোচনা নাস্তিক" (= নাস্তি) বলে বিস্ময়ে আর্তনাদ করে ওঠে। 'শব্দকল্পদ্রুম' এ গুরুজির দলবল নির্বিশেষ মন্ত্র "গৌ গাবৌ গাবঃ" জপ আরম্ভ করা মাত্র বিশ্বম্ভর "ইতমরঃ" বলে উঠে নিজের প্রজ্ঞা দেখায়। ভবদুলালের ('চলচিত্তচঞ্চরি') দূরবীণের শক্তি প্রসঙ্গে "থাউজ্যান্ড হর্ষ পাওয়ার" কথাটি আমাদের মনে পড়বে। কিংবা সোমপ্রকাশের কথা—"মানুষের মনের গতি কী আশ্চর্য ঃ একদিকে হেরিডিটি আর একদিকে এনভাইরানমেন্ট —এদুয়ের প্রভাব একসঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

ঙ. Non-Sequitur, অর্থাৎ অসম্ভব কার্যকারণের আরোপ।

যেমন 'ঝালাপালা'র ঘটিরামের সেই দুর্ধর্ষ অঙ্কটিতে—"চার সের আলুর দাম যদি দশ আনা হয় তবে আদ্ মোন পটলের দাম কত? কিংবা আরো পরের এই সংলাপে—

জমিদার। এবারের গরমটা কেমন টের পাচ্ছ বল দিকি—

খেঁটুরাম আঃ! গরম বলে গরম! আগুন লাগে কোথা! উঃ!

দুলিরাম। আমাদের বেড়ালটা সর্দি-গর্মি হয়ে মারা গেছে—

জমিদার। এসব বোধ হয় সেই ধূমকেতুর জন্যে—

পণ্ডিত। হ্যাঁ সিদিন আমাদের ওখানে ধূমকেতুর ন্যাজ দেখা গিছিল—

দুলিরাম। কার ন্যাজ কে জানে?

খেঁটুরাম। ওরই ন্যাজ হয়ত।

জমিদার। ধূমকেতুটা এসে কী কাণ্ড করল? ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্প—

খেঁটুরাম। প্লেগ, দুর্ভিক্ষ, বেরিবেরি—

দুলিরাম। পানের পোকা। এলাহাবাদ এগজিবিশন!

'চলচিত্তচঞ্চরি'তে ভবদুলাল সোমপ্রকাশকে শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রম বিষয়ে জানাচ্ছে—"ওঁদের আশ্রমে একটা দূরবীণ আছে, তার এমন তেজ যে চাঁদের দিকে তাকালে চাঁদের গায়ে সব ফোসকা ফোসকা মতন পড়ে যায়।"

চ. নাম ও শব্দের বিকৃতি, প্যারোডি

'ঝালাপালা'তে কেবলচাঁদ নিজের নামটি ঠিকই বলছে কিন্তু দুলিরাম জবাবে জিজ্ঞেস করছে—"কী বললে, বক্কেশ্বর?" পণ্ডিত বলছে ব্যাকরণ "বাতাসে"— রামকানাই শুনছে 'ট্যাকরম্" ও "বাতাসা" পণ্ডিতের 'শব্দকল্পদ্রুম' দুলিরামের কাছে "গল্প আক্কেল গুড়ুম" হয়ে দাঁড়াচ্ছে। 'চলচিত্তচঞ্চরি'তে সত্যবাহনের সাম্যনির্ঘণ্ট আর "সিদ্ধান্ত

-বিশুদ্বিধকা পরে ভব দুলালের কাছে 'সাম্যঘণ্ট' আর 'সিদ্ধান্ত-বিসূচিকা' চেহারা নিচ্ছে। 'সমীক্ষা চক্র' হচ্ছে "মক্ষিকা চক্র'। বিশ্বম্ভরের কাছে 'হরেকানন্দ' হচ্ছে 'হরে কানুনগো'!"

ছ. অন্য ভাষার ভ্রান্ত প্রয়োগ ও বিচিত্র অর্থবোধ

'ঝালাপালা'-য় পণ্ডিতের হিন্দিভাষা ও ইংরেজি চমকপ্রদ অনুবাদ এখানে স্মরণীয় ঃ সে পরেও পুলিশকে বলছে—'হাম্ পুজোর সময় তুমকো বহুত মিষ্টান্ন আউর পুলিপিঠে খাওয়ায়গা'। তার ইংরেজি ভাষার করুণে অনুবাদ প্রয়াসও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হবে। হিন্দি বলার ক্ষেত্রে তার ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব ও ব্যাকরণের বিভ্রান্তি, আর ইংরেজির অনুবাদ তার শব্দার্থ বোধের প্রাথমিক ধাপই পার হওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

জ. ভাষার খেলা করে হাস্যরস সৃষ্টির পথটি বেছে নিয়েছেন সুকুমার অবাক 'জলপান' এ—এ নাটিকার নামকরণ থেকে আদ্যন্ত একই শব্দ বা শব্দগুচ্ছের দুরকম অর্থ বা অর্থগত অস্পষ্টতার ফলে বক্তার উদ্দিষ্ট আর শ্রোতার গৃহীত দুই অর্থের মধ্যে বিরোধ তৈরি হচ্ছে। তারই পুনরাবৃত্ত টেন্‌শনের প্রলম্বন এই নাট্যরচনার মেরুদণ্ড হয়ে উঠছে।। প্রথমে 'জল পাই' এই দুটি কথার মধ্যবর্তী ছেদে বা juncture আগ্রহ করে শ্রোতা 'জলপাই' বলে ধরে নিচ্ছে তার পর তার ভুল ধরিয়ে দিলে সে দাবি করছে বক্তারই প্রথম প্রয়োগবিভ্রাট ঘটেছে—"জল চাচ্ছেন তো জল বললেই হয়— জলপাই' বলবার দরকার কী?" তারপর অহংবোধে আঘাত লাগায় উষ্মা প্রকাশ করে বলছে যে, ঝুড়িতে যেহেতু জল বহন করা সম্ভব নয় সেহেতু যে ঝুড়ি নিয়ে চলেছে তার কাছে জল প্রার্থনা গর্হিত কাজ হয়েছে। পরের দ্বি-সংলাপ অংশে 'খোঁজ করা' এই যুক্তিক্রিয়ার অর্থবিভ্রাটের ফলে নাটকীয় টেনশন তৈরি হচ্ছে। তার পরে "মিলবে" এই ক্রিয়াপদের তারও পরে "খবর বলতে পারা" এই যুক্ত ও যৌগিক ক্রিয়া সমবায়ের। শেষে পথিকও এই খেলায় যোগ দিয়ে বুদ্ধিকৌশলে নিজের কার্যোদ্ধার করে সমস্ত সাসপেন্সের অবসান ঘটাচ্ছে। 'অবাক জলপান'—এই নাটকীয় সাসপেন্সের অস্ত্রটিকে সুকুমার সবচেয়ে বেশি করে ব্যবহার করেছেন—এবং সে সাসপেন্স মূলত শব্দের দ্ব্যর্থকতা-নির্ভর।

ঝ. অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মহাকাব্যিক কাব্যরীতির প্যারোডি ঃ

যেমন লক্ষ করি 'ঝালাপালাতে কেদারের "পোয়েট্রি"-তে
একদা সকালে আমি খাইতেছিলাম ভাত
হেনকালে ধেয়ে আসে প্রকাণ্ড এক ব্যাঘ্র
ইত্যাদি।

কিংবা লক্ষ্মণের শক্তিশেল'-এ আরো স্পষ্টভাবে 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর প্যারোডি—

রাম। রাবণের কেন বল এত বাড়াবাড়ি?—

পি'পড়ে পাখা উঠে মরিবার তরে।
জোনাকি যেমতি হায়, অগ্নিপানে রুষি
সম্বরে খদ্যোত লীলা—
জাম্বুবান। আজ্ঞে ঠিক কথা
রাঘব বোয়াল যবে লভে অবসর
বিশ্রামের তরে —তখনি তো মাথা তুলি চ্যাং, পুঁটি যত করে মহা আস্ফালন।
এখানে রাঘব কাব্যটির শ্লেষ (pun) লক্ষণীয়।

আসলে রঙ্গরসিকতার ব্যাকরণে এ ধরণের অজস্র সূত্র তালিকাবদ্ধ করা চলে। কিন্তু সেই সব সূত্র থেকে ব্যক্তিগত প্রতিভার নিজস্ব উজ্জ্বল নির্মাণগুলির কোনো হদিশ পাওয়া যায় না, কারণ রচনা যত উল্লাস বহন করে, সূত্র তত নীরসতার বিজ্ঞাপন হয়ে ওঠে। সংলাপের প্রত্যেকটি কারুকাজ দেখাতে হলে বিশেষত সুকুমার রায়ের মতো অনর্গল প্রতিভার সংলাপ সৃষ্টির অসামান্য কৌশল বিশ্লেষণ করতে হলে একটি বিশাল গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হবে। আমরা বিশেষ করে তাঁর গদ্য সংলাপের দিকেই নজর দিয়েছি, কিন্তু তার উচ্ছল সৃজনকর্মের একটি ভগ্নাংশও এই সূত্রনির্ভর আলোচনায় ব্যাখ্যা করতে পারিনি।

গান ও কাব্যসংলাপের আলোচনা তো আরো কঠিন। 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'—এ গানের ভূমিকা বেড়েছে সংলাপেরই বিস্তার হিসেবে। এর সঙ্গে লক্ষ করি, ঝালাপালাতে কিছু গান তা নয়, তা নিছক ওস্তাদের গাওয়া গান হিসেবেই এসেছে, নাটকের সচল প্রসঙ্গের বা আখ্যানের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে না। আবার কিছু গান জুড়ির গান হিসেবে আখ্যানকে ধরিয়ে দিচ্ছে। 'চলচ্চিতচঞ্চরি'তে গানের ভূমিকা সংক্ষিপ্ত—তার অধিকাংশ গানই উন্নত সংলাপ বা elevated dialogue। কিন্তু 'ভাবুক সভা' নাটকটি সম্পূর্ণত কবিতার সংলাপে রচিত। এইসব কবিতার নানাবিধ ছন্দ আছে। এক জায়গায়। সংস্কৃত তোটক ছন্দেরও অনুকরণ দেখি। কিন্তু সুকুমারের মূল প্রবণতা দলবৃত্ত বা তথাকথিত ছড়ার ছন্দের প্রতি, কারণ তাতে কথ্যতার প্রকোপ বেশি আনা সম্ভব—প্যারোডির জন্য ঠাট্টাতামাশায় সুরটি তাতে অনেক সহজে নিয়ে আসা যায়। যেমন এই সংলাপ-অংশে—

ভাবুক দাদা। জুতিয়ে সব সিধে করব বলে রাখছি পষ্ট—
চ্যাঁচামেছি করে ব্যাটা ঘুমটি করলি নষ্ট।
নং ১। ঘুম কি হে? সিকী কথা? অবাক কল্লে খুব!
ঘুমোওনি তো—ভাবের স্রোতে মেরেছিলে ডুব।
ঘুমোয় যত ইতর লোকে—তেলী মুদি চাষা—
তুমি আমি ভাবুক মানুষ ভাবের রাজ্যে বাসা।

দাদা। সে ঘুম নয়, সে ঘুম নয় ভাবের ঝোঁকে টং
ভাবের কাজল চোখে দিয়ে দেখছি ভাবের রং.....

'শব্দকল্পদ্রুম' এ স্বল্প দু-একটি গান এবং আংশিক গদ্য সংলাপ ছাড়া বাকি সমস্তটাই পদ্যে—এবং এই পদ্য সংলাপে কথ্যতা ছন্দোবদ্ধ হয়ে প্যারোডির উপকরণ হয়ে উঠছে। এই পদ্যরচনাগুলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রঙ্গ-বিন্যাস দেখানো বিশাল পরিসরের অপেক্ষা রাখে।

৭

সংলাপ কবিতাময় উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং গানের এই বিপুল মজা, খানিকটা নিরালম্ব হয়ে পড়ত, যদি না এগুলির মধ্য দিয়ে নানা বিচিত্র, স্বাভাবিক ভাবে মজাদার চরিত্রের টাইপ প্রতিষ্ঠা করতেন সুকুমার। রবীন্দ্রনাথ যে পরশুরামের লেখা গল্পাবলিকে "চরিত্রচিত্রশালা' বলে অভিহিত করেছিলেন বলে শুনেছি, সেই অভিধাটি সুকুমারের নাটক সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। আমাদের দুঃখ কেবল এই যে, অধিকাংশ নাটকে এই চরিত্রগুলি কেবল সংক্ষিপ্ত অবকাশে ঝলসে উঠে আমাদের আমোদিত করেই মিলিয়ে যায়, পূর্ণাঙ্গ প্রতিমা লাভ করবার সুযোগ পায় না।

এবং এও বলা বাহুল্য যে, নাটকগুলি সংলাপ-প্রধান হওয়ার ফলে, অর্থাৎ যাকে 'অ্যাকশন' বলে তা কম থাকার ফলে, বচনক্রিয়া থেকে চরিত্রগুলিকে পৃথক করা সমস্ত ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না, সংলাপের মধ্যে দিয়েই চরিত্রটিকে পাই আমরা। 'অ্যাকশন' অল্প কিছু নিশ্চয়ই আছে, মজাদার কাজকর্ম যেমন—খেঁটুরাম ও দুলিরামের লড়াই, তাদের দুজনের কেবলচাঁদকে প্রহার, পণ্ডিত কর্তৃক ছাত্রদুটিকে চপেটাঘাত, রামকানাইকে, প্রহার ('ঝালাপালা') সুগ্রীবের কিম্ভূত পদচারণা, রাবণ ও লক্ষ্মণের লড়াই, পলায়নের অঙ্গ হিসেবে "জাম্বুবানের বিভীষণের কাঁধে চাপিবার চেষ্টা', "রাবণ কর্তৃক লক্ষ্মণের পকেট লুণ্ঠন", রামচন্দ্রের মূর্ছা, হনুমানের যমের মাথায় পাহাড় স্থাপন ও যমের পতন, (লক্ষ্মণের শক্তিশলে), পথিকের মামার হাত থেকে "জল কাড়িয়া এক নিঃশ্বাসে চুমুক দিয়া শেষ" (অবাক জলপান), হিংসের হিংসুটিদের গালে কালো কালো ছাপ লাগিয়ে দেওয়া (হিংসুটি), ঈশান আর সত্যবাহনের 'চলচিত্তচঞ্চরির পাতা ছিঁড়ে ফেলা, ভাবুকদাদার নিদ্রাও নিদ্রাচুতি, নারদের শয়ন ও মূর্ছা এবং মূর্ছাভঙ্গ ('শব্দকল্পদ্রম') ইত্যাদি। কিন্তু রাবণের লক্ষ্মণের পকেট কাটা বা হনুমানের যমের মাথায় পাহাড় স্থাপন ইত্যাদি দু-একটি ক্ষেত্রেই মাত্র ক্রিয়া সংলাপের সঙ্গে কার্যকারণসূত্রে যুক্ত নয়, তা মূলত চরিত্রদের স্বাধীন ক্রিয়া। বাকি সবই নাটকের সংলাপের সূত্রে উদ্ভূত এবং পরবর্তী সংলাপের উপলক্ষ্য। তবে নিছক সংলাপের দ্বারাও সুকুমার চরিত্রগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম সম্পর্ক কীভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন তার দৃষ্টান্ত 'চলচিত্তচঞ্চরি'তে একই সংগঠনের নেতৃস্থানীয় সদস্য হওয়া

সত্ত্বেও ঈশান আর সত্যবাহনের ব্যক্তিত্বের সংঘাতে—

সত্যবাহন। আসছেন, আসছেন আপনারা প্রস্তুত থাকনু, এসে পড়লেন বলে। সোমপ্রকাশ, আমার সাতখানা ঠিক আছে ত? নিকুঞ্জবাবু আপনি সামনে আসুন ঈশানবাবু আপনি একটু এগিয়ে যান।

ঈশান। আমি গেলে চলবে কেন আমার গানটি আগে হয়ে যাক—

সত্যবাহন। না না ওসব গানটানে কাজ নেই—ওসব আজ থাক।

অমার লেখাটা পড়তেই মেলা সময় যাবে—আর বাড়িয়ে দরকার নেই।

ঈশান। বেশ ত! আপনার লেখাটাই যে পড়তে হবে তার মানে কি? ওটাই থাকুক না কেন?

চরিত্র পরিকল্পনায় সুকুমারের মূল অবলম্বন বোধ, (বা নির্বুদ্ধিতা) বিশ্বাস ও আচরণগত অতিশয্য তার ইঙ্গিত আগেই করেছি। ফলে আতিশয্যহীন যে-সব চরিত্র, সেগুলিই তুলনায় একটু কম চিত্তাকর্ষক হওয়ার সম্ভাবনা—এবং 'ঝালাপালা'য় জমিদারবাবু, লক্ষ্মণের শক্তিশেলে-এ যম, এবং আরো কিছু গৌণ চরিত্রের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই এমন ঘটেছে। কিন্তু অন্তত দুটি নাটকে এক ধরনের চরিত্রগত আতিশয্যের বা অতিরঞ্জনের বিরোধ বা contrast তৈরি করেছেন সুকুমার—একদিকে প্রচুর ভাবুক, তাত্ত্বিক তাদের foil হিসেবে দাঁড় করিয়ে। অর্থাৎ চরিত্রের সংগঠনের একটা 'foreign clement' এনে। শব্দকল্পদ্রুম'র বিশ্বম্ভর আর 'চলচিত্ত-চঞ্চরি'-র ভবদুলাল। দ্বিতীয় জনকে কেউ কেউ শেকসপিয়ারের 'কিং লিয়ার' নাটকের fool চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন, আমাদের মনে হয় না সেই দার্শনিক প্রজ্ঞা বিশ্বম্ভর বা ভবদুলালের আছে। দাশুর মতো তারা "মিচকেমি" করে কি না তাও আমাদের জানবার উপায় নেই। কিন্তু বোকামির জেদি, সরল ও বলিষ্ঠ অবস্থানে দাঁড়িয়েই তারা অন্যদের চমৎকার foil হয়ে উঠেছে 'ফুল' চরিত্রগুলির অন্তর্লীন সিরিয়াসনেস এদের থাকলে নাটক একটু বেশি ভারাক্রান্ত হত বলে মনে হয়। এদের সংলাপ চারপাশের গাম্ভীর্যের মাঝখানে সুকুমারের নিজের অট্টহাসির মতো, আপাত-জটিল বিষয়ের কিম্ভূত ব্যাখ্যা ও বিস্তার এদের মধ্যে দিয়ে প্যারোডির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তৈরি করে। যেমন ভবদুলালের খাতায়—"ঈশানবাবুর ছায়া ঘুরছে—লাটাই পাকাচ্ছে—আর ঈশানবাবু গোঁৎ খাচ্ছেন। পেটের ভিতর বিরাট অন্ধকার হ্যাঁ করে কামড়ে দিয়েছে—চ্যাঁচাতে পারছেন না, খালি নিঃশ্বাস উঠছে আর পড়ছে—সব ঝাপসা দেখছে—গা ঝিম্‌ঝিম—নাক্স ভূমিকা থাঁটি—"। কিংবা শব্দকল্পদ্রুম'-এ গুরুজির "শব্দব্রহ্ম" বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতার পর বিশ্বম্ভর বলে—"আমাদের মতিলাল সেবার যে ভুঁইপটকা বানিয়েছিল উঃ তার যে শব্দ!"

অর্থাৎ ভাব, বিশ্বাস ও সাধনার বাড়াবাড়ির বিপরীত একটি সরল ও আত্মবিশ্বাসময়

নির্বুদ্বিতাকে স্থাপন করেন সুকুমার, তার অন্য এক ধরনের বাড়াবাড়ি দিয়ে অনাথের বাড়াবাড়ির বেলুন চুপসে দেন।

অন্যত্র চরিত্রের গঠনে রঙ্গের সব প্রথাসিদ্ধ উপাদানই জড়ো করেন সুকুমার। পরগাছা জাতীয় বচন-পারঙ্গম দুলিরাম, খেঁটুরাম, নিজের সংগীত-কুশলতা এবং কৌলীন্যগর্বী কেবলচাঁদ ওস্তাদ, নিরেট পুলিশ কন্‌স্টেব্‌ল। চতুর চাকর, ক্লাস-পালানো অনিচ্ছুক ছাত্র ও নির্বোধ পণ্ডিত, ধড়িবাজ উকিল, মহাকাব্যের অতিপ্রসিদ্ধ বীরদের আস্ফালনময় কাপুরুষতা, অবাক জলপান-এর নানা চরিত্রের একাচ্ছন্নতা বা 'monomania', হিংসুটে মেয়েরা, পাণ্ডিত্য-দুর্বল সত্যবাহন ও সংগীত-সচ্ছল ঈশান, সোমপ্রকাশের যে-কোনো তুচ্ছ উপলক্ষ্যে ধূসর ও অনিশ্চিত 'অথরিটি কোট' করার দুর্বলতা ("যাই বলুন, এই সম্বন্ধে একজন পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত যা বলেছেন আমারও সেই মত। আমি বলি, ওঁরা না এসেছেন ভালোই হয়েছে।" চ্যালাদের অতি-বিশ্বস্ততা, 'মামা গো'-তে অতি-চিন্তাশীল যুক্তির নানা পরম্পরায় সিদ্ধ ভাগনে, 'শব্দকল্পদ্রুম'-এ নারদের অভিমানহত মূর্ছা ও তার নিরাময়, ইন্দ্রের যুদ্ধ-বিরুপতা ও কার্তিকের শৌখিন শান্তিপ্রিয়তা। কেবল দু-একটি ক্ষেত্রে চরিত্রটির বাইরের পরিচয় ও তার স্বরূপের মধ্যে বিরোধ তৈরি করেছেন সুকুমার। একটি হল 'ঝালাপালা'-র পণ্ডিত। এই মানুষটির নিজস্ব কোনো নাম নেই। কিন্তু তার উক্তি ও আচরণে তার পাণ্ডিত্যের ভয়াবহ অভাব প্রতি ক্ষেত্রেই সূচিত হচ্ছে। এ বিষয়ে পণ্ডিত বিন্দুমাত্র সচেতন বলে মনে হয় না। অন্যান্য চরিত্রের দ্বিধা মৌখিক বীরত্ব বনাম আচরণগত কাপুরুষতা, মৌখিক বিনয় বনাম আত্মপ্রচারের উদগ্র বাসনা, ভাবুকের প্রচারিত ভাবনিদ্রা বনাম সাদাসিধে ঘুম। খানিকটা ক্রমান্বয়ী, অর্থাৎ প্রথমে যে-রকম, পরে তার বিপরীত। কিন্তু পণ্ডিতের দ্বিস্তর একই সঙ্গে স্পষ্ট—সে যে মুহূর্তে পাণ্ডিত্যপ্রকাশে ব্যাকুল, সেই মুহূর্তেই তার বিপরীত। কিন্তু পণ্ডিতের দ্বিস্তর একই সঙ্গে স্পষ্ট—সে যে মুহূর্তে পাণ্ডিত্যপ্রকাশে ব্যাকুল, সেই মুহূর্তেই তার নির্বুদ্ধিতা প্রকট হচ্ছে।

নাট্যগঠনের আলোচনা আমরা এর আগে ছুঁয়ে গেছি। তিনটি দৃশ্যে তৈরি 'ঝালাপালা'র গঠন মোটামুটি মজবুত। প্রথম দৃশ্যে অবশ্য চণ্ডীবাবুর জমিদারের উপর চড়াও হবার ছবিটির চেয়ে পণ্ডিতের ভয়ংকর অধ্যাপনা এবং তার ব্যর্থতার ছবিটিই বড় হয়ে ওঠে—ফলে শেষে। জুড়ির দলকে গানের মধ্য দিয়ে নাটকের মূল সমস্যাটিকে ধরিয়ে দিতে হয়। দ্বিতীয় দৃশ্যে এসে অবশ্য ছবিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই দৃশ্যেই রামকানাইয়ের আবির্ভাব ঘটনার বিপরীত স্রোতের সূত্রপাত করে এবং এই তৃতীয় দৃশ্যে মামা কেদার এসে ঘটনাকে দ্রুত তার সমাধানের দিকে নিয়ে যায়। মামার রচনাপাঠে

তার ভূমিকা তৈরি হয়, শেষে পুলিসের উল্লেখ আর পুলিসের ছদ্মবেশে বামার আবির্ভাবে তার বাকিটা সমাধা হয়। লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'অবাক জলপান', 'হিংসুটি' এমন কী 'চলচিত্তচঞ্চরি'র সংগঠনও সামঞ্জস্যপূর্ণ—তার মধ্যে 'অবাক জলপান' পড়ে মনে হয় একটি আশ্চর্য পরিমিতিবোধ এই নাটকটিকে টানটান করে বেঁধেছে—আর একটি এপিসোড বেশি হলে হয়তো এর ভিত নড়বড়ে হয়ে পড়ত। 'চলচত্তচঞ্চরি'তে একা সত্যবাহন-শ্রীখণ্ডদেবের সম্মুখ সংঘাতে আমাদের ঠিক পুরো তৃপ্তি হয় না, মনে হয় ঈশান-সত্যবাহনের পুরো দলবল যদি শ্রীখণ্ড আশ্রমের সকলের সঙ্গে সংঘর্ষে আসত তাহলে মজাটা আরো জমত। কিন্তু সুকুমার দুটি প্রতিষ্ঠানের চরিত্র একটু আলাদা রেখেছেন। সাম্য-সিদ্ধান্ত সভা কিছুটা গণতান্ত্রিক চরিত্রের, তাতে অন্তত দুজন সম-পর্যায়ী নেতা এবং তাদের ভক্ত আছে, আর শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রমে তিনিই একা গুরু, আর সবই তার তুলনায় লঘু। সুতরাং দুয়ের Confrontation কতটা জমত তা বুঝতে পারছি না, কিন্তু এ নাটকে যে অনেকটাই শুধু ভবদুলালকে সাক্ষী করে বকলমে ঝগড়া হয় তা থেকে একটু ভিন্ন স্বাদ তৈরি হত। সেখানে হয়তো ঈশান-সত্যবাহনের ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা অন্য-রকম একটা চেহারা নিত। শেষ পর্যন্ত ঈশান-সত্যবাহনের ঝাঁঝ ভবদুলালকে আক্রমণ করে—এটা যথার্থ পরিণতি অবশ্যই, কিন্তু তার আগে যদি দুপক্ষের সঙ্গেই ভবদুলালের এই বিরোধ তৈরি হত, দুপক্ষের মুখোমুখি হওয়ার পর, তাহলে যেন নাটকের সংগঠন আরো তীব্রতা পেত। কিন্তু এসব অনুমান আপাতত নিরর্থক।

এর মধ্যে 'ভাবুক-সভা'র গড়ন সবচেয়ে দুর্বল বলে মনে হয়। এতে কাব্য-সংলাপের আকর্ষণ যত বেশি, ঘটনাক্রমের আকর্ষণ সে তুলনায় কিছুই নয়। এর মধ্যে রবীন্দ্র-শিষ্যদের ভাবলুতার প্রতি যে ব্যঙ্গ আছে বলে রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে অনেকেই অনুমান করেছিলেন—হয়তো দ্বিজেন্দ্রলালের 'আনন্দ-বিদায়'-এর একটি ভদ্র সংস্করণ এটি—সেই ব্যঙ্গের বিষয়টি পদ্য সংলাপে যত স্পষ্ট হয়েছে ততখানি আখ্যানের আয়োজন করতে পারেনি। 'শব্দকল্পদ্রুম'-এ তিনটি দৃশ্যে আমরা "মর্ত্য কাণ্ড 'স্বর্গ কাণ্ড" এবং স্বর্গ ও মর্ত্যের সংঘর্ষ লক্ষ করি যথাক্রমে, কিন্তু নেহাৎ মজার Spectacle তৈরির উদ্দেশ্য ছাড়া গুরুজির সঙ্গে স্বর্গের দেবতাদের ঝগড়া তৈরি হবে কেন, তা আমরা বুঝতে পারি না। গুরুজি এক জায়গায় বলছে—"তোমাদের দেখাব শব্দের কী শক্তি! রাতারাতি স্বর্গ বরাবর পৌঁছে দেবে।" কিন্তু অর্থহীন শব্দের তাড়নায় দেবতাদের সিংহাসন কেঁপে উঠছে এবং বিশ্বকর্মা রেগে স্বর্গাভিমুখী গুরুজির মাথায় শব্দকল্পদ্রুম নামক ডাণ্ডা মারছে, তার ফলে সশিষ্য গুরুজির পতন ঘটছে স্বর্গ থেকে—এই কল্পনা চমকপ্রদ হলেও সাধারণ দর্শকের পক্ষে সুগম নয়। কিন্তু পদ্য-সংলাপের উদ্দাম সরসতা

এবং প্যারোডি এ নাটকটিকে জমিয়ে দেয়, অন্তত পাঠ্য হিসেবে। গুরুজি, বিশ্বম্ভর, দেবতাদের দঙ্গল থাকায় দৃশ্য হিসেবেও মন্দ লাগে না। কিন্তু এর গড়ন খুব জুতসই নয়। তবে গড়ন যেমনই হোক, সংলাপের অনবদ্য কুশলতা ও উল্লাস এ ধরনের নাটকের নড়বড়ে কাঠামোকে সম্পূর্ণ আড়াল করেই রাখে।

টীকা ও উৎসনির্দেশ

১। লীলা মজুমদার, ১৯৮৬, "আমার বড়দা", সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত 'দেশ', সুকুমার রায় স্মরণ সংখ্যা (৫৩ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ ৬৩ পৃ.

২। ঐ, ৬৪ পৃ.।

৩। ঐ, ৬৮ পৃ.।

৪। এই লেখকের 'নাটমঞ্চ নাট্যরূপ গ্রন্থের (১৯৮১, প্রমা প্রকাশনী) "অভিনয়, প্রযোজনা ও রবীন্দ্রনাথ" নিবন্ধটি (৮৬-১০৮ পৃ) দ্রষ্টব্য।

৫। পাঠভবন প্রাথমিক বিভাগ আয়োজিত 'সুকুমার মেলা'র স্মারক গ্রন্থ ১৯৮৭। মাধুরীলতা মহলানবীশের নিবন্ধ, "দাদা সুকুমার রায়", (৩৫-৩৮—, ৩৫-৩৬ পৃ।

৬। সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু (সম্পাদিত)। ১৩৮৩ 'সমগ্র শিশুসাহিত্য, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৭ পৃ।

৭। পাঠভবন-এর 'সুকুমার মেলা'-র স্মারক গ্রন্থ, ১৯৮৭, শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের নিবন্ধ, "আমার দেখা সুকুমার রায়" (৩৯.৪০) ৩৯ পৃ।

৮। পার্থ বসু, "রবীন্দ্রনাথের তরুণ বন্ধু', 'দেশ' (পূর্বোল্লেখ) ৯০ পৃ। সীতা দেবীর 'পূণ্য স্মৃতি' থেকে উদ্ধৃতি।

৯। ঐ ৮৬পৃ।

১০। ঐ পারুলবালা রায়চৌধুরীর সাক্ষ্য থেকে উদ্ধার ৮৯ পৃ।

১১। ঐ কালিদাস নাগের দিনলিপি থেকে উদ্ধার. ৯০ পৃ।

১২। হেরম্বচন্দ্র মৈত্র স্টার থিয়েটারের পথসন্ধানী এক জিজ্ঞাসু পথিককে "জানি, কিন্তু বলব না"—এই উত্তর দিয়েছিলেন—এই জনশ্রুতি থেকে তাঁর যে-কোনো ধরনের নাট্যচর্চার 'উপর বিরাগ ছিল—এমন অনুমান সংগত নাও হতে পারে। স্ত্রী ভূমিকাবর্জিত সুকুমারের নাটকাবলিকে উদারনৈতিক ব্রাহ্মরা খুব দোষাবহ বলে মনে করেছেন, এমন বোধ হয় না।

১৩। প্রথম সংস্করণ, ১৩৮৩।

১৪। পুলক চন্দ, ১৯৮২, "সুকুমারের নাটক", ১৬২পৃ। দ্র. অনুপম মজুমদার ও আশীষ লাহিড়ী (সম্পা) 'প্রস্তুতিপর্ব' বর্ষ সাত, সংখ্যা ৩-৪ অক্টোবর ১৯৮২, ১৬১-৭৭পৃ।

১৫। পূর্বোল্লেখ, ১৬৮ পৃ।

১৬। ১৪-র উল্লেখ, ১৭২-৭৩ পৃ।

১৭। ওই, 'প্রস্তুতিপর্ব'-র ১১৬-২১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত তাঁর প্রবন্ধ "চলচিত্তচঞ্চরি"-র ১১৬-১৭ পৃষ্ঠা দ্র।

১৮। 'সমগ্র শিশুসাহিত্য', ১৩৭ পৃ। কিন্তু দ্র. শ্রীমতী লীলা মজুমদারে উক্তি—"নিজে নায়ক

হতেন না।" এখানে পূণ্যলতার সাক্ষ্যই সম্ভবত বেশি গ্রাহ্য কারণ শ্রীমতী মজুমদার নিজেই একটু পরে আমাদের জানিয়েছেন—"আমি তাঁদের একটাও নাটক দেখিনি।"

২০। পাঠভবন প্রাথমিক বিভাগ আয়োজিত 'সুকুমার মেলা স্মারকগ্রন্থে 'যুগান্তর' সাময়িকী, ২৯ আষাঢ় ও ১৮ শ্রাবণ ১৩৭০ সংখ্যা থেকে পূর্ণমুদ্রিত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিবন্ধ আমাদের মন্‌ডে ক্লাব" (৪১-৫২), ৪২ পৃ. দ্র।

২১। ১৬৭ পৃ।

২২। দ্র. বর্তমান লেখকের নিবন্ধ "শিক্ষক সুকুমার রায়" গণশক্তি ১ নভেম্বর, ১৯৮৭।

২৩। কয়েক বছর ধরে, উৎসাহী সুকুমারচর্চার একটি অনিবার্য পরিণতি হিসেবে তাঁর রচনার মধ্যে বয়স্কবাঞ্ছিত নানা গভীর তত্ত্ব উদ্ধার করবার চেষ্টা লক্ষ করা যাচ্ছে। এমন কথা আমরা বলছি না যে সুকুমারের রচনা নেহাতই বালখিল্য অভিমুখী, তাতে কোনো গভীরতা নেই বা সমকালীন দেশ কাল-চেতনার আভাস তাতে পড়েনি। কিন্তু কোনো ঐতিহাসিক সংযোগ কালক্রম্ ব্যক্তিগত ইতিহাসের সংগত নির্মাণ ইত্যাদি ছাড়াই তাঁর রচনা কোয়ান্টাম তত্ত্ব, আপেক্ষিককতাবাদ, অ্যাবসাডবাদ ইয়োরোপে যে ইতিহাসবন্ধ অ্যাবসার্ডবাদের জন্ম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই কেবল অস্তিত্ববাদ ইত্যাদি নানা বস্তু আবিষ্কার করা হচ্ছে। এই সব ব্যক্তিগত আরোপের সময় আমরা সম্ভবত ভুলে যাই যে, বক্তব্য থেকে তার পরিবেশনাকে পৃথক করে দেখা উচিত নয়। অর্থাৎ বক্তব্য বলা যদি লেখকের উদ্দেশ্যের সূচক হয়, সেই বক্তব্যের জন্য বিশেষ ফর্ম মেছে নেওয়াও ওই উদ্দেশ্যেরই অঙ্গ। সুকুমার যদি এতসব গুরুগম্ভীর তত্ত্বই প্রধানভাবে বলতে চাইবেন, জীবনের অসংগতি ও সংকটই দেখাতে চাইবেন, তাহলে তিনি কেন ছোটদের পত্রিকায় ছোটদের ছড়ায় গল্পে এসব তত্ত্ব লুকিয়ে রাখবেন? 'বর্ণমালাতত্ত্ব এর প্রবন্ধাবলীর মতো প্রবন্ধ লেখার স্বাধীনতা তো তাঁর ছিল। ভাষাবিজ্ঞানীদের foregrounding তত্ত্ব দিয়েও এর ব্যাখ্যা করা যায় না। সহজভাবে একথা ধরে নিলেই হয় যে বড় স্রষ্টাদের লঘু উচ্চারণেও কিছু গভীর আভাস, জীবনরহস্যের অন্তর্লোক সম্বন্ধে কোনো গূঢ় মন্তব্য কোনো ব্যঙ্গময় তির্যক নিক্ষেপণ থেকেই যায়। সেসব ধরিয়ে দেওয়া নিশ্চয়ই উচিত, কিন্তু তা থেকে বহু জটিল বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক সিস্‌টেমের নির্মাণ এবং তার প্রকাশই লেখকের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য বলে ধরে নেওয়া এ লেখবের কাছে একটু আতিশয্য বলে মনে হয়। এতে সুকুমারের মজাটা নষ্ট হয়—যে-মজা সহস্র দার্শনিকের তত্ত্বের চেয়ে অনেক বেশি দামি। পৃথিবীর যে-কোনো সংস্কৃতির প্রাথমিক পরিসংখ্যান আমাদের দেখিয়ে দেয়, বৈজ্ঞানিক-রাজনীতিক-দার্শনিক সংখ্যার যত প্রচুর ছোটদের এমন স্রষ্টা ত প্রচুর নয়। পরে আরো প্রাসঙ্গিক মন্তব্য দেখনু)।

২৪। 'চলচিত্তচঞ্চরি' রচনার পিছনে ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন অন্তর্দ্বন্দ্বের পটভূমিকাটিকে পুলক চন্দ ও বিষ্ণু বসু স্পষ্ট করে তুলেছেন, আগ্রহী পাঠক প্রস্তুতিপর্ব এ তাঁদের প্রবন্ধদুটি অবশ্যই পড়বেন।।

২৫। পূর্বাল্লেখ ১৬৬পৃ।

২৬। সেবাব্রত চৌধুরী তাঁর সুকুমার রায়ের নাটক প্রসঙ্গে 'প্রবন্ধে' শিশির কুমার দাস (সম্মা) ১৯৮৮, শতায়ু সুকুমার, দিল্লী বেঙ্গলী অ্যাসোসিয়েশন, ১১৬-২৭ পৃঃ। সুকুমারের প্যারডি বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করেছেন।

২৭। ইয়েনেস্কোর 'দ্য বল্‌ড প্রিমা ডনা' নাটকে মিঃ ও মিশেষ স্মিথ এ প্রথম দৃশ্যের সংলাপ যেমন।

২৮। অ্যাবসার্ড যে অর্থে একটি পারিভাষিক শব্দ অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর সময়ে প্রধানত

নাটকের বিশেষ প্রকরণের মধ্য দিয়ে প্রচারিত বিশেষ জীবনতত্ত্ব—তার সঙ্গে সুকুমারের জীবন বা শিল্পভাবনার বিন্দুমাত্র মিল নেই; উভয়ের নাম একত্র উচ্চারিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু 'অ্যাবসার্ড'-এর আরো সাধারণ অর্থ আছে উদ্ভট বা 'কিম্ভুত'—যা থেকে বিশেষ্য অ্যাবসার্ডিটি। তার কুশলী নির্মাণ ও পরিবেশন ননসেন্সের অন্যতম শর্ত। আমরা অনেক সময় পরিভাষিক অর্থ আর সামান্য অর্থের তফাৎ করি না—বাঙালি সমালোচকের এই এক দুর্বলতা। এ বিষয়ে শিশিরকুমার দাশ সম্পাদিত শতায়ু শিশির কুমার-এ শঙ্খ ঘোসের 'ফুর্তিভরা প্রাণ' নিবন্ধটি দেখুন। (৯-১৬ পৃ।) এবং শিশিরকুমার দাশের সুকুমার রায় তাঁর ভাষাচিন্তা নিবন্ধ শিশিরকুমার দাশ (সম্পা) পূর্বোল্লেখ ৪৩-৫৬ পৃষ্ঠা।

৩০। পুলক চন্দ পূর্বোক্ত প্রবন্ধে 'খাই খাই'-এর কবিতার উচ্ছল শব্দক্রীড়ার সঙ্গে 'অবাক জলপান'-এর সমসাময়িকতা লক্ষ করেছেন।

Academicians, professors, Research-scholars and students are requested to submit original research-papers or significant articles related to the fields of literature (Poems) in Bengali for July 2017 Edition in about 3000 words. Front size 13 and article should typed in A4 size with single space (Pagmaker/ font –samit 001 or PT Arunima).
Please visit us
Website : sahityaangan.com
and Conctact with us–
9830633202/9570217070